নবযোগীন্দ্রসংবাদ

অধ্যাপিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুপম প্রকাশনী
১২/৬ ট্যামার লেন • কলিকাতা ৯

শ্রীরাধারমণো জয়তি

উৎসর্গ

আমার পরম প্রিয় ৺বাবু ও ৺বাম্‌মার
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে।
আদরের রমা

প্রাক্‌কথন

পরাশরাত্মজ ভগবান্ বেদব্যাস। শাস্ত্রমূর্তি তিনি, শাস্ত্রপ্রকাশ ও প্রচারণার জন্যই তাঁহার জন্ম ও কর্ম। কত কত শাস্ত্রগ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন; রচনা করিয়াছেন অষ্টাদশ পুরাণ,—বেদেরই তত্ত্ব কহিয়াছেন সেই সকল গ্রন্থে কত মনোরম কাহিনীসংযোগে। পুরাণশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত। অষ্টাদশ সহস্র ইহার শ্লোকসংখ্যা। দ্বাদশ স্কন্ধে ইহা বিভক্ত। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত বিশেষভাবে বলিবার জন্যই দেবর্ষি নারদ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থের প্রাণপুরুষ অখিল রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" নিখিল শাস্ত্রের সার এই গ্রন্থে বিধৃত হইয়াছে। কত তত্ত্ব-কথা, কত মনোরম কাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এই মহাগ্রন্থে। তত্ত্বসম্বলিত নিমি-নবযোগীন্দ্রসংবাদ সেই সব মনোরম কাহিনীর অন্যতম। বক্ষ্যমান গ্রন্থের ইহাই বিষয়বস্তু। অপূর্ব সে কথা—তত্ত্বসার সে কথা মানবমনের চিরন্তন জিজ্ঞাসার সদুত্তর। শ্রীশুকমুখে সে কাহিনী উক্ত হইয়াছে।

পুণ্যকীর্তি শ্রীবসুদেব। পুণ্যালোকে তাঁহার গৃহ সদা উদ্ভাসিত। আসিয়াছেন সেই গৃহে দেবর্ষি নারদ বীণাযন্ত্রে হরিগুণগান করিতে করিতে। স্বেচ্ছাবিচরণ-ক্রমেই তাঁহার এই আগমন। সৎসঙ্গের মাহাত্ম্যকীর্তন করিতে যাইয়া একদা মহারাজ যুধিষ্ঠির বিদুর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—"ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।" হে প্রভো! আপনার ন্যায় ভগবদ্ভক্তগণ স্বয়ংই তীর্থস্বরূপ। সেই তীর্থ আজ স্বয়ংই সমুপস্থিত বসুদেবগৃহে। সাধুসঙ্গ বড় দুর্লভ। তার ফলশ্রুতিও বড় কম নয়। আচার্য শঙ্কর বলেন:

ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা।

ক্ষণকালের জন্যও সাধুসঙ্গ সংসারসাগর উত্তরণের ভেলাস্বরূপ। তারই প্রতিধ্বনি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের মুখে:

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

সেই সাধুসমাগমে বসুদেব হইলেন আনন্দে আত্মহারা। পাদ্যার্ঘ্যদানে করিলেন তাঁহার যথোচিত সৎকার, বসাইলেন সুখাসনে। সেই সুখাসনে মহর্ষিকে সুস্থ ও স্বস্থ দর্শনে প্রীত হইলেন বসুদেব। সমীপবর্তী হইয়া কহিলেন বিনয়নম্র বচনে: পিতামাতার আগমন যেমন সন্তানের কল্যাণের জন্যই হয় তেমনি আপনাদের ন্যায় ভগবদ্ভক্তগণের সমাগমও সংসার-তাপদগ্ধ জীবগণের পরম কল্যাণই সাধন করিয়া থাকে। আর দেখুন, দেবতারা কর্মানুযায়ীই ফল দেন, কিন্তু—ভবাদৃশ ভগবদ্ভক্তগণের কল্যাণসাধন অহৈতুকী, কর্মনিরপেক্ষ। অতএব আপনার এই পুণ্য আগমন যে আমার শ্রেয়োবিধানার্থই হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কল্যাণকামী আমি, আমার জিজ্ঞাসার সদুত্তর-দানে আমাকে কৃতার্থ করুন। বসুদেব যথার্থ কথাই বলিলেন, কারণ ভাগবতকার বলেন:

তত্তো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এতস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ১১।২৬।২৬

দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক সাধুসঙ্গ করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য, কারণ সাধুগণই সদুপদেশ দ্বারা মনের দুর্বাসনাসকল দূরীভূত করিয়া থাকেন। ভগবান কপিল মাতা দেবহূতিকেও তাহাই বলিয়াছেন:

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো ভবতি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ভা. ৩।২৫।২৫

হে মাতঃ! সাধুসঙ্গেই আমার মহিমাসূচক কার্যসমূহ হইয়া থাকে, উহা হৃদয় ও কর্ণের তৃপ্তিদায়ক। ঐ সকল পবিত্র কথা শ্রবণ করিতে করিতে অবিদ্যাবিনাশকারী আমাতে শ্রদ্ধারতি ও ভক্তি উপজাত হয়। বসুদেবের আজ সেই সৎসঙ্গলাভ হইয়াছে; তাহার সার্থকতা সম্পাদনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কহিলেন: 'হে ব্রহ্মন্! শ্রদ্ধা সহকারে যাহা শ্রবণ করিলে মানব সর্ববিধ ভয় হইতে মুক্ত হইতে পারে আমি আপনার নিকট সেই ভাগবত ধর্ম জানিতে ইচ্ছা করি। 'যান্ শ্রদ্ধয়া শ্রুত্বা মর্ত্যো মুচ্যেত সর্বতোভয়াৎ।' ভা. ১১।২।৭

আমি পূর্বে নিশ্চয়ই ভগবন্মায়ায় মোহিত হইয়া পৃথিবীতে পুত্রলাভার্থী হইয়াই মুক্তিপ্রদ ভগবান অনন্তের পূজা করিয়াছিলাম—মোক্ষলাভের জন্য

করি নাই। এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই বিচিত্র বিপদসঙ্কুল সর্বদা ভয়প্রদ সংসার হইতে অনায়াসে, ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে, যাহাতে পরিত্রাণ পাইতে পারি আমাকে তদ্রূপ উপদেশ প্রদান করুন। যে ভাগবত ধর্ম সম্বন্ধে এই জিজ্ঞাসা তাহার মূল কথা হইল বাসুদেববিষয়ক। আর এই বাসুদেববিষয়ক কথার মাহাত্ম্য শ্রীশুকমুখে কীর্তিত হইয়াছে:

বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৄংস্তৎপাদসলিলং যথা॥ ভা. ১০।১।১৬

বাসুদেবের চরণজল অর্থাৎ গঙ্গাজল ও চরণামৃত যেমন জনগণকে পবিত্র করে সেইরূপ বাসুদেববিষয়ক প্রশ্ন প্রশ্নকর্তা, বক্তা ও শ্রোতা—এই ত্রিবিধ পুরুষকেই পবিত্র করিয়া থাকে। দেবর্ষি নারদও তদনুরূপ বাক্যই কহিয়েন:

'হে যাদবশ্রেষ্ঠ বসুদেব! আপনি উত্তম প্রশ্নই করিয়াছেন। ভাগবত ধর্ম সম্বন্ধে আপনার এই প্রশ্ন, বিশ্বপবিত্রতাকারক। এই ভাগবত ধর্ম শ্রুত পঠিত, চিন্তিত, আদৃত কিংবা অনুমোদিত হইয়া দেবদ্রোহী এবং বিশ্বদ্রোহীকেও পবিত্র করিয়া থাকে। যিনি পরম কল্যাণময়, যাঁহার নামাদি শ্রবণ কীর্তন পুণ্যজনক আপনি সেই ভগবান নারায়ণের কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া উত্তম কার্যই করিয়াছেন। আপনার প্রশ্নোত্তরে একটি পুরাতন কাহিনী বলিতেছি। অবহিত হইয়া শ্রবণ করিলে আপনার প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর উপলব্ধি হইবে। স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত নামে এক পুত্র ছিল। তাঁহার পুত্র অগ্নীধ্র। অগ্নীধ্রের পুত্র নাভি। নাভির পুত্র ঋষভদেব। ইনি বাসুদেবের অংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং মোক্ষধর্মের প্রবর্তক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার শত পুত্র সকলেই বেদজ্ঞ। তন্মধ্যে ভরত জ্যেষ্ঠ। তাঁহার নামানুসারেই অজনাভবর্ষ ভারতবর্ষ নামে খ্যাত হয়। ভরত ধর্মপরায়ণ, সুকঠোর তপশ্চরণে কৃতকৃতার্থ। অপর একোনশত পুত্রের মধ্যে নয়জন নয়টি দ্বীপের অধিপতি হন এবং একাশী জন কর্মকাণ্ডের প্রবর্তক ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অবশিষ্ট নয়জন ত্যাগব্রতধারী বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী, আত্মদ্রষ্টা মুনি। ইঁহাদের নাম কবি, হরি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন। সর্ববিষয়ে নিস্পৃহ এই সকল

আত্মজ্ঞ মুনিগণ দিগম্বরবেশে সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সর্বত্র ছিল তাঁহাদের অবাধ গতি। স্বেচ্ছাবিচরণশীল ইঁহারা একদা ভারতবর্ষে ঋষিগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত মহাত্মা নিমির যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন। সূর্যসমপ্রভা-শালী অপূর্বদর্শন সেই সকল মুনিবৃন্দকে দর্শন করিয়া মহাত্মা নিমি, যজ্ঞের ঋত্বিক, পুরোহিত এবং দর্শকবৃন্দ সকলেই বিস্ময়পুলকিতনেত্র। সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করিতে সকলেই তৎপর হইলেন। অপার্থিব আনন্দে সকলেই বিগলিতচিত্ত। পাদ্যার্ঘ্যদানে পূজিত হইয়া তাঁহারা সুখাসনে উপবিষ্ট হইলেন। যথার্থ ধর্মপ্রবক্তা—ধর্মজিজ্ঞাসার সদুত্তর দিতে পারেন এইরূপ আচার্য বড় বিরল। বহুপুণ্যের ফলেই মহাত্মা নিমি এইরূপ আচার্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাও একজন নহে, দুইজন নহে—একেবারে নয়জন। মহারাজ নিমি তাঁহাদের সমীপাগত হইয়া বিনয়নম্রবচনে কহিলেন:

মন্যে ভগবতঃ সাক্ষাৎপার্ষদান্ বো মধুদ্বিষঃ।
বিষ্ণোর্ভূতানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি॥ ২৮
দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠ প্রিয়দর্শনম্॥ ২৯
অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্॥ ৩০

—ভা. ১১।২।২৮-৩০

অহো, আপনাদিগকে আমি ভগবান মধুসূদনের সাক্ষাৎ পার্ষদ বলিয়া মনে করিতেছি। ভগবান বিষ্ণুর পার্ষদগণ নিশ্চয়ই লোকদিগকে পবিত্র করিবার জন্যই সর্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন। দেহীদিগের মানবদেহ ক্ষণভঙ্গুর হইলেও তাহা দুর্লভ, তন্মধ্যে আবার ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তিগণের দর্শন তো আরও দুর্লভ। হে নিষ্পাপ মুনিগণ! এই সংসারে সাধুসঙ্গ ক্ষণার্ধকাল স্থায়ী হইলেও উহা মনুষ্যগণের পক্ষে নিধিস্বরূপ অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ; অতএব আমরা আপনাদিগকে আত্যন্তিক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেছি:

ধর্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্।
যৈঃ প্রসন্ন প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মানমপ্যজঃ। ৩১

হে মুনিগণ! যদি আমাদিগকে যোগ্য মনে করেন তাহা হইলে নিত্যমুক্তি ভগবান যে ধর্মের অনুশীলনে সন্তুষ্ট হইয়া অনুশীলনকারী ভক্তকে স্বীয় স্বরূপজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন, আপনারা সেই ভাগবত ধর্ম আমাদিগকে বলুন। নবযোগীন্দ্রের অন্যতম কবি এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ নিমির প্রশ্ন এখানেই থামিয়া যায় নাই। তিনি পর পর আরও আটটি প্রশ্ন নবযোগীন্দ্রসমীপে উপস্থাপিত করেন। বাকী আটজন মুনি একে একে সেই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তরদানে মহারাজ নিমির সকল প্রশ্নের—সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দেন। ধর্মোপদেশ কেবলমাত্র শ্রাব্য নহে, সাধ্য। মহারাজ নিমি সেই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া তৎসাধনে তৎপর হইলেন। তাঁহার সাধনা ব্যর্থ হইল না—ফলদান করিলে তিনি ভগবদ্দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইলেন।

নবযোগীন্দ্রকথিত সেই সকল উপদেশ নিখিল শাস্ত্রের সার, মানবমনের চিরন্তন জিজ্ঞাসার সদুত্তর। ভাগবত ধর্ম সম্বন্ধে এই সকল কথাই এই সকল উপদেশে বলা হইয়াছে—নূতন আর কিছুই বলিবার নাই। নারদকথিত নবযোগীন্দ্রের এই সকল উপদেশ শ্রবণে বসুদেব ও তৎপত্নী উভয়েই মোহমুক্ত হইলেন। তত্ত্বোপলব্ধিতে জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি হইলে—তাঁহারা কৃতকৃতার্থ হলেন।

এই সকল উপদেশই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। উপদেশসকল সূত্রাকারে লিখিত। বুঝিতে হইলে প্রয়োজন হয় বিস্তারক্রমে বুঝাইবার। বুঝাইবে কে? যিনি বুঝিয়াছেন,—তিনিই ত? এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হইল গ্রন্থকর্ত্রী এই সকল তত্ত্ব শ্রীগুরুকৃপায় নিজে উপলব্ধি করিয়াছেন,—তাই তাঁহার বক্তব্য শুধু শোনা কথা নহে,—দেখা কথা। দেখা অর্থ এখানে উপলব্ধ সত্য। গ্রন্থকর্ত্রী শ্রীমতী রমা ব্যানার্জী শাস্ত্রদর্শী—শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণপাঠে কৃতবিদ্য। শুধু তাহাতেই কি তিনি উপদেশসমূহের এমন মর্মগ্রাহী প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিতে পারিয়াছেন? না তাহা নহে। তিনি গুরুকৃপাধন্য। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে গুরুকৃপা মিলিয়া সৃষ্টি করিয়াছে মণিকাঞ্চন যোগ। তাহারই ফল এই গ্রন্থ। সাধারণতঃ পাণ্ডিত্যের ফলে শাস্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা রচিত হয় তাহা হয়

দুর্বোধ্য গ্রন্থ, হইয়া দাঁড়ায় গ্রন্থি, যাহার জট কিছুতেই উন্মোচিত হয় না, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থ তাহার বিশেষ ব্যতিক্রম। বক্তব্য বলিতে যাইয়া গ্রন্থকর্ত্রী যে বিচার বিশ্লেষণের অবতারণা করিয়াছেন,—তাহা অপূর্ব,—যেমন সহজ, সরল তেমনি হৃদয়গ্রাহী। তাঁহার ব্যাখ্যা গৌড়ীয় ধারায় গুরুপরম্পরা অনুসারিণী। বিশেষতঃ পূর্বাপর সামঞ্জস্যের অভাব কোথাও দৃষ্ট হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে কত গ্রন্থই রচিত হইয়াছে, তম্মধ্যে এই গ্রন্থ যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইবে এমন কথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যাইতে পারে। এমনটি যে হইবে তাহার কারণও আমরা পূর্বেই বলিয়াছি—বলিয়াছি গ্রন্থকর্ত্রী গুরুকৃপাধন্যা। তবেই না তাঁহার ব্যাখ্যায় তত্ত্বের এমন সহজ সরল অপূর্ব স্ফুরণ—মাধুর্যের অমৃতপ্রস্রবণ। শ্রুতি স্বয়ংই ত বলিয়াছেন :

যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ। শ্বে. উ. ৬।২৩

যাঁহার পরমেশ্বরে পরাভক্তি আছে এবং তদনুরূপ ভক্তি গুরুতেও আছে, উপনিষদুক্ত তত্ত্বসকল সেই মহাত্মার নিকটই প্রকাশিত হয়;—হয় যে তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থ; তাই বলি ধর্মপরায়ণ সত্যজিজ্ঞাসু গ্রন্থপাঠে উপকৃত হইবেন —তৃপ্ত হইবেন।

বক্তব্য শেষ করিতে যাইয়া মনে পড়ে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের সেই মহান উক্তি—গ্রন্থেরও যাহা মূল বক্তব্য : "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" শ্রুতির প্রণতি নিবেদনেও এই ভূমার ধর্মই দেখিতে পাই,—তিনি আছেন,—আছেন সর্বত্র, সিদ্ধির ইহাই শেষ কথা—অনুভূতির ইহাই চরম অনুভূতি। আমরাও বলি শ্রুতির সঙ্গে সুর মিলাইয়া :

যো দেবো অগ্নৌ যো অপসু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

ওঁ তৎ সৎ

সন্তআশ্রম
কল্যাণী, নদীয়া

শ্রদ্ধাবনত
ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার

SITANSU MAITRA, M.A., PH.D.
SHAKESPEARE PROFESSOR OF ENGLISH
AND
HEAD OF DEPARTMENT
RABINDRABHARATI UNIVERSITY

1/1/1 NILMANI DUTT LANE
CALCUTTA 12

ভূমিকা

আমি যতদূর জানি, 'নবযোগীন্দ্র সংবাদ' অধ্যাপিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ। লেখিকা, শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজেই নয়, বাংলাদেশের বহু ভক্তজনের কাছে, শ্রীমদ্ভাগবত-কথার নিপুণ, হৃদয়গ্রাহী পরিবেশনের জন্য, অতি প্রিয়জন। তাঁর মধ্যে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে উপলব্ধির মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছে। তাই তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'কে আমি'তে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের প্রাঞ্জল অথচ সারগর্ভ ব্যাখ্যান দেখে, আমরা আশা করছিলাম যে, ভক্তিযাজনের গৌড়ীয় পন্থাটির, তিনি শ্রীমদ্ভাগবত অনুসরণ ক'রে, বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হবেন।

নবযোগীন্দ্রসংবাদ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। এই নবযোগীন্দ্র হলেন কবি, হরি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন। এঁরা ঋষভদেবের সন্তান। দেবর্ষি নারদ এঁদের মহামুনি বলে বর্ণনা করেছেন। এঁরা ব্রহ্মভূত, আত্মারাম পুরুষ। ত্রেতাযুগে মহারাজ নিমির যজ্ঞস্থলে এঁরা যদৃচ্ছাক্রমে এসে উপস্থিত হন। এঁদের কাছে মহারাজ নিমি, পরমাত্ম-তত্ত্ব, মায়া-তত্ত্ব, কর্মযোগ, অবতার-তত্ত্ব নিয়ে নানা প্রশ্ন করেন এবং এঁরা সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এই ব'লে শেষ করেন যে, মুমুক্ষু ও বুভুক্ষু—এই দুই জাতীয় মানুষের মধ্যে যাঁরা মুমুক্ষু তাঁদের পক্ষে এই কলিকালে সাধন অপেক্ষাকৃত সহজেই হবে এবং শুধু হরিসংকীর্তনে মগ্ন হয়েই তাঁরা শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করবেন। এমন কি সত্য-ত্রেতার জীবও কলিতে জন্মলাভ করতে ইচ্ছা করেন:

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্! কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ ॥

এই কলিতেই সংকীর্তনযজ্ঞের প্রসার। নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গ এই যজ্ঞের

প্রধান পুরুষ। লেখিকা নবযোগীন্দ্রসংবাদে অবতার বর্ণনা অংশে ও সংকীর্তনযজ্ঞের কলিতে প্রাধান্যের কারণ বিশ্লেষণ করে গৌড়ীয়বৈষ্ণবধারানুযায়ী ও গোস্বামিপাদগণের মতানুবর্তী হয়ে, শ্রীমদ্ভাগবতের এই অংশের যে অর্থবিস্তার করেছেন তা অতি মনোহর। যুক্তি ও ভক্তি—দুই মিশ্রিত হয়ে তাঁর এই ব্যাখ্যান অতি হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে এই গ্রন্থের যে কত আদর হবে তা আমি অনুমান করতে পারি। আর যাঁরা শুধু তত্ত্বের ও ও বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে সহৃদয় পাঠক, তাঁরাও 'নবযোগীন্দ্রসংবাদ' প'ড়ে নূতন ক'রে ভাববেন।

ইতি

শ্রীশীতাংশু মৈত্র

নিবেদন

কিছুদিন আগে শ্রীগুরুদেবের অপার করুণায় ও আমার পূজনীয় হিতৈষী-গণের শুভ ইচ্ছায় ও আন্তরিক আশীর্বাদে 'কে আমি' গ্রন্থখানি প্রকাশ পেয়েছে। সুধীসমাজে ও ভক্তসমাজে গ্রন্থখানি যথেষ্ট সমাদর ও প্রশংসা লাভ করেছে। লেখনীশক্তির গৌরববোধে আমি এ কথা উল্লেখ করছি না, কারণ ভগবান যেমন স্বয়ংপ্রকাশ, তাঁর শ্রীমুখনির্গলিত শাস্ত্রবাক্যও তেমনি স্বপ্রকাশ। তাই তাকে মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবার মত কৃতিত্ব বা স্পর্ধা আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধির বিন্দুমাত্র নেই। বরং প্রতিক্ষণেই শঙ্কা জাগে শাস্ত্রবাণী আমার লেখনীদোষে যেন বিকৃত বা অন্যভাবে রূপান্তরিত না হয়। কিন্তু ভুবনমঙ্গল শ্রীগৌরগোবিন্দের শুভ দৃষ্টিপাতে শাস্ত্রের মর্মকথা 'কে আমি' গ্রন্থের মাধ্যমে যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছেন তাতে ভক্তপ্রাণে পরম আনন্দের সঞ্চার হয়েছে—এ শুভ সংবাদটি সুবিখ্যাত ইংরাজী ও বাংলা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে যখন জানতে পারলাম তখন নূতন গ্রন্থ এই 'নবযোগীন্দ্রসংবাদ' প্রকাশে উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করলাম।

দ্বাপর যুগের অবসানে আচার্য বেদব্যাস-দ্বারে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র মহাপুরাণের প্রকাশ। নবযোগীন্দ্রসংবাদটি শ্রীমদ্ভাগবতের একটি বিশিষ্ট অংশ—মহাজনগণের পরম আস্বাদনের বস্তু। সংসারাবদ্ধ আমাদের মত একান্ত দুর্গত কলিহত জীবের হৃদয়ে যে প্রশ্নগুলি স্বভাবতঃ জাগে তারই সমাধান করা আছে এই প্রাচীন ইতিহাসটিতে। সাধকের সাধন বলতে যা কিছু, মহামুনি আত্মবিশারদ যোগীন্দ্রগণ তা উপাখ্যানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। শ্রীগুরুমহারাজের কৃপাকে অবলম্বন করে আমার এ গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়াস। আমার পরমারাধ্য পূজনীয় পিতৃদেব প্রতিক্ষণে আমাকে প্রেরণা দিয়েছেন—তাঁর সস্নেহ আশীর্বাদ আমার প্রধান সম্বল। আর আমার পরম হিতৈষী স্বনামখ্যাত শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার (শ্রীসুদর্শন পত্রিকার সম্পাদক) মহারাজজীর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। তাঁর দৈহিক অসুস্থতা সত্ত্বেও আমার জন্য কতই না কষ্ট বরণ করেছেন। আর যাঁর চরণপ্রান্তে

উপবেশন করে শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের সংবাদ শ্রবণের সৌভাগ্য হয়েছিল সেই আমার পরম পূজনীয় আচার্যদেব পণ্ডিতপ্রবর পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহোদয়ের কাছে আমি চিরঋণী। গ্রন্থপ্রকাশে আমি পরম ভক্তিভাজন ডক্টর শ্রীযুক্ত শীতাংশু মৈত্র মহোদয়কে (লব্ধপ্রতিষ্ঠ শেক্সপীয়র অধ্যাপক ও ইংরাজী বিভাগের অধ্যক্ষ, কলিকাতা; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) জানাই আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা। তাঁর গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজের মাঝেও অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রমের ফলেই এ গ্রন্থ প্রকাশ অতি সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হয়েছে। সাধনা প্রেসের পরম শ্রদ্ধেয়, শ্রীযুক্ত দেবদাস নাথ মহাশয় যিনি এই সুষ্ঠুভাবে প্রকাশের সকল ভার গ্রহণ করেছেন তাঁকে আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। আর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের ব্যবস্থাপনা ও যত্ন তো আছেই। তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দচরণে তাঁদের দীর্ঘ জীবন, অটুট স্বাস্থ্য ও শান্তি সমৃদ্ধি প্রার্থনা করি।

ভক্তগণ ও সুধীজন যদি এ গ্রন্থের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিজগুণে মার্জনা করে রসাস্বাদন করে তৃপ্তিলাভ করেন তাহলে আমার সকল শ্রম সার্থক হল বলে মনে করব।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবকৃপাপ্রার্থিনী
রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষয়সূচী

নবযোগীন্দ্রসংবাদ

[শ্রীমদ্ভাগবত পরিচয়]

শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র মহাপুরাণ সর্বশাস্ত্রমুকুটমণি। বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্, অষ্টাদশ পুরাণ—সর্বদর্শন—সকল শাস্ত্রের ক্ষতিপূরণ করেছেন শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র। সেই জন্য এই শাস্ত্রকে সর্বশাস্ত্রের পূরক বলতে পারা যায়, এমন কি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রেরও ক্ষতিপূরণ করেছেন শ্রীমদ্ভাগবত। তাই শ্রীমদ্ভাগবত গীতাপ্রপূর্তি। নিগমকল্পতরুর গলিত অর্থাৎ সুপক্ক ফলরূপে আচার্য বাদরায়ণ ব্যাসদেব এই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রকে বর্ণনা করেছেন।

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

—ভা. ১।১।৩

শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রকে গীতার প্রপূর্তি বলা হল, তার কারণ হচ্ছে গীতায় স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দের যে অমৃত উপদেশ তার মধ্যেও সাধকের কিছু অভাব থেকে যায়। ভগবানকে জানতে হলে তাঁকে দুই দিক থেকে জানতে হবেঃ (১) ভগবানের রসরূপতা অথবা লীলারূপতা এবং (২) ভগবানের ভক্তবাৎসল্য-গুণ। ভগবানের যত গুণ আছে তার মধ্যে ভক্তবাৎসল্যগুণই সবচেয়ে বেশী উপকারী এবং যে ভগবানে এই গুণ যত বেশী প্রকাশ পেয়েছে তিনি তত বেশী ভজনীয় বলে প্রমাণিত

হয়েছেন। গীতাশাস্ত্রে ভগবানের তত্ত্ববস্তু প্রচারিত হয়েছে কিন্তু ভাগবতে তত্ত্ব, রস, গুণ, লীলা সবই সুমীমাংসিত হয়েছে—তাই গীতাশাস্ত্রেরও পূরক শ্রীমদ্ভাগবত – এ কথা বলতে পারা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বেদকল্পতরুর গলিত ফল—এ কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেছেন—'গলিতমিত্যনেন রসস্য সুপাকিমত্বেনাধিকস্বাদুত্বমুক্ত্বা শাস্ত্রপক্ষে সুনিষ্পন্নার্থত্বেনাধিক-স্বাদুত্বং দর্শিতম্।' ফল যখন পেকে রসে ভরপূর হয় তখন তার আস্বাদ যেমন সর্বোত্তম—শাস্ত্রপক্ষে তেমনি সুসিদ্ধান্তিত হলে তার সর্বোচ্চ প্রশংসা। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ আস্বাদন করেছেন—'গলিতমিতি বৃক্ষপক্বতয়া স্বয়মেব পতিতং ন তু বলাৎ পতিত-মিতি স্বাদুসংপূর্ণত্বং নচোচ্চনিপাতনেন স্ফুটিতং নাপ্যনতিমধুরং চ।' ফল সুপক্ক হলে বৃক্ষ হতে আপনি খসে পড়ে—তখন তার আস্বাদ সম্পূর্ণ হয়। আর যতক্ষণ ফলে রসের পূর্ণতা না হয়, তাতে কাঁচা দোষ থাকে, ততক্ষণ মাটিতে খসে পড়ে না। বুঝতে হবে তখনও তার আস্বাদ সম্পূর্ণ হয়নি—তাকে আঘাত করে পাড়তে হয়।

বেদবৃক্ষের সর্বোর্ধ্ব শাখা বৈকুণ্ঠধামবাসী শ্রীমন্নারায়ণ। অযাচিত-কৃপাকারী বৈকুণ্ঠবিহারী নিজপুত্র ব্রহ্মাকে চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করেন। লোকপ্রজাপতি পিতামহ ব্রহ্মা হলেন এর দ্বিতীয় শাখা—পরে ব্রহ্মা নারদকে এ শাস্ত্র উপদেশ করেন। দেবর্ষিপাদ পিতার কাছে অযাচিতভাবে এই কৃপার দান পেয়ে উত্তমবস্তুটি ব্যাসশাখায় নিহিত করেন। ব্যাসদেব পরে নিজ তপস্যালব্ধ পুত্র শ্রীশুকদেবকে এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করান।

শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র কৃষ্ণতনুসম। এটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নির্গলিতবাক্য—'ভাগবতরূপে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ অবতার'। পদ্ম-পুরাণের ঋষিও এই কথাই বলেছেন—শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের ধ্যান করে প্রণাম করেছেন ঃ

তমাদিদেবং পুরুষং প্রধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।
অপারসংসারসমুদ্রসেতুং ভজামহে ভাগবতস্বরূপম্॥

ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব মাতৃগর্ভে ষোল বছর বাস করেন—এটি শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের মত। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণমতে মাতৃগর্ভে শুকদেব বার বছর ছিলেন। শ্রীশ্রীরাধামাধবের নিত্যলীলায় শ্রীমতীর নিকুঞ্জের শুকপাখীই ভাগবতীকথা জগতের মাঝে প্রকাশ করার জন্য শুকদেব হয়ে এসেছেন—তিনি ছাড়া সে কথা আর কেই বা বলবে? আজন্মমুক্ত, অপাপবিদ্ধ, নিত্যশুদ্ধ সুকুমার নবীন ব্রহ্মচারী শুকদেব এই মায়াময়ী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে স্বীকৃত হন নি। যাঁর মায়া—ভগবানের শ্রীমুখের বাক্য—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। —গীতা ৭।১৪

সেই মাধবকে সাক্ষী রেখে জন্মগ্রহণ করলেন। জন্মগ্রহণমাত্রে শুকদেব শ্রীকৃষ্ণচরণে ও পিতামাতার চরণে প্রণাম করে বনে চলে গেলেন। ব্যাসদেব পুত্রমমতায় কাতর হয়ে তাঁর অনুগমন করলেন। পথের মাঝে রমণীরা নগ্নযুবা শুকদেবকে দেখে লজ্জিত হলেন না—কিন্তু বৃদ্ধ, বসনপরিহিত ব্যাসদেবকে দেখে লজ্জিত হয়ে নিজেরা বস্ত্রসংবরণ করলেন। ব্যাসদেব এ দৃশ্য দেখে কুতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলে তাঁরা উত্তর দিলেন—'ওগো ঠাকুর, তোমার যে স্ত্রীপুরুষভেদবুদ্ধি আছে কিন্তু তোমার পুত্রের সে ভেদবুদ্ধি

একেবারেই নেই; তাই তাকে দেখে আমরা লজ্জিত হই নি, কিন্তু তোমাকে দেখে আমরা লজ্জিত হয়েছি।' পুত্র শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁর কোন বাহ্যাবেশ নেই, অথচ ব্যাসদেবের অতি দুর্লভবস্তু ভাগবতশাস্ত্রজ্ঞান পুত্রকে দিতে না পারলেও তৃপ্তি নেই। কি করেন—তখন সমগ্র ভাগবতশাস্ত্র আলোচনা করে কি উপায়ে পুত্রকে ফিরিয়ে আনা যায় চিন্তা করতে লাগলেন। এমন সময় শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের শ্লোকে দৃষ্টি পড়ল:

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থাপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ভা. ১।৭।১০

ভগবান হরির এমনই রূপ, গুণ, লীলামাধুর্য যে তার ফলে আত্মারাম মুনিরা, যাঁদের পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের ফলে সর্ব হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়ে গেছে—সর্বসংশয়ের ছেদন হয়েছে—তাঁরাও আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। পরমমাধুর্যমণ্ডিত শ্রীভগবান সৌন্দর্যের লোভ দেখিয়ে আত্মারাম মুনিগণকেও আকৃষ্ট করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেছেন:

ব্রহ্মানন্দ হইতে কোটিগুণ লীলারস।
আত্মারামে আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণবশ॥

শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের এ বাক্যে বেদব্যাসের পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে। তাই শুকপাখীকে ধরবার জন্য যেমন ব্যাধ ফাঁদ পাতে তেমনি ব্যাসদেব ব্যাধের মত শুকদেব-পাখীকে ধরবার জন্য ভাগবতের শ্লোকরূপ ফাঁদ রচনা করলেন:

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চমালম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
বৃ্ন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্তিঃ॥

—ভা. ১০।২১।৫

শ্যামসুন্দরের এই মধুরমূর্তিটি গোচারণ থেকে ফিরবার সময় শ্রীমদ্ভাগবতকার বর্ণন করেছেন। মাথায় ময়ূরপাখার চূড়া, ভুবন-ভুলান নটনভঙ্গি, মোহনবেণুকর, সকলের মনপ্রাণ হরণ করেন। পরণে পীতবসন, গলদেশ হতে শ্রীচরণ পর্যন্ত লম্বিত পাঁচরঙ্গের ফুলে গাঁথা বৈজয়ন্তীমালা, এক কানে তাঁর কর্ণিকার কুসুম। সিদ্ধান্ত হচ্ছে যখন যে সখার দিকে দৃষ্টি দেবেন তার চিত্ত হরণ করবেন। 'কৃষ্ণের অধররস ধ্বনিরূপে পাইয়া পরিণাম'—অধরে মুরলী—তার ছিদ্রপথ গোবিন্দের অধররসে ভরা—বাঁশী বাজাতে বাজাতে নিজপ্রিয়ভূমি শ্রীবৃন্দাবনে সখাসঙ্গে প্রবেশ করছেন। পিতা ব্যাসদেব ব্যাধদের এ মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছেন —শুকদেবকে ধরবার জন্য, কিন্তু কৃষ্ণের বংশীনিনাদ যতই মুগ্ধকারী হোক না কেন—আত্মারাম সমাহিত-চিত্ত মুনি শুকদেবের কানে প্রবেশ করতে পারে না। কারণ—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ গীতা ৩।৪২

ইন্দ্রিয় মনে, মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি আত্মাতে, আত্মা পরমাত্মাতে সমাসীন। কাজেই শব্দ ইন্দ্রিয়পথে প্রবেশ করতে পারে না,

কিন্তু শব্দ প্রবেশ না করলেও লীলাত্মক বাক্যের আনন্দের অপ্রাকৃত একটি সূক্ষ্ম রেশ শুকদেবের আত্মাকে আলোড়িত করতে লাগল। তখন ব্রহ্মানন্দ হতেও এই আনন্দের পরিমাণ বাড়তে লাগল। শুকদেবের শব্দের আক্ষরিক অর্থবোধ হয় নি বটে, কিন্তু আনন্দের এক অপূর্ব অনুভূতি তাঁর মনে প্রাণে দেহে ইন্দ্রিয়ে এমনই এক শিহরণ জাগিয়েছে যে প্রতিক্ষণে মনে হচ্ছে এ সুরের রেশ যেন চিনি চিনি, যেন জানি জানি। এই চেনা এবং জানার মাত্রা ক্রমশ বাড়তে লাগল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিও স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। অবশেষে ভগবানের লীলা-প্রকাশিকা বাণীর আকর্ষণ শুকদেবের হৃদয়ে দোলা দিল—যার ফলে পরমাত্মা আত্মাতে, আত্মা বুদ্ধিতে, বুদ্ধি মনে, মন ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয় দেহে ফিরে এল। ঋষি তো প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে শোনেন না—তপস্যাপূত কানে শোনেন। এ বংশীধ্বনি বড় পরিচিত ও বলবান। কাজেই সেটি ফিরে না এসে সেই ধ্বনিজাত আনন্দ-লীলারস পরমাত্মাতে গিয়ে পৌছুল। অলক্ষ্য আকর্ষণে ব্রহ্মানুভব শিথিল হল। ধ্যান ভেঙ্গে গেল শুকদেবের। স্মৃতি ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে। তারপর যখন লীলার মাধ্যমে শ্রীবৃন্দাবন-ধামের খবর পেলেন, তখন ধাম ও শ্যাম একসঙ্গে হওয়ায় তাঁর আর কোন সংশয়ই রইল না। মনে পড়ল স্পষ্ট করে—'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্'।

শ্রীমদ্ভাগবতের মীমাংসাগুলি সব সুসিদ্ধান্তিত। অন্য শাস্ত্রের ত্রুটির এখানে পূরণ হয়েছে। তাই একে সর্বশাস্ত্রের পূরক বলা হয়েছে। ঋষি বললেন—'গলিতম্ ফলম্'। যেমন একটি দৃষ্টান্ত

দেওয়া যায়—অন্যান্য পুরাণে উল্লেখ আছে—সগরবংশের সন্তানেরা কপিলমুনির ক্রোধবহ্নিতে ধ্বংস পেয়েছিল—কিন্তু সে কথা সমীচীন নয়। শ্রীমদ্ভাগবতের সুসিদ্ধান্ত হল—নিজেদের ক্রোধবহ্নিতে তারা প্রজ্জ্বলিত হয়ে ধ্বংস পেয়েছিল। তা না হলে কপিলদেব ভগবানের অবতার—শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ—তাঁর ক্রোধ কেমন করে সম্ভব হবে? গীতাবাক্যে বলা আছে:

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। গীতা ৩।৩৭

প্রাকৃত রজোগুণ থেকে ক্রোধের উৎপত্তি। সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত এইভাবে অন্যশাস্ত্রের অপসিদ্ধান্তকে সুসিদ্ধান্তে পরিণত করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র জীবের গতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন—জীবের জন্ম এবং মৃত্যু উভয়ই সুনিয়ন্ত্রিত। 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।' শ্রীনৈষধকাব্যের উদয়ে যেমন অন্য কাব্যপ্রতিভা ম্লান হয়ে গিয়েছিল—তেমনি শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের আবির্ভাবে অন্যশাস্ত্রের প্রাধান্য লোপ পেয়েছিল। এ শাস্ত্র শুনবার বাসনামাত্র যার হৃদয়ে জেগেছে অনাদিরাদি শ্রীগোবিন্দ তার হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন। তখন বিশ্বনাথ মন্নাথ হন। প্রেমেতেই একমাত্র হরিকে হৃদয়ে বাঁধা যায়—চিনির পুতুলের যেমন সবটাই চিনি দিয়ে গড়া বলে সর্বাংশে গ্রহণীয়, এর ত্যাজ্য অংশ কিছু নেই—শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রও তেমনি স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দের লীলারসে গড়া—এর সবটাই গ্রাহ্য—কোনটিই হেয় নয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে মুমূর্ষু জীবের কর্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন—তার উত্তরে শ্রীশুকদেব জানিয়েছেন:

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্॥ ভা. ২।১।২

আমি অর্থাৎ আত্মার খবর যাদের জানা নেই তাদের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নেই, কিন্তু এই 'আমি'কে যারা জানতে চায়—আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু যারা অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপদ্ম যারা পেতে চায় তাদের পক্ষে সর্বাত্মা ভগবান ঈশ্বর হরির শ্রবণ কীর্তন ও স্মরণ একান্ত প্রয়োজন।

তস্মাদ্ভারত সর্বাত্মা ভগবান্ হরীরিশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥ ভা. ২।১।৫

খট্বাঙ্গরাজা অর্ধমুহূর্ত পরমায়ু জেনে স্বর্গভূমি, ভোগের ভূমি ত্যাগ করেছেন। সাধনভূমি ভারতের মাটিতে ফিরে এসে ভগবানে শরণাগত হয়ে ভক্তিঅঙ্গ যাজন করে ভগবান হরিকে লাভ করেছিলেন। আর মহারাজ পরীক্ষিতের তো সপ্তাহকাল পরমায়ু—তা ছাড়া পাণ্ডববংশের সম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম—এতে তাঁর জন্মগত অধিকার, কিন্তু মুনিগলে মৃতসাপ জড়িয়ে দেওয়ার ফলে তিনি সে সম্পত্তি হারিয়ে ফেলেছেন বলে অনুতপ্ত হয়েছেন। উত্তরাদেবীর গর্ভে বাসকালে মহারাজের কৃষ্ণদর্শন হয়েছিল। মাতা উত্তরাদেবী গর্ভস্থ সন্তানকে রক্ষা করবার জন্য ব্যাকুল। এখন প্রশ্ন হতে পারে কৃষ্ণদর্শন লাভ করার পরেও তাঁর পুত্রমমতা কেন? ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থের টীকায় শ্রীজীব গোস্বামিচরণ এ প্রশ্নের সমাধান করেছেন। লৌকিক সম্বন্ধে কৃষ্ণ মামাশ্বশুর বলে উত্তরাদেবী কৃষ্ণপাদপদ্মদর্শনলাভের পরও

তাঁর সাক্ষাৎভাবে সেবা করতে পারেন নি। 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।' তাই পুত্র দিয়ে সেই সেবার সাধ পূর্ণ করবেন। উত্তরাদেবীর গর্ভস্থ সন্তানকে রক্ষা করবার জন্য ভগবান গদা ও চক্র নিয়ে গর্ভে প্রবেশ করেছেন। শ্রীচক্রবর্তিপাদ বলেছেন—ভগবানের ইচ্ছামাত্রে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র নিবারিত হত কিন্তু ভক্তবাৎসল্যে ভগবানের আবেশ ভুল হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র সাধককে ভাগবতীভক্তি উপদেশ করেছেন—ভক্তিমিশ্র কর্মসাধককে চিত্তশুদ্ধি ফল দান করে, ভক্তিমিশ্র জ্ঞান সাধককে ব্রহ্মানুভূতি, ও ভক্তিমিশ্র যোগ সাধককে পরমাত্মানুভূতি দান করে, কিন্তু শুদ্ধাভক্তি, কেবলা ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মকে আকর্ষণ করে এনে দেন। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম দুরারাধ্য বস্তু। ভক্তিমহারানী কৃষ্ণকে সাধকের প্রেমে মজিয়ে সাধকের হৃদয়ঘরে এনে দিতে পারেন—এতদূর সামর্থ্য তাঁর আছে।

> কৃত্বা হরিং প্রেমভাজং প্রিয়বর্গসমন্বিতং।
> ভক্তিবশীকরোতীতি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী মতা॥
>
> —ভ. র. সি. পূ., ১ম লহরী ৪১

ভক্তি যে ভগবানকে সাধকের কাছে নিয়ে আসেন তার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল ধ্রুব। ধ্রুবের তপস্যার সিদ্ধিকালে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ তাঁকে বৈকুণ্ঠধামে নিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। কারণ তাতে ভক্তের মহিমা বাড়ে না। মধুবনে শ্রীযমুনাতীরে ভগবান নিজে এলেন—শ্রীশুকদেব বলেছেন, ভক্তকে দেখা দিতে ভগবান এলেন না—ভক্তকে দেখতে এলেন

—'মধোর্বনং ভক্ত দিদৃক্ষয়া গতঃ।' দেখতে এলে দেখা দেওয়া আপনিই হয়ে যায়। ধ্রুব ভক্তিভূষণে কেমন সেজেছে সেটি দেখবার জন্য ভগবানের ভারী লোভ। শ্রীএকাদশে ভগবান প্রিয়সখা উদ্ধবজীর কাছে বলেছেনঃ 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ।' ভক্তি দ্বারাই একমাত্র আমি গ্রাহ্য হই। গীতাবাক্যেও বলা আছেঃ

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। গী. ১৮।৫৫

আমার স্বরূপ কেমন অথবা আমার ধাম, লীলা, পরিকর কেমন, এটি ভক্তিদ্বারা যেমন করে জানা যায় এমনটি কিন্তু অন্য কোন উপায়ে জানা যায় না।

এই হরিভক্তি সুদুর্লভা। শ্রীভগবানের মন্তব্যবাক্যঃ

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ গী. ৭।৩

ভক্তি কোনও মূল্য দিয়ে যদি কিনতে পাওয়া যায় তাহলে কিনবার উপদেশ মহাজন দিয়েছেন।

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতামতি ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমেব মূল্যমেকলং জন্মকোটি সুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

কৃষ্ণভক্তি লাভ করার কোন উপায় শাস্ত্রকার বলেন নি—লৌল্য অর্থাৎ লোভ একটা মূল্য আছে বললেন—কিন্তু তাঁর ঠিকানা বললেন না। একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবান যদি নিজে এ ভক্তি দান করেন তবে পাওয়া যায়। কিন্তু ভগবান সাধকের ভজনের বিনিময়ে ভজনের অনুরূপ সম্পদ দান করেন। এটি

তাঁর চিরকালের প্রতিজ্ঞা—এমনকি মুক্তি পর্যন্ত সাধককে দান করেন, কিন্তু ভক্তিপ্রিয় মাধব ভক্তিসম্পদটি স্বেচ্ছায় কাউকে দিতে চান না। কারণ ভক্তি যাকে দেবেন তার কাছে নিজেকে বাঁধা পড়ে থাকতে হবে। ইচ্ছা করে কে আর অপরের কাছে বাঁধা পড়ে থাকতে চায়? শ্রীগোবিন্দের এ কৃপণতা-দোষটি শ্রীশুকদেব সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেছেন ঃ

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং।
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ॥
অস্ত্যেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো।
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥ ভা. ৫।৬।১৮

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেছেন ঃ

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥

তাহলে এ প্রেমভক্তি লাভের উপায় কি? মহাজনগণ সিদ্ধান্ত করেছেন—কৃষ্ণকৃপয়া তদ্‌ভক্তকৃপয়া বা। শ্রীমাধুর্য-কাদম্বিনী গ্রন্থে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর মশাইএর বাক্য—ভক্তকৃপায় ভক্তিলাভ সহজ এবং এ দৃষ্টান্ত বহু দেখা যায়। বাক্য আছে ঃ

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

—ভা. ৫।১৮।১২

'কৃষ্ণের যতেক গুণ ভকতে সঞ্চরে', তাহলে কৃষ্ণের ভক্তিদান সম্বন্ধে যে কৃপণতা সেটি ভক্তে সঞ্চারিত হবে না? না, তা হবে না—এ বিষয়ে ভক্ত উদার। ভক্তের যোগ্য গুণই সে ভগবানের কাছ থেকে লাভ করে। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলেছেন ভক্তি পেলে কৃষ্ণ পাওয়া যায়। ভক্তকৃপায় ভক্তিলাভ—এ বিষয়ে ভক্তিপথের মহাজন প্রহ্লাদ মহারাজ ও রাজর্ষি ভরতের চরম জন্ম জড়ভরত জন্মের বাক্য উদাহরণ আছে। প্রহ্লাদবাক্য ঃ

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

—ভা. ৭।৫।৩২

পিতা হিরণ্যকশিপুকে প্রহ্লাদ বলেছেন, গুরু ষণ্ডামর্ক অন্যান্য বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করলেও ভক্তির সন্ধান তাঁরা জানেন না। পিতা পুত্রের এ ঔদ্ধত্যে ক্রুদ্ধ হয়েছেন; বলেছেন, ভক্তির সন্ধান যখন তারা জানে না, তখন ভক্তিধর্ম শাস্ত্র-বহির্ভূত। প্রহ্লাদ বলেছেন, না পিতা, তাঁদের ভক্তি লাভ হয় নি। প্রমাণ হবে কেমন করে জানেন—তাঁদের বুদ্ধি ভগবানের পাদপদ্মকে স্পর্শ করে নি। কি করে বুঝা যাবে যে স্পর্শ করে নি? বুদ্ধি যদি ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করে তাহলে যতরকম অনর্থ আছে সব নিঃশেষে দূরীভূত হয়ে যাবে। অনর্থ বলতে ভগবৎপ্রাপ্তিতে যা কিছু বাধা সৃষ্টি করে তাকেই বুঝায়। ঘরে আলো জ্বাললে যেমন অন্ধকার চলে যাবে, এটি স্বতঃসিদ্ধ।

আলো জ্বালা হয়েছে অথচ অন্ধকার যায় নি,—অন্ধকার যেমন ছিল তেমনি আছে, এ যেমন হয় না, অন্ধকার যদি না যায় তাহলে বুঝতে হবে আলো জ্বালা হয় নি। তেমনি বুদ্ধি ভগবৎপাদপদ্ম স্পর্শ করেছে অথচ অনর্থ যায় নি—এও হতে পারে না। ভগবানের পাদপদ্মে বুদ্ধিবৃত্তি স্পর্শ করবার একটি মাত্র উপায় হল মহাজন ভক্তজনের চরণরজে মস্তককে অভিষিক্ত করা। ভক্তকৃপানুগামিনী ভগবৎকৃপা। বিষ্ণুনৈবেদ্যে যেমন আগে তুলসী অর্পণ করে রাখা হয়—তাতে বুঝা যায়—এটি অন্য কোন দেবতার ভোগ্য নয়—কৃষ্ণেরই ভোগ্য। ভক্তকৃপাও তেমনি জীবের ওপর তুলসী অর্পণের মত ; যার ওপর ভক্তকরুণা হয়েছে বুঝতে হবে ভগবানের কৃপা পেতে তার দেরী নেই। জড়ভরতও সিন্ধুসৌবীরাধিপতি রহূগণের কাছে তাই বলেছেন ঃ

রহূগণৈ তত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্বপনাদ্ গৃহাদ্বা।
নচ্ছন্দমা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥

—ভা· ৫।১২।১২

তপস্যা, বৈদিক যাগযজ্ঞ, অন্নদান, গার্হস্থ্য ধর্ম, বেদাধ্যয়ন, অথবা জল অগ্নি সূর্যের উপাসনা, কিছুতেই শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয় না, যে পর্যন্ত মহাপুরুষের চরণরজে মস্তক অভিষিক্ত না হয়।

দুরন্ত গাভীকে নিয়ে যেতে না পারলে তার বাছুরটিকে যদি নিয়ে যেতে পারা যায় তাহলে গাভী তার পেছনে পেছনে

আপনিই আসবে। তেমনি ভগবান হলেন গাভীর মত—তাঁকে পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু বৎসরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে যদি ধরতে পারা যায়, তাহলে ভগবান আপনিই ধরা দেবেন। কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি বলা হয়েছে। কবিরাজমশাইরা যেমন তাঁদের তৈরী বড়িতে ছাগলের দুধের অথবা পাতার রসের ভাবনা দেন অর্থাৎ একবার তাতে ডোবান একবার ওঠান তেমনি এখানেও মনটিকে একবার কৃষ্ণভক্তিতে ডুবাতে হবে, একবার ওঠাতে হবে। লোভমূল্যে ভক্তি পাওয়ার ব্যবস্থা কিন্তু এই লোভ কোথায় পাওয়া যায় তা বলা হল না। আমরা মহাজনের শ্রীমুখে বড় নিরাশার বাণী শুনেছি ঃ

তত্র লৌল্যমেব মূল্যমেকলং।
জন্মকোটি স্বকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

কোটি জন্মের সুকৃতিতেও এ লোভ পাওয়ার উপায় নেই। লোভই ভক্তি পাওয়ার একমাত্র মূল্য—তা যদি কোটি জন্মের সুকৃতিতে না মেলে তাহলে তো হরিভক্তি সুদুর্লভা হয়েই রইলেন। এতে সমাধান হল এইটি – লোভ পাওয়ার একমাত্র উপায় হল লোভীলোকের সঙ্গ করা। লোভ যাদের হয়েছে তাদের পায়ে পড়া। অরুচির রোগীর রোগ সারাবার উপায় হল রুচি করে যারা লোভে পড়ে খায় তাদের খাওয়া দিনের পর দিন দেখান—দেখতে দেখতে কোন সময়ে সেই অরুচির রোগীরও মনে হবে—আমি কবে এমন করে রুচি করে খাব? আমরাও তেমনি ভগবৎ অরুচির রোগী—ভগবানের নাম, রূপ-গুণ-লীলা, শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-বন্দনে আমাদের অরুচি মজ্জায় মজ্জায় দানা বেঁধেছে।

এ রোগ অনাদিকাল থেকে শিকড় গেড়েছে। এখন প্রশ্ন : এ রোগ সারাবার উপায় কি ? যাঁরা ভজনলোভী, সাধুগুরু-বৈষ্ণব পরিপূর্ণ আস্বাদে, লোভে পড়ে, ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-শ্রবণ-কীর্তন প্রভৃতি করেন, ইন্দ্রিয়বৃত্তি, মন বুদ্ধি যাঁদের স্বতঃই ভগবানে উন্মুখ—নামামৃত পান ছাড়া যাঁদের প্রাকৃত অন্নজলগ্রহণে শরীর ক্ষীণ হয়, দেহ বিকল হয়—সেই সাধু-মহাজনের চরণপ্রান্তে বসে তাঁদের লোভের কণা আঁচল পেতে ভিক্ষা করতে হবে। রাজভোগ আস্বাদনে ভিখারীর অধিকার নেই সত্য কিন্তু সেই ভিখারী যদি ধনীর দুয়ারে পড়ে থেকে আর্তিভরে জানায় তাহলে ধনী করুণাপরবশ হয়ে তাঁর নিজ আস্বাদ্য রাজভোগের কিছু অংশ ভিখারীকে দিলে সে তো রাজভোগের আস্বাদ পেয়ে যেতে পারে। এইভাবে ধনীর অধরামৃত রাজভোগ দরিদ্র ভিখারী পেয়ে ধন্য হয়—তেমনি সাধু-গুরু-বৈষ্ণব, ভজনের আস্বাদনে যাঁরা ধনী। কারণ এ জগতের নশ্বর সম্পদকে মনীষিগণ ধনের মধ্যে গণনা করেন না। ভগবৎপাদপদ্মে প্রেমই মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—এ ধন কখনও বিনাশ পাবে না। শ্রীপাদ শ্রীল রামদাসবাবাজী মহারাজের শ্রীমুখের অমৃত বাণী :

'প্রেমধন নাই যার—জগমাঝে সেই দরিদ্র।'

সেই ধনীর চরণপ্রান্তে আশ্রয় লাভ করে আর্তিভরে জানাতে হবে—'ওগো প্রেমের মহাজন, ওগো ভক্তিরত্নের ভাণ্ডারী, তোমার লোভের কণা, কৃপা করে আমাকে দাও।' ভিখারী যেমন আর্তি জানায়, চীৎকার করেই চলে, তার প্রার্থনা যেমন

থামে না—আমাদেরও তেমনি নিজেদের মধ্যে ভিখারীর চেহারা ফোটাতে হবে—দৈন্যে হৃদয় ভরিয়ে আর্তি জানাতে হবে—প্রার্থনাকে নিরন্তর জাগিয়ে রাখতে হবে—কখনও ম্লান করা চলবে না। অভিমান গর্ব অহঙ্কারের উঁচু মাচা থেকে নেমে এসে নিজেকে ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। এ আর্তিশ্রবণে সাধুর হৃদয় গলবে, কারণ তাঁরা অকারণে দয়ালু। তখন তাঁদের নিজস্ব ভজনসম্পদের কণা কৃপা করে দিতে পারেন—তাতে আমরা কৃতকৃতার্থ হয়ে যাব।

এই ভক্তির আবার স্তরবিচার আছে—ভক্তি সর্বোচ্চ সীমা লাভ করেছেন ব্রজরামাদের গোবিন্দপ্রেমে। ব্রজরমণীদের এই প্রেমের নামকরণ করেছেন শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ—উন্নতোজ্জ্বল-রস। উজ্জ্বলরস বলতে মধুররসকে বুঝায়—আর উন্নত কেন অর্থাৎ ব্রজবালাদের গোবিন্দপ্রীতি এতই উঁচুতে যে তার নাগাল কেউ পাচ্ছেন না। কেউ বলতে যে কেউ নয়—মুকুন্দমহিষীরাও এ প্রেমের সন্ধান জানেন না। গোপবালাদের প্রেমে কোন হেতু নেই—কোন কারণে তাঁরা গোবিন্দ ভালবাসেন না—প্রেমে হেতু থাকলেই প্রেম নিন্দিত হয়— নির্হেতুক প্রেমই একমাত্র অনিন্দিত। তাঁরা গোবিন্দ ভাল না বেসে পারেন না, তাই ভালবাসেন। ব্রজরামাদের এই নিষ্কলুষ প্রেমের প্রশংসা করে শ্রীগোবিন্দ সর্বসময়ে স্বীকার করেন—তোমরা যে আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছে এটি নিরবদ্য অর্থাৎ অনিন্দিত। তোমাদের এ প্রেমের ঋণ শোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—এ প্রেমের কাছে ভগবানকে ঋণী থাকতে হয়েছে এবং ঋণশোধের জন্য

শ্রীগোবিন্দকে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে আবির্ভূত হতে হয়েছে। শ্রীগৌরসুন্দর ব্রজরামাদের এই মালিন্যহীন প্রেম নিজে আস্বাদন করে আচণ্ডালে অবিচারে বিনামূল্যে বিতরণ করছেন। মহাজন বলেছেন :

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্যন্ত অন্যের কা কথা॥

শ্রীল শ্রীপাদ রামদাসবাবাজী মহারাজ কীর্তন প্রসঙ্গে গেয়েছেন:

গৌর আমার বড় অবতার রে—
পতিতেরে বিলাওল প্রেমের ভাণ্ডার রে—

গৌরসুন্দরের বড় অবতারত্ব তাঁর বড় দাতৃত্বে। মহাভাব-স্বরূপিণী ব্রজগোপীর হৃদয়মঞ্জুষার এ ভক্তিরত্নের ভোক্তা হচ্ছেন একমাত্র শ্রীশ্যামসুন্দর। শ্যামরস শ্যামবধূকে নিরন্তর পান করানই রাধা প্রভৃতি ব্রজরামার একমাত্র লক্ষ্য। ব্রজবালারূপ রত্নমালার মধ্যমণি বা পদক হচ্ছেন কৃষ্ণচন্দ্র। গোপবালাদের প্রেমের অনুরূপ করে শ্রীকৃষ্ণভজন—এর নামই 'রাগানুগা' ভক্তি। এ ভক্তি এতদিন শাস্ত্রে ধরা ছিল। আচরণে যে কখনও হতে পারে সে সন্ধান কেউ জানত না। শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিহত জীবের কাছে রাগানুগা ভক্তির সন্ধান দিলেন। এ আনন্দসংবাদ জীবের কাছে পৌঁছে দিলেন যে, জীবও গোপীর মত করে গোবিন্দ ভালবাসতে পারে। গৌর এই পরমার্থের দাতা—নন্দনন্দনই শচীনন্দন—

নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই॥

মহাভাবের প্রেম-উষ্মায় কাঁচা শ্যাম রসে পেকে ভরপূর হয়ে পাকা গৌর হয়েছেন। তত্ত্ব, লীলা, রস, ভাব, করুণা যে কোন দিক দিয়ে বিচার করা যাক না কেন দেখা যাবে গৌরের মত এমন মিষ্টি ভগবান আর হয় না—সর্বাবতারী' গৌরহরি সহায়সম্বলহীন সাধনভজনহীন, একান্ত দুর্গত পতিত কলিজীবকে পরমার্থমণি দান করেছেন—কলিজীবের উপাস্য হলেন শ্রীগৌরসুন্দর। পতিত জীবের একমাত্র গতি পতিতপাবনের চরণতল।

সর্বময় অধীশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের এবং তাঁরই অভিন্ন-কলেবর গৌরতত্ত্ব-মূর্তিমান শ্রীপাদ শ্রীনিতাইসুন্দরের একনিষ্ঠ পূজারী ভজনলোভী, তীব্রবৈরাগী, জাতরতি প্রেমময় শ্রীবিগ্রহ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীপাদ শ্রীল বাবাজীমহারাজের শ্রীচরণে আমার অন্তরের অন্তস্তল হতে প্রণতি-অর্ঘ্য নিবেদন করে তাঁর কৃপাশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবকৃপাপ্রার্থিনী

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

পটভূমিকা

শ্রীভাগবতশাস্ত্র দ্বাদশ স্কন্ধে সম্পূর্ণ। তার মধ্যে একাদশ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে শ্রীনবযোগীন্দ্র উপাখ্যান শ্রীশুকদেব আরম্ভ করেছেন। পদ্মপুরাণের ঋষি শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের যে ধ্যান করেছেন তাতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অভিন্ন তনু বলা হয়েছে—এর মধ্যে একাদশ স্কন্ধকে ললাটদেশ বলা আছে। ললাটে যেমন ভাগ্যরেখা অঙ্কিত থাকে, একাদশ স্কন্ধে তেমনি জীবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের সকল ব্যবস্থা, জীবের যা কিছু একান্ত প্রয়োজন, পরমার্থ সম্পদলাভে জীবের সাধনপথ, আত্যন্তিক কল্যাণ লাভের ব্যবস্থা—পরম শ্রেয়োলাভের পন্থা শাস্ত্রমাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। নবযোগীন্দ্র প্রসঙ্গটি প্রাচীন ইতিহাস—ত্রেতাযুগে বিদেহরাজ নিমির সভায় নয়জন যোগীন্দ্রের সঙ্গে মহারাজ নিমির কথোপকথন। সে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন দেবর্ষিপাদ নারদ যিনি ব্রহ্মাণ্ডের দূত—জীবের প্রতি করুণায় যাঁর চিত্ত সতত উদ্বেলিত, মানুষের জন্য যাঁর প্রাণ কাঁদে—তাদের পরমার্থলাভের পথ সুগম করবার জন্য যাঁর সতত প্রয়াস সেই পরম করুণ ঋষি দ্বারকা মন্দিরে বসে এ উপাখ্যান উল্লেখ করেছেন। কথা-পরিবেশনে তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দ যাঁকে পিতৃত্বে বরণ করেছেন সেই বসুদেবের হৃদয়ের আকুতিভরা প্রশ্ন। বক্তার বলাটি সহজ, স্বচ্ছ, স্বতঃস্ফূর্ত হয় যদি শ্রোতার দিক থেকে প্রশ্ন থাকে। এইভাবে তৃতীয় পাণ্ডব

অর্জুনের প্রশ্নে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হতে গীতামৃত ক্ষরণ সম্ভব হয়েছে। শ্রীউদ্ধবজীর প্রশ্নে শ্রীগোবিন্দ নানা তত্ত্বকথা উপদেশ করেছেন। সে প্রসঙ্গ উদ্ধবগীতা নামে শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের একাদশ স্কন্ধে স্থান পেয়েছে।

নবযোগীন্দ্র উপাখ্যানের বক্তা দেবর্ষিপাদ নারদ একদিন দ্বারকা ভবনে শুভাগমন করেছেন। দ্বারকায় আসা নূতন নয়। শুকদেব বলেছেন ঃ

> গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং কুরূদ্বহ।
> অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণদর্শনলালসঃ॥ ভা. ১১।২।১

গোবিন্দের বাহু যে দ্বারকানগরীকে নিয়ত রক্ষা করছে সেখানে নারদ বারে বারে আসেন—উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম দর্শন। নারদের প্রতি দক্ষপ্রজাপতির অভিশাপ আছে তিনি বহুদিন একাদিক্রমে একস্থানে বাস করতে পারবেন না—তাঁকে ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরে বেড়াতে হবে। কিন্তু দ্বারকাভূমি দক্ষের অভিশাপের আওতায় পড়ে না। তাই দেবর্ষিপাদের পক্ষে এখানে দীর্ঘদিন বাস করতে অসুবিধা নেই। একথা রসিক টীকাকার শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণ-উপাসনা তো ভক্তমাত্রেই করেন। কিন্তু দেবর্ষিপাদের কৃষ্ণ-উপাসনার প্রকারভেদ আছে। এ স্রক্-চন্দন-তুলসীর দ্বারা অর্চনা নয়। হরির তুষ্টিবিধানকেই পরধর্ম বলা হয়েছে। হরিতুষ্টিঃ পরোধর্মঃ। দবর্ষিপাদ বৈকুণ্ঠনাথের কাছে থাকেন—তিনি জানেন কি করলে কৃষ্ণ সবচেয়ে বেশী সুখী হন। তাই তিনি সেইটিই বেছে নিয়েছেন। ভগবানের গুণ-

কীর্তন করলে তিনি সবচেয়ে বেশী সন্তুষ্ট হন তাই নারদ এই নাম কীর্তন ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করে দেশে দেশে হরিগুণ-কীর্তন করে বেড়ান। কলিপাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দরও এই নামধর্মকেই যুগধর্মরূপে কলিজীবকে উপদেশ করেছেন। দেবর্ষি-পাদ বলেছেন :

দেবদত্তামিমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাম্।
মূর্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহম্॥ ভা. ১।৬।৩৩

দেবদত্তবীণাতে হরিগুণগানের মূর্ছনা তুলে শ্রীদেবর্ষিপাদ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরে বেড়ান। এ নামসঙ্কীর্তন বৈকুণ্ঠপার্ষদ নারদের ধর্ম ---কাজেই দুর্বল ধর্ম নয়। নারদ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঘুরে ঘুরে নাম-কীর্তন করেন। তার প্রয়োজন হল যদি ব্রহ্মাণ্ডের কোন জীব শুনে কৃতকৃতার্থ হয়। তাহলে হরির আরও সন্তোষ হয়। নারায়ণের চরণতলে বাস করেন তিনি। তাই তিনি যে ধর্ম গ্রহণ করেছেন সেটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কিন্তু রাজার পোষাক যদি অন্য কেউ পরে তাহলে তো তাকে শাস্তি দেওয়া হয়: তাই নারদের ধর্ম কলিজীব কেমন করে পাবে? কলিজীব নামসঙ্কীর্তন ধর্মটি শ্রীমন্মাপ্রভুর করুণার দানে অযাচিতভাবে পেয়েছে, তাই এখানে দোষ হয় নি। এই নামসঙ্কীর্তন আজকের জিনিষ নয়। রাস-স্থলীতে কৃষ্ণ হারিয়ে গেছেন। কৃষ্ণ গোপবালাদের প্রাণ নিয়ে চলে গেছেন। তখন গোপবালারা বনে বনে কৃষ্ণ অন্বেষণ করেছেন, কিন্তু পান নি। কৃষ্ণ তো তাদের দেখা না দেবার জন্যই লুকিয়েছেন, তাই এভাবে খুঁজলে তাঁকে পাওয়া যাবে না —বন হতে বনান্তরে চলে যাবেন। আর তা ছাড়া গোপরামারা

এটিও চিন্তা করেছেন—বনভূমির পথ তো কুসুমাস্তীর্ণ নয়—সে পথে কত কাঁটা আছে কত কাঁকড় আছে, কৃষ্ণ যতই পথে চলবেন ততই কুসুম হতেও কোমল চরণে তাঁর ব্যথা লাগবে এবং সে ব্যথার কারণ হব আমরা। তাই খোঁজার পথ ছেড়ে দিয়ে তাঁরা শ্রীযমুনাপুলিনে একত্র মিলিত হয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করলেন, কৃষ্ণগুণগানই হারান কৃষ্ণ ফিরে পাওয়ার একমাত্র উপায়। শ্রীশুকদেব তাই বলেছেন ঃ

সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ। ভা. ১০।৩০।৪৫

কৃষ্ণহারা রাধা-আদি ব্রজরামা কৃষ্ণ ফিরে পাবার জন্য যে গীত গেয়েছিলেন সেইটিই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে দশম স্কন্ধে একত্রিশ অধ্যায়ে গোপীগীত আখ্যা পেয়েছে। এই নামকীর্তন ধর্ম প্রথম আরম্ভ করলেন দেবর্ষিপাদ। সে ধর্মকে পরে বহন করলেন প্রহ্লাদজী এবং এই নামধর্মের মহাজন হলেন গোপবালাগণ। রাসস্থলীতে কৃষ্ণ হারিয়ে গোপবালারা যে সিদ্ধান্ত করলেন কৃষ্ণগুণগান করলেই কৃষ্ণ পাওয়া যাবে, রাধাঠাকুরাণীর নিশ্চয় এটি অমোঘ উপায়, অব্যর্থ ঔষধ। এখন কথা হল পরামর্শের সিদ্ধান্ত কি ফলেছিল ? কৃষ্ণকে কি তাঁরা পেয়েছিলেন ? হ্যাঁ, পেয়েছিলেন। শুকদেব স্বাক্ষর দিয়েছেন ঃ

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ ভা. ১০।৩২।২

অধরে মৃদু হাসি নিয়ে গোপবালাদের মাঝে কৃষ্ণ এসে উপস্থিত হয়েছেন। কৃষ্ণের এ হাসির তাৎপর্য কি ? গোপবালাদের কৃষ্ণ

হারানোর ব্যথা যেন কিছুই নয়। কৃষ্ণ তাঁর হাসির ঝলকে গোপবালাদের সমস্ত বিরহ-ব্যথা মুছে দিতে চান। 'পীতাম্বরধর' বলেছেন শুকদেব, শুধু পীতাম্বর বললেই হত—আবার 'ধর' বেশী বললেন কেন? শুকদেব তো একটি কথাও বেশী বলবেন না। কারণ মহারাজ পরীক্ষিতের সাতদিন পরমায়ু যে শুকদেবের কাছে গচ্ছিত আছে, তার একটি মুহূর্তও তো তাঁর অপব্যয় করবার অধিকার নেই। মহারাজের পরমায়ু পরিমিত ও মূল্যবান। পীতাম্বরধর বলবার সার্থকতা হল পীতাম্বর ধারণ করেছেন বুঝাতে হবে, অর্থাৎ গললগ্নীকৃতবাসে অপরাধীর মত কৃষ্ণ এসে দাঁড়িয়েছেন। আর এইটিই বুঝাতে চেয়েছেন, আমি পীতাম্বরই ধারণ করেছি—অন্য কোন বসন পরি নি। কারণ পীতাম্বরে স্বর্ণদ্যুতিতে গোপবালাদের অঙ্গকান্তি স্মরণ হবে। কৃষ্ণ এখানে স্রগ্বী অর্থাৎ কণ্ঠে মালা ধারণ করেছেন। এ মালা কোন মালা? গোপরামাদের দেওয়া মালাই কৃষ্ণের বক্ষের সঙ্গিনী, অন্য দ্বিতীয় সঙ্গিনী নেই—এইটিই তাৎপর্য। 'সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ' অর্থাৎ অত্যন্ত শোভাশালী। এক একটি ব্রহ্মাণ্ডে বৈকুণ্ঠ-নাথের কায়ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। এর মধ্যে প্রদ্যুম্ন হলেন সাক্ষাৎ মন্মথ। প্রাকৃত মন্মথ বা কন্দর্প (মদন) এই সাক্ষাৎ মন্মথের ছায়া, অর্থাৎ সাক্ষাৎ মন্মথের কৃপা লাভ হলে প্রাকৃত মদনের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, তুচ্ছ হয়ে যায়। এই সাক্ষাৎ মন্মথ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত। শ্রীগোবিন্দকে 'সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ' বলা হয়েছে—অনন্ত সাক্ষাৎ মন্মথকেও তিনি তাঁর অতুলনরূপে গুণে পরাজিত করেন। তাই তিনি 'সাক্ষাৎ

মন্মথমন্মথ'। তাহলে দেখা গেল রাসস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনে কাজ হয়েছে—হারানো কৃষ্ণ ফিরে পাওয়া গিয়েছে। এই নাম-সঙ্কীর্তন শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিজীবকে দান করেছেন। আমাদের বৃত্তি ভাল নয়, কিন্তু ভগবানের বৃত্তি তো মন্দ হতে পারে না। আমরা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে সুস্বাদু সুখাদ্য পরিবেশন করি। আর পচা খুদ, পচা ডালের খিচুড়ি করে কাঙ্গালীভোজন করাই, কিন্তু পতিতপাবন অবতার শ্রীগৌরহরি এমন পচা দান কলি-জীবকে করেন নি। সত্য, ত্রেতা দ্বাপর কোন যুগের জীবের পক্ষে যা গোচর ছিল না—সকলের অগোচর যা তাই কলি-জীবকে দিয়েছেন। আমাদের এ বস্তু সম্পর্কে অনুভব নেই। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ ছোট্ট কথায় বলেছেন, 'অনর্পিত'। রাধাপ্রেম অর্থাৎ গোপীপ্রেম মহাপ্রভু দান করেছেন, কিন্তু আমরা তো দেখছি মহাপ্রভু কলিজীবকে নামধর্ম দান করেছেন —এ হল পুরপিঠে। রাধাপ্রেমের পুর দেওয়া নাম পিঠে। পিঠে খেলেই যেমন ভিতরের ক্ষীরের বা নারকোলের পুর খাওয়া হয় তেমনি শ্রীমন্মাপ্রভুর শ্রীমুখনির্গলিত নাম উচ্চারণে রাধাপ্রেমের উদয় হয়। এই দানের মহিমা বসে বসে ভাবতে হবে এবং যত ভাবতে পারা যাবে ততই কাজ হবে। এ নামধর্ম উপদেশ সত্য, ত্রেতা দ্বাপরে হয় নি—তাই 'অনর্পিত'। সত্যে হয় নি বলার চেয়ে ত্রেতায় হয় নি বলার দাম বেশী। কারণ সত্যযুগে তেমন অবতার আবির্ভূত হন নি। কিন্তু ত্রেতাযুগে লীলাবতার পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান রামচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু তিনিও রাধা প্রেম দান করতে পারেন নি। কয়েকজন বিশিষ্ট তাঁর দান

ভক্তিসম্পদ্ পেয়েছিলেন—যেমন শ্রীহনুমানজী, চণ্ডালিনী শবরী, গুহকচণ্ডাল প্রভৃতি। গুরু বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র রামচন্দ্র ভগবানের মস্তকে চরণ অর্পণ করেছেন, কিন্তু ভক্তিলাভ করতে পারেন নি। তাঁরাই ভক্তিলাভের জন্য অপেক্ষা করে দ্বাপরযুগে বৈকুণ্ঠনাথের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন—সতের যুগ ধরে তাঁরা অপেক্ষা করেছিলেন এই ভক্তি পাবার আশায়। কারণ যে দ্বাপরে কৃষ্ণ-ভগবান তার পূর্ববর্তী ত্রেতাযুগে রাম অবতার নন। যে দ্বাপরে কৃষ্ণভগবান তার ঠিক পরবর্তী কলিতে গৌরভগবান—এটি হল ২৮ চতুর্যুগ—আর ২৪ চতুর্যুগের ত্রেতায় রামচন্দ্র। কাজেই ১৭ যুগ পরে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র কৃষ্ণভগবানের কাছে উপস্থিত হন।

দেবর্ষিপাদ হলেন এই নাম সঙ্কীর্তন ভক্তি-অঙ্গ যাজনের প্রথম যাজক। দেবর্ষিপাদের কৃষ্ণদর্শনলালসা শ্রীশুকদেব বর্ণন করেছেন। 'কৃষ্ণোপাসন-লালসঃ'—এই কথাটিতে। সাধক ভজন করে—একদিকে শ্রীগুরূপদিষ্ট ভজন অভ্যাস করে—সাধকের ভজনকালে একদিকে থাকে ভজনের গৌরব অন্যদিকে থাকে বিষয়ের আকর্ষণ। বিষয়বাসনা বিষয়ের দিকে টানছে আর গুরূ-পদিষ্ঠ ভজন-গৌরব ভজনের দিকে টানছে। এই দোটানার মধ্যে পড়ে সাধক কখনও নিজের সঙ্কল্প সফল করে উঠতে পারে আবার কখনও পারে না। যখন ভজনসঙ্কল্প পূরণ হয় তখন ভজনের আকর্ষণ বেশী; আবার যখন হয় না তখন বিষয়ের আকর্ষণ বেশী। এই টানাটানির মাঝে সাধক যখন পড়ে তখন-কার অবস্থার নাম হল বিষয়সঙ্গরা ভক্তি। কখনও ভজনের জয়

কখনও বিষয়ের জয়। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে ভজন যখন বিষয়ের দ্বারা পরাজিত হয় তখন কি বুঝতে হবে ভক্তি দুর্বলা, তাই সে বিষয়ের দ্বারা পরাজিত হয়? না, তা নয়। যেমন দুধ বলকারক, কিন্তু একসের করে দুধ খেয়ে হজম করতে পারলে তবে শরীরে বল হবে, কিন্তু দুধ যদি পেটে সহ্য না হয় তাহলে আর বল দেবে কেমন করে? তেমনি ভক্তি-মহারাণী মহা বলবতী, কিন্তু ভক্তিকে হজম করতে পারলে তবে তো তার বল প্রকাশ পাবে। ভক্তিকে আমরা হজম করতে পারি না, তাই তার বলও আমাদের কাছে প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। ভক্তির এমনই বল যে সে মত্তকুঞ্জর সদৃশ কৃষ্ণকে টেনে আনে। অন্ন পেটে পড়লে যেমন ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় তেমনি প্রাকৃত ক্ষুধার যদি নিবৃত্তি হয় তাহলে বুঝতে হবে ভজন-অন্ন পেটে পড়েছে। আর প্রাকৃত ক্ষুধার নিবৃত্তি না হলে বুঝতে হবে ভজন কিছু হচ্ছে না। এইভাবে প্রাকৃতভোগবাসনারহিত মন নিয়ে যদি ভজন করা যায় তাহলে তার নাম হবে ভক্তি। আমাকে কেউ ভক্ত বললে গর্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ি, কিন্তু একলা ঘরে বসে চিন্তা করতে হবে ভক্তির যে লক্ষণ শাস্ত্র বলেছেন, তার সঙ্গে আমার ভক্তি মিলছে কিনা। দেখা যাবে কিছুই মেলে না। আমাদের ভজন তাই ভক্তি আখ্যা পেতেই পারে না। সত্যি কথা তো কইতে হবে, জীবনকে তো গড়তে হবে, আমরা যে যাই ভজন করি বিষয় ছেড়ে নয়। বিষয় যেমন আছে তেমনি থাকুক। এর ওপর যদি গৌরগোবিন্দ মেলে আপত্তি নেই। এই হল আমাদের মনের ভাব। অনাদি-

কালের কৃষ্ণবিমুখতার ফলে জীব লোহার মত হয়েছে। ভক্তি হলেন চুম্বক। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, তেমনি ভক্তি জীবকে আকর্ষণ করে না কেন ? চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে সত্য, কিন্তু লোহা যদি গোবর চাপা থাকে তাহলে যেমন চুম্বক তাকে আকর্ষণ করতে পারে না তেমনি জীব দুর্বাসনা-গোবরে চাপা পড়েছে। তাই ভক্তিচুম্বক তাকে আকর্ষণ করতে পারে না।

নারদ ধ্যানে বৈকুণ্ঠনাথকে নিয়ত দর্শন করেন। আহূত ব্যক্তির মত ভগবান তাঁর ধ্যানে ধরা দেন। নারদের কাছে ভগবৎদর্শন দুর্লভ নয়, তবে তাঁর দ্বারকাবাসে লালসা কেন ? শ্রীজীবপাদ বিচার করেছেন নারদ সাক্ষাৎভাবে ভগবানকে দর্শন করবেন। এইজন্য তাঁর এত লালসা। দ্বারকামন্দিরে দেবর্ষিপাদ আড়ালে শ্রীগোবিন্দচরণ স্পর্শ করবেন—এই তাঁর লোভ। আড়ালে স্পর্শ কেন ? সাক্ষাতে স্পর্শ করতে পারেন না। কারণ নারদ তো দেবর্ষি—কৃষ্ণ সাক্ষাতে দেবর্ষিপাদকে প্রণাম করেন। কারণ লোকবৎ লীলা। তবে যদি আড়ালে সুযোগ সুবিধা পান তাহলে কৃষ্ণকে নারদ প্রণাম করেন, এই লোভেই তাঁর দ্বারকাবাস। তাহলে দেখা যাচ্ছে ধ্যানে দর্শন অপেক্ষা সাক্ষাৎ দর্শন গরীয়ান। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতগ্রন্থের টীকায় শ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদ বিচার করেছেন—সাক্ষাৎদর্শনের পরও সাধক মনে করতে পারবে না যে তার ভজন শেষ হয়েছে। গোস্বামিপাদের দৃষ্টি কত উঁচুতে উঠেছে—তিনি বলেছেন, সাধকের এ অবস্থা হওয়ার পরেও সাধককে আরও

ভজতে হবে। মনে দেখার পর চোখে দেখা কিন্তু তখনও ভজনের বাকী আছে।

সাধক যে রসেই ভগবানকে ভজুক না কেন সেই রসের পরিকরসঙ্গে শ্রীগৌরগোবিন্দের দর্শন চাই—এইরকম দর্শন যখন শ্রীগুরুকৃপায় সাধক লাভ করল তখনও সাধকের ভজন বাকী আছে। সাধক আরও ভজতে লাগল। যাঁরা শ্রীগোবিন্দের মধুর রসের উপাসক তাঁরা শ্রীরাসমণ্ডলে গোপবালাদের সঙ্গে শ্রীগোপীজনবল্লভকে দর্শন করলেন। শ্রীসনাতনগোস্বামিচরণ কিন্তু অপেক্ষা করে আছেন এবং সাবধানবাণী উচ্চারণ করছেন —"ওগো সাধক, মনে করো না তোমার ভজন শেষ হয়েছে— তোমাকে আরও ভজতে হবে।" শ্রীরাসমণ্ডলে গোপীসমাজে শ্রীগোপীজনবল্লভকে দর্শন করে তাঁর শ্রীমুখে এমন কোন প্রসন্নতা কি দর্শন করেছ যাতে করে অনায়াসে বিনা দ্বিধায় তাঁদের খেলাতে তুমি যোগ দিতে পার। যদি তা পার তাহলে বুঝতে হবে তোমার ভজন শেষ হয়েছে। এই কথাটিই সংক্ষেপে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেছেন--'প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হলে ভবনাশ পায়।' ঘটলে তবে আস্বাদ হবে। প্রেম দুর্বল থাকা পর্যন্ত আস্বাদ হবে না। প্রেম যদি সুস্থ হয়, পুষ্ট হয় তাহলে গোবিন্দখেলাতে সাধককে মিলিয়ে দেবে। দেবর্ষিপাদের নারায়ণদর্শন সুলভ হলেও গোবিন্দদর্শনের লোভে তিনি দ্বারকা বাসের লোভ সংবরণ করতে পারেন নি। নারদের মত ব্যক্তি যদি গোবিন্দদর্শন বিরহ অবস্থায় না থাকতে পারেন, তাহলে শ্রীশুকদেব মন্তব্য করছেন—মহারাজ, এমন

কোন ব্যক্তি আছে যার ইন্দ্রিয় আছে, সে কেমন করে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম না ভজে থাকতে পারে? এখানে শুকদেব কৃষ্ণভজনের অধিকারী মানুষ বলেন নি--বলেছেন ইন্দ্রিয়বান। শ্রীজীবপাদ এর তাৎপর্য তুলেছেন—যাদের ইন্দ্রিয় নেই তারাও কৃষ্ণভজনের লোভ সামলাতে পারে না। তাহলে যারা ইন্দ্রিয় পেয়েছে তারা কেমন করে কৃষ্ণ না ভজে থাকতে পারে? রাসলীলার পরে গোপবালাদের যে গীত আছে, তাতে তাঁরা বলেছেন—বৃন্দাবনের লতা-তরু—তারাও কৃষ্ণ ভজে। লক্ষণ তাদের শ্রী-অঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে--লতা পুষ্পিত, তরু ফলিত, নব নব ফুলফলে সমৃদ্ধিমান তরু-লতা--এ সম্পদ তারা পেল কোথায়? গোবিন্দ না ভজলে কি এত সম্পদ আসে? বৃক্ষলতার শাখা-প্রশাখা দৈন্যে অবনত হয়েছে, ভূমি স্পর্শ করেছে। ভক্তি হৃদয়ে এলে এমনই স্বভাব জাগে—তাদের পুত্রকন্যা দাসদাসী পর্যন্ত এ স্বভাব পায়।

"বৃন্দাবনের তরুলতা--
তারা সদাই অবনতশির—"

প্রেমপুলকিত তনু—অঙ্কুরছলে রোমোদ্গম—আর মধুধারা-বর্ষণছলে প্রেমাশ্রু-বর্ষণ—এ প্রেমবিকার দেখা যাচ্ছে।

শ্রীশুকদেবের ইন্দ্রিয়বান বলবার তাৎপর্য হল—সকলের পক্ষেই কৃষ্ণভজন স্বাভাবিক। 'শ্রীকৃষ্ণভজনে সবে অধিকারী কুলের গরব নাই'—আগে ভয় নিবারণ পরে খাদ্য প্রয়োজন। তেমনি আগে মৃত্যুসর্পের দংশন হতে রক্ষা পরে গৌরগোবিন্দ পাদপদ্মমধুখাদ্য লাভ। বিচারশীল, বদ্ধ সকল জীবের পক্ষে

কৃষ্ণভজন স্বাভাবিক। এমন কি মুক্ত ব্যক্তিও কৃষ্ণ ভজে—উপাস্যমমরোত্তমৈঃ। শিববিরিঞ্চিও কৃষ্ণপাদপদ্ম ভজনা করেন। কৃষ্ণপাদপদ্ম মুক্তদেরও আরাধ্য।

এইরূপে একদিন দেবর্ষিপাদ দ্বারকানগরীতে কৃষ্ণপিতা বসুদেবের কক্ষে উপস্থিত হলেন। বসুদেব নারদকে সুখাসনে বসিয়ে পাদ্যার্ঘ্য দিয়ে যথাবিহিত পূজা করে প্রণাম করে বললেন—বসুদেব যে প্রশ্ন করেছেন তাতে প্রথমে নিজের প্রয়োজন বলেন নি—দেবর্ষিপাদের আগমনের প্রশংসা করছেন—

ভগবন্ ভবতো যাত্রা স্বস্তয়ে সবদেহিনাম্।
কৃপণানাং যথা পিত্রোরুত্তমঃশ্লোকবর্ত্মনাম্॥ ভা.১১।২।৪

দেবর্ষিপাদ, আপনার আগমনে সর্বজীবের কল্যাণ। যেমন পিতামাতার আগমনে ত্রিবিধ সন্তান উত্তম, মধ্যম এবং অধম সকলেরই কল্যাণ সাধিত হয়। সাধুর আগমনে কৃপণের কল্যাণ হয়—কৃপণ অর্থে জাগতিক দৃষ্টিতে আমরা বলি যে টাকা খরচ করে নিজে খেতে পরতে পারত কিন্তু খরচ করল না সে কৃপণ; কিন্তু এখানে কৃপণ শব্দে এ জাগতিক অর্থ নিলে হবে না। এর একটি বৈদিক অর্থ আছে। যে কৃপণতার উল্লেখ করে গীতায় অর্জুনদেবের উক্তি আছে:

কার্পণ্য দোষোঽপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥
গীতা ২।৭

শ্রীবৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা আছে—'যো বা এতদক্ষরম-

বিদিত্বা গার্গি অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।' মানুষ জন্মের একমাত্র কর্তব্য হল ভগবানকে জানতে হবে—মানুষ যা চাইতে জানে এবং যা চাইতে জানে না—সব গোবিন্দে আছে। সাধু-সমাগমে এই ভগবানকে জানবার পথ প্রশস্ত হয়। অন্যের আগমনে নরকে যাওয়ার পথ তৈরী হয়। সাধুসমাগমে আমাদের তাই প্রার্থনা করতে হবে—আমাদের ভজন সন্ধান দাও। শ্রীজীবপাদ বলেছেন,—সর্বদেহী বলতে সাধারণ, কৃপণ বলতে নিকৃষ্ট এবং উত্তমঃশ্লোকবর্ত্মনাম্ বলতে সর্বোৎকৃষ্ট জীবকে বুঝাচ্ছে। সন্তানদের মধ্যে উত্তম, মধ্যম এবং অধম কি বিচারে হবে? পিতামাতার মন জেনে যারা আজ্ঞা পালন করে তারা উত্তম, আদেশ করলে যারা পালন করে তারা মধ্যম আর আদেশ করলেও যারা করে না তারা অধম। সাধু-সমাগমে নিকৃষ্ট জীবের শুভবুদ্ধির উদয় হয়। সে তখন ভগবানকে ভজতে আরম্ভ করে। মধ্যমের রুচি আরও গাঢ় হয়, অর্থাৎ সে তখন আরও বেশী করে ঘন করে ভজে। আর উত্তমের প্রেমপিপাসা তো আছেই—সে পিপাসা তো আরও বাড়ে।

মহতের সমাগমে সর্বজীবের কল্যাণ। দেবতাদের সঙ্গেও মহতের উপমা দেওয়া চলবে না। কারণ মহৎ দেবতার অপেক্ষা অনেক বেশী গুণবান। বসুদেব বলেছেন,—দেবতাদের জীবগণের প্রতি আচরণ কখনও সুখের হয় কখনও দুঃখের হয়—যেমন, সুবৃষ্টি হলে সুখের এবং অতিবৃষ্টি হলে দুঃখের হয়। কিন্তু সাধুদের আচরণ সবসময় সুখেরই হয়; দুঃখের কখনও হয় না। মিছরির টুকরো থেকে যেমন নিমপাতার রস কখনও বেরোয়

না। জীব প্রবৃত্তির দাস—প্রবৃত্তিমার্গে চলেছে তাই বুঝতে পারে না। অনুলোম প্রতিলোম দুই রকম পথ আছে—প্রবৃত্তিমার্গে যাওয়া সহজ—পিছল পথ—কামী জীব—পিছল পথে নামা সহজ। সাধুর স্বরূপ কেবলই মঙ্গলপ্রবাহ। কোনটি কল্যাণ, কোনটি অকল্যাণ আমরা বুঝি না। আমাদের গোড়ায় গলদ। পরিশ্রম করি, কিন্তু নির্বাচনে ত্রুটি থেকে যায়। শাস্ত্রই কল্যাণ বুঝিয়ে দেবে। তাহলে সাধুর দরকার কি? সাধু শাস্ত্রের উদাহরণ। দেবতা সাধকের গুণ অনুযায়ী সুখ-বিধান করেন। কিন্তু দীনবৎসল হলেন সাধুরা। অর্থাৎ যে কিছু করতে পারে না, তার প্রতি সাধু বৎসল—অর্থাৎ স্নেহবান। জীব যেমন করে ভজবে দেবতারাও ঠিক তেমনি করে ভজবেন। সাধু কিন্তু তা নয়। সাধু ষোল আনা দেয়—স্বাতন্ত্র্যেণ দয়ালবঃ—সাধুদের দয়া কেবল কল্যাণ। কল্যাণ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? গোবিন্দে উন্মুখতাই কল্যাণ আর বিমুখতাই অকল্যাণ। কৃষ্ণেরই একমাত্র কৃপা করবার অধিকার। কৃষ্ণ যখন ইচ্ছা করবেন এই পতিতজীব কৃষ্ণ ভজুক তখনই সে কৃষ্ণ ভজবে। কৃষ্ণ কৃপা-কন্যাকে গচ্ছিত রেখেছেন সাধুর কাছে—সাধু স্বাতন্ত্র্যে কৃপা করেন। বসুদেব এর পরে বলেছেন, —দেবর্ষিপাদ, যদিও আপনার দর্শনমাত্রেই কৃতকৃতার্থ হয়েছি, তথাপি ভাগবতধর্ম কেমন তাই জিজ্ঞাসা করছি। যা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনলে মরণধর্মশীল জীব কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়—আচরণ তো পরে আছে—শুধু শ্রদ্ধা করে শুনলেই কর্মবন্ধন মোচন হবে অর্থাৎ সংসার দুঃখ নিবারণ হয়। সংসারের সীমা কতদূর?

বৈকুণ্ঠধামের আগে পর্যন্ত সংসার—চৌদ্দভুবনের সর্বত্র মৃত্যু। গোবিন্দপাদপদ্মে পৌঁছালে সেখানে আর মৃত্যু নেই। গীতায় ভগবান বলেছেন ঃ

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ গী. ৮।১৬

অন্যত্র বলা আছে ঃ

গত্বা গত্বা নিবর্তন্তে চন্দ্রসূর্যাদয়গ্রহাঃ।
অদ্যাপি ন নিবর্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ॥

সূর্য-চন্দ্র আকাশে নিয়মিত উদিত হয় এবং অস্তগমন করে অর্থাৎ একবার যায়, আবার ফিরে ফিরে আসে, কিন্তু যাঁরা শ্রীহরির পাদপদ্ম ধ্যান করেন তাঁদের আর ফিরে আসতে হয় না, অর্থাৎ পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না।

সংসারবন্ধন যে দর্শনকার বলেছেন তার অর্থ কি? অপ্রিয় অবাঞ্ছিত, অসহনীয় এক তাগাদা জীবের পিছনে লেগে আছে। সেটি হল মৃত্যুর তাগাদা, অর্থাৎ জীবের বাঁচবার কোন অধিকার নেই। কিন্তু যে ভাগবতধর্ম শ্রবণ করলে আর মরতে হয় না, সেই ভাগবতধর্মকেই বসুদেব বলেছেন,—'তব ভাগবতধর্ম'— এই ভাগবতধর্ম সম্বন্ধে বসুদেবের জিজ্ঞাসা। দেবর্ষিপাদ হলেন মূর্তিমান ভাগবতধর্ম। তাঁর দর্শনের পরও আবার শুনবার প্রয়োজন কি? বসুদেবের নিজের কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু যারা দেবর্ষিপাদকে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করবে না তাদের জন্য শুনতে চান। তারা যদি এই ভাগবতধর্ম শুনতে পায়,

তাহলে কৃতকৃতার্থ হবে। বসুদেবের এ বাক্য থেকে কি এইটিই বুঝতে হবে—কৃষ্ণভক্তের কি তাহলে মৃত্যু নেই? নৈমিষারণ্যে ষাট হাজার ঋষির মুখপাত্র শ্রীশৌনক সূতমুনিকে বলেছেন,—কৃষ্ণভক্তের আয়ু সূর্য হরণ করে না—তা যদি হয় তাহলে কৃষ্ণভক্তের মৃত্যু হয় কেমন করে? এর মধ্যে বিচার আছে। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ বলেছেন,—গৃহস্থ উপার্জিত ধন ভোগ-বিলাসে খরচ করে—তাদের সেটা শুধু খরচই হয়, কিন্তু সাধু-সেবায় বা গোবিন্দসেবায় যে অর্থ ব্যয়িত হয়, সেটি প্রকৃতপক্ষে ব্যয় নয়—সেটি তোলা থাকে—তেমনি কৃষ্ণভক্তের আয়ু ব্যয় হচ্ছে না—গৌরগোবিন্দের জন্য যে ব্যক্তি আয়ু খরচ করে সে আয়ু খরচ হয় না—তোলা থাকে—গোবিন্দ কৃষ্ণ—তাই সে আয়ু অনেক করে ফিরিয়ে দেন। এ জগতে কারও জন্য আয়ু ব্যয় করলে সে মনে রাখে না, কারণ এ জগতের লোক কৃতজ্ঞ নয়—ভগবানের বেশী করে আয়ু দেওয়া কি রকম? ভগবান বলেছেন—'যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'—আমার কাছে যারা যায় তারা আর ফেরে না।

বসুদেবের আজ নিজের ভুল হয়ে গেছে যে তিনি ভগবানের পিতা। লীলার এমনই পরিপাটি—তাই তাঁর মনে হচ্ছে আমার নিজেরও ভাগবতধর্ম প্রয়োজন। দেবর্ষিপাদ বলছেন,—'বসুদেব, তোমার চেয়ে আর ভাগ্যবান এ জগতে কে আছে? ভগবান যার পুত্রত্ব গ্রহণ করেছেন—ভগবান যার বাৎসল্যে বশীভূত হয়েছেন। পারমার্থিক সাধনের প্রথম ফল হল—মুক্তি—এটি হল সাযুজ্য-মুক্তি। এই মুক্তি আবার দুরকম: ব্রহ্মসাযুজ্য এবং ঈশ্বর-

সাযুজ্য। তার মধ্যে ব্রহ্মসাযুজ্য অপেক্ষা ঈশ্বরসাযুজ্য আরও নিন্দিত। ঘরে খাদ্য না থাকলে খায় না তাতে তত নিন্দা নেই, কিন্তু ঘরভরা খাদ্য ও পেটভরা ক্ষুধা থাকতেও যে হাতে তুলে না খায় তার মত নিন্দিত আর কে আছে? ব্রহ্মের লীলার প্রকাশ নেই, তাই তার যদি অনুভূতি না থাকে তাতে তত নিন্দার নেই, কিন্তু ঈশ্বর অনন্ত লীলাময় সেখানে যদি লীলার অনুভূতি না পায় তবে তার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে? এই সাযুজ্যমুক্তির পরে সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি এবং সারূপ্য—এই চারপ্রকার হল মুক্তির প্রকারভেদ—শুদ্ধভক্ত কিন্তু এই মুক্তি চায় না 'সালোক্যাদি মুক্তি ভক্ত-অঙ্গুলি না ছোঁয়'। শুদ্ধ ভক্ত চায় গোবিন্দ চরণারবিন্দের সেবা। মুক্তির পরে আসে সম্বন্ধ-লক্ষণা ভক্তি, বৈকুণ্ঠে দাস প্রভু সম্বন্ধ পর্যন্ত থাকে—অন্য সম্বন্ধ, সখা মাতাপিতা বা কান্তা বৈকুণ্ঠে থাকে না—এ সম্বন্ধ হয় গোলোকা-ধীশের সঙ্গে। বৈকুণ্ঠ হতে পঞ্চাশ কোটি যোজন ঊর্ধ্বে গোলোক। সেখানে চারপ্রকারের সম্বন্ধলক্ষণা ভক্তি—ভূবৃন্দাবনেও পাওয়া যায়। দেবর্ষিপাদ বসুদেবকে বলছেন—বসুদেব, তুমি তো বাসু-দেবের পিতা, তাই কৃপাপাত্র তো বড় কম নও। তবে এত কাতর হয়েছ কেন? তোমার কথা শুনে এবং তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার বুঝি পারমার্থিক সম্পদ কিছু নেই। এ জগতেও কথা আছে,—যার ছেলে যত খায় তার ছেলের তত নোলা। বসুদেবের তাই পূর্ণতা থেকেও অভাব বোধ।

শ্রীবসুদেব আজ ভগবানকে পুত্র করে পাওয়ার গৌরব ভুলে গেছেন তাঁর ভক্তিসঞ্জাত দৈন্যে, কারণ কৃষ্ণসম্পর্ক যারা করেছে

তারা আর মাথা উঁচু করতে পারে না। কারণ গর্বের কাছে থাকলে কৃষ্ণের গায়ের জ্বালা হয়। বসুদেব নিজ দৈন্যে বলছেন —দেবর্ষিপাদ, আমি পূর্বে মুক্তিদাতা অনন্তদেবকে পূজা করে-ছিলাম, কিন্তু আমার প্রার্থনা ছিল পুত্রের। আমি মুক্তির জন্য পূজা করি নি, দেবমায়ায় মোহিত হয়ে মুক্তি চাই নি, পুত্র চেয়েছিলাম। বসুদেব তো এ কথা ভক্তিদৈন্যে বললেন, কিন্তু বিচার কি? শ্রীজীবপাদ বিচার করেছেন—বসুদেবের ভাবনা হয়েছে, কৃষ্ণকে ভালবেসে বসুদেব এখন সেই প্রেমের তাপ অনুভব করে দুঃখ পাচ্ছেন। প্রেমের যে শুধু আনন্দ আছে তা নয়—প্রেমের তাপও আছে। শ্রীরাধাঠাকুরাণী বলেছেন,— প্রেমের তাপ বিষামৃতে একত্র মিলনের অবস্থা, তপ্ত ইক্ষু চর্বণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন। তাই বসুদেবের মনে হচ্ছে, আর কাউকে ভাল না বাসলেই ভাল। কৃষ্ণ বলতে বলতে কত বিপদই তো আসে, কিন্তু কৃষ্ণ বলা ছাড়া যায় না। এ প্রেমের বিক্রম বক্রমধুরা। এখন বসুদেবের সেই প্রেমের জ্বালা উপস্থিত হয়েছে, তাঁর মনে হচ্ছে সব হারাতে হবে। বসুদেব যে বললেন, মুক্তি চাই নি দেবমায়ায় মুগ্ধ হয়ে পুত্র চেয়েছিলাম, এর থেকে কি এইটিই বুঝতে হবে যে, ভগবানকে পুত্র করে পাওয়ার চেয়ে মুক্তি পাওয়া বড়? শ্রীজীবপাদ বিচার করেছেন—না, তা কখনই হতে পারে না। কারণ ভগবানকে পুত্র করে পাওয়ার স্তর কোথায়? আর মুক্তিই বা কোথায়? মুক্তির প্রথম স্তর সাযুজ্য। ব্রহ্মে লীলাতরঙ্গ নেই, তাই তাতে লীন হওয়া বরং চলে, কিন্তু ঈশ্বর নব নব লীলাতরঙ্গমালায়বি ভূষিত। তাই

তার সেই লীলা অনুভব না করে তাতে লীন হলে তা নিন্দনীয়। এই সাযুজ্যমুক্তিরই অপর নাম নির্বাণ বা কৈবল্য। এর পরের মুক্তির ভেদ হল সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য। এর জন্য জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিপ্রধান সাধন চাই। এই চতুর্বিধা মুক্তি লাভ কালেও সম্বন্ধলক্ষণা ভক্তি হয়। সম্বন্ধলক্ষণা ভক্তি চার প্রকার—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। মুক্তির পরে দাস্যলক্ষণা ভক্তি। এর পরে সখ্যলক্ষণা ভক্তি, এর পরে বাৎসল্যরসের ভক্তি। তাহলে দেখা যাচ্ছে মুক্তির কথা আর ভগবানকে পুত্ররূপে পাওয়ার কথা—দুএর মধ্যে কত পার্থক্য। ছেলে যখন বাপ-মাকে যন্ত্রণা দেয় তখন বাপ-মা মনে মনে ভাবে—ছেলে না হলে বাঁচতাম। কিন্তু মুখে বললেও এ তাদের মনের কথা নয়। বসুদেব বললেন,—দেবমায়ায় মোহিত হয়ে পুত্র চেয়েছি দেবর্ষিপাদ, মুক্তি চাই নি। এ তাঁর মনের কথা না হলেও কথা তো শাস্ত্রে উঠে গেছে, তার তো বদল হবে না। এখন উপায় কি? এর প্রকৃত তাৎপর্য কি? প্রকৃত তাৎপর্য হল, দেবস্য মায়া অর্থাৎ কৃপয়া (মায়া দম্ভে কৃপায়াং চ), ভগবানের মাধুরীতে বশীভূত হয়ে আমি মুক্তিকে তুচ্ছ করেছিলাম, পুত্র প্রার্থনা করেছিলাম—এ প্রার্থনা প্রেমের প্রার্থনা। যেমন কারাগারে বসুদেব এবং দেবকীমায়ের স্তুতির পর ভগবান বলেছেন :

শীর্ণপর্ণানিলাহারাবুপশান্তেন চেতসা।
মত্তঃ কামানভীপ্সন্তৌ মদারাধনমীহতুঃ॥ ভা ১০।৩।৩৫

তোমাদের প্রাণের ইচ্ছা যে আমি তোমাদের পুত্র হই কিন্তু

লজ্জা করে বলেছিলে তোমার মত পুত্র যেন পাই। কিন্তু আমার মত পুত্র তো কেউ হয় না—তাই আমাকেই পুত্র হয়ে আসতে হয়েছে। ভগবানকে পুত্ররূপে পাওয়া এবং মুক্তি—দুইএর আস্বাদে কত পার্থক্য। মুক্তিতে ভগবানের মাধুর্য আস্বাদ হয় না, আর সম্বন্ধলক্ষণা ভক্তিতে মাধুর্য আস্বাদ হয়। জন্ম-লীলাপ্রসঙ্গে শ্রীচক্রবর্তিপাদ টীকায় বলেছেন, মমতাই বস্তুকে সুন্দর করে। জাগতিক সন্তান বিচারে অসুন্দর,কিন্তু মাতা-পিতার কাছে মমতাই তাকে সুন্দর করে। আর সত্যকার সুন্দর যে গোবিন্দ তাতে যদি মমতা হয় তাহলে না জানি কত সুন্দর হয়। বসুদেব বলছেন, হে সুব্রত, আমাকে উপদেশ করুন যাতে বিচিত্র বিপদসঙ্কুল বিশ্বভয় থেকে অনায়াসে মুক্তিলাভ করতে পারি।

লীলার এমনই পরিপাটি যে বসুদেবের মনে নেই, তিনি ভগবানের পিতা। তাঁর প্রার্থনা হচ্ছে সংসার থেকে কেমন করে মুক্তি পাব। এখন কথা হচ্ছে, ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ হলে কি আর সংসার থাকে? বসুদেব হলেন ভগবানের পিতা, তাঁর আবার সংসার কি? পূতনা-বধপ্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বলেছেন:

তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্বতীনাং সুতেক্ষণম্।

ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোঽজ্ঞানসম্ভবঃ॥ ভা. ১০।৬।৪০

কৃষ্ণ-অঙ্গস্পর্শে পূতনার দেহ অপ্রাকৃত হয়ে গেছে এবং সে দেহ দাহ করবার সময় তার থেকে সৌরভ উঠছে। যে কৃষ্ণ অঙ্গ স্পর্শ-মাত্র রাক্ষসী পূতনার এতাদৃশী অবস্থা হয় সেই কৃষ্ণকে পুত্র করলে কখনও সংসার হয়? সংসারের মূলে আছে অজ্ঞান।

তাই শুকদেব বললেন—অজ্ঞানসম্ভবঃ সংসারঃ। বসুদেব যে মুক্তি চাইছেন এটি লীলার আবরণ। 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্' —ভগবান অপ্রাকৃত হয়েও প্রাকৃত আচরণ করেন—এতে লীলার সুখ কি হয়? এ লীলা ভক্তজনের পরম আস্বাদনের বস্তু। অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃতবৎ আচরণ করতে দেখলে বড় ভাল লাগে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে কলিমহারাজ বলেছেন, অলৌকিকী লীলা অপেক্ষা লৌকিকী লীলা অধিক মনোহারিণী। চিন্ময় ধামে চিন্ময়ী লীলা অধিক শোভা পায় না। সেই লীলা নরজগতে প্রকাশ পেলে তার মহিমা বেশী। যেমন মহেশ-শীর্ষে যখন গঙ্গা আছেন, তখন তিনি পতিতপাবনী হতে পারেন না। কিন্তু সেই গঙ্গা যখন মাটির জগতে এলেন, পতিতকে স্পর্শ দান করে পবিত্র করলেন—তখন পতিতপাবনী হলেন। তাই লীলানুরোধে বসুদেব প্রার্থনা করলেন:

যথা বিচিত্রব্যসনাদ্ ভবদ্ভির্বিশ্বতোভয়াৎ।
মুচ্যেমহ্যঞ্জসৈবাদ্ধা তথা নঃ শাধি সুব্রত॥ ভা. ১১।২।৯

হে সুব্রত, হরিনামব্রত (দেবর্ষিপাদ), তথা শাধি—সেইরূপ উপদেশ করুন যাতে অনায়াসে বিপদ্সঙ্কুল ভবসাগর উত্তীর্ণ হতে পারি।

ধীমান্ বসুদেবের প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে দেবর্ষিপাদের হরিকে স্মরণ হয়েছে এবং হরির গুণও স্মরণ হয়েছে; তাই দেবর্ষিপাদের পরম আনন্দ। বিষয় চিন্তা করতে করতে কেউ যদি কৃষ্ণহরি স্মরণ করিয়ে দেয় তাহলে তা প্রীতির কারণ হয়। দেবর্ষিপাদ প্রীত হয়ে উত্তর দিলেন—বসুদেব, ভক্তশ্রেষ্ঠ তুমি, তোমার

নিশ্চয়টি সম্যক হয়েছে অর্থাৎ তুমি যে নিশ্চয় করেছ তার আর নড়চড় নেই। তুমি ভাগবত ধর্ম কাকে বলে জিজ্ঞাসা করছ। ভাগবতধর্ম হল বিশ্বভাবনান্ অর্থাৎ সর্বশোধকান্ সকলকে পবিত্র করে—ভাগবতধর্ম ভক্তিধর্ম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই যা সকলকে পবিত্র করতে পারে। হরিনাম মুখে উচ্চারণ করতে পারলেই তো ভাগবতধর্ম যাজন করা হল। যার জিহ্বা আর ওষ্ঠ আছে, সেই মানুষমাত্রেরই এই ধর্মে অধিকার। মানুষ তো দূরের কথা, পশুপাখীতেও ভাগবতধর্ম যাজন দেখা যায়। জটায়ু তো পক্ষী, কিন্তু ভক্তিধর্মযাজনের বলে তিনি পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্রের সেবা পাবার অধিকারী হয়েছিলেন। রামচন্দ্রও পিতার মত তাঁর শ্রাদ্ধকার্য করেছিলেন। হনুমানজী বিচারে পশু হলেও ভক্তির বলে ব্রহ্মারও বন্দনীয় হয়েছেন। এইভাবে বসুদেবের প্রশংসা করে দেবর্ষিপাদ ভাগবতধর্মের মহিমা বর্ণন করছেন। এই ভক্তিধর্মের কথা কানে শুনলে, শোনার পর পাঠ করলে, আস্তিক্য বুদ্ধির দ্বারা ধ্যান করলে, অনুমোদন করলে অর্থাৎ অন্যে কেউ যদি সে ধর্ম আচরণ করে তার সংস্তুতি করলে তৎক্ষণাৎ তাকে পবিত্র করে। বসুদেব তুমি ভাগবতধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছ, তা এ-বিষয়ে আমি নিজের কথা আর কি বলব? সাধুদের কথা বলবার এইটিই রীতি—প্রাচীন ঐতিহ্যের অবতারণা করেন। আমি বলছি, বলেন না—ইতিহাস আছে—ত্রেতাযুগে মহারাজ নিমির (রাজর্ষি জনকের পূর্বপুরুষ) সভায় নবযোগীন্দ্রের যে সংবাদ হয়েছিল—তাই আমি বলি, তুমি শ্রবণ কর।

নিমিরাজের সভায় নবযোগীন্দ্রের আগমন ও তাঁদের পরিচয়

ত্রেতাযুগে নিমিরাজের রাজত্বকাল। নিমিরাজ রাজর্ষি জনকের পূর্বপুরুষ। নিমিরাজ যখন বিদেহ হন নি তখনকার প্রসঙ্গ। এ বড় পুরাতন ইতিহাস। কারণ দ্বাপরযুগে শ্রীদ্বারকামন্দিরে বসে কৃষ্ণপিতা বসুদেবকে দেবর্ষিপাদ বলছেন, এ নবযোগীন্দ্র প্রসঙ্গ—এ দ্বাপরযুগ হল অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের দ্বাপর। আর চতুর্বিংশতি চতুর্যুগের ত্রেতায় ভগবান রামচন্দ্রের অবতার অর্থাৎ কৃষ্ণ-অবতারের সতের যুগ আগে। তাই নিমিরাজ প্রসঙ্গ বড় প্রাচীন প্রসঙ্গ। সৃষ্টিকর্তা লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁর দক্ষিণ অঙ্গ থেকে পুত্র মনু এবং বাম অঙ্গ থেকে শতরূপা কন্যাকে সৃষ্টি করে তাদের বিয়ে দিলেন। এই মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত। তাঁর পুত্র আগ্নীধ্র— আগ্নীধ্র-পুত্র হলেন নাভি, নাভি-পুত্র ঋষভদেব। এই ঋষভদেব ভগবান বাসুদেবের অংশ। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর কন্যা জয়ন্তীর সঙ্গে ঋষভদেবের বিয়ে দেন। ঋষভদেবের শতপুত্র জন্মগ্রহণ করে। এঁরা সকলেই বেদশাস্ত্রে নিপুণ। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হলেন রাজর্ষি ভরত। যাঁর নাম থেকে অজনাভবর্ষের নাম হয় ভারতবর্ষ। রাজর্ষি ভরতের পরিচয় দিতে গিয়ে শুকদেব বড় গরব করে বলেছেন :

> যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
> জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ॥ ভা. ৫।১৪।৪৩

গোবিন্দসেবাতে যাঁদের চিত্ত মজেছে, তাঁরাই জগতে মহান। এই মহান ব্যক্তির কাছে মুক্তিসুখও তুচ্ছ। রাজর্ষি ভরত রাজ্য-সম্পদ মলবৎ ত্যাগ করেছিলেন। 'মলবৎ'-এ উপমা কেন? এর দুটি তাৎপর্য আছে। একটি হল মলত্যাগেই স্বাস্থ্য রক্ষা পায়, আর দ্বিতীয়তঃ মলত্যাগের জন্য পরে যেমন কারও চিত্তে কোন আক্ষেপ ওঠে না—রাজর্ষি ভরতও তেমনি সেই দৃষ্টিতে রাজ্যসম্পদ ত্যাগ করেছিলেন। জীবের স্বরূপ হল নিত্য কৃষ্ণদাস—এইটিই তার স্বাস্থ্য। আর রাজ্যত্যাগের জন্য তাঁর পরে কোন আক্ষেপ হয় নি। শুকদেব এই কথা বলবার পর মহারাজ পরীক্ষিৎ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করছেন—ব্রহ্মন্, এই অতুল রাজ্যসম্পদ মলবৎ কেমন করে ত্যাগ করা যায়? শুকদেব উত্তরে বললেন—উত্তমঃশ্লোকলালসঃ। ভগবানে লালসা হলে ত্যাগ আপনিই হয়ে যায় মহারাজ। হরিণের প্রতি আসক্তিতে ভরতকে হরিণ হয়ে জন্মাতে হল। ভজন বড় কঠিন ঠাঁই। এ একেবারে খাঁটি সোনা। একটু খাদ থাকলেও ওজনে চাপান যায় না। ভগবানের বাক্য আছে ঃ

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ গীতা ৮।৬

যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে যে চিন্তা নিয়ে দেহত্যাগ করে তার পরবর্তী জন্মে সেই দেহ প্রাপ্তি হয়। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ বিচার করেছেন—রাজর্ষি ভরত হরিণ হন নি। জগৎকে দেখাবার জন্য তিনি একটা জন্ম হরিণরূপ ধারণ করেছেন। নিজে হরিণরূপ ধারণ করে জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছেন—তোমরা যেন কেউ

হরি ভজতে গিয়ে হরিণ ভজ না। তাহলে আমার মত অবস্থা হবে। মহাজন নিজে দুঃখ বরণ করে জগৎকে শিক্ষা দেন। যেমন ভগবান রামচন্দ্র পরব্রহ্ম বনে বনে ঘুরছেন, সীতাবিরহে কেঁদে আকুল হচ্ছেন, তাঁর শোকে পাষাণ গলে যাচ্ছে, বজ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দ রাধা প্রভৃতি গোপবালার বিরহযাতনা ভোগ করেছেন, কত কষ্ট বরণ করেছেন, সবই লোকশিক্ষার জন্য। কৃষ্ণ এখানে চালাকি করেছেন। যারা হরি ভজতে চায় তাদের শিক্ষা দেবার জন্য নিজের লোক দিয়ে উদাহরণ রেখেছেন—যেমন তেতাস খেলায় নিজের লোক দিয়েই খেলায়। তারাই হারে, তারাই জেতে। বাইরের লোক তাই দেখে খেলায় লুব্ধ হয়। চতুরাম্বুধি চতুর-চূড়ামণি কৃষ্ণ জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছেন, ভরতকে দেখে যেন কেউ হরি ভজতে হরিণ ভজ না—সবই কৃষ্ণের চতুরতা। এর থেকে শিক্ষা হল, দয়া ভক্তির বিরোধী হলে সে দয়াকেও ত্যাগ করতে হবে। এর চরম দৃষ্টান্ত হল রাজর্ষি ভরতের উপাখ্যান। দয়াধর্মকে পরমধর্ম বলা হয়েছে। তুলসীদাসজী বলেছেন ঃ

দয়া ধরম কি মূল হ্যয়
নরকমূল অভিমান।
তুলসী মাৎ ছোড়িয়ে দয়া—
যব কণ্ঠাগত জান॥

দয়াবৃত্তি না থাকলে কোন গুণই কাজে লাগে না। মহাজন বলেছেন ঃ

কি করব জপ তপ দান ব্রত নৈষ্ঠিক
যদি করুণা নাহি দীনে।
সুন্দর কুল শীল রূপ গুণ যৌবন
কি করব লোচন হীনে॥

কিন্তু এই দয়া যদি ভক্তির বাধক হয়, তাহলে তাতে সুফলের পরিবর্তে কুফল ফলে। এ বিষয়ে আর একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সৌভরি উপাখ্যান। কালীয় হ্রদে গরুড়ের যেতে মানা ছিল—সৌভরি মুনির অভিশাপ। হ্রদের মাছ গরুড়কে বিনাশ করতে দেখে মাছেদের প্রাণরক্ষার জন্য মুনির প্রাণ কেঁদে উঠল। তাই তিনি গরুড়কে নিষেধ করেন, তুমি আর এ হ্রদে এসো না। গরুড় পরম বৈষ্ণব। তাই ব্রাহ্মণকে অপমান করেন নি। সেই নিষিদ্ধ হ্রদে যান নি। কিন্তু এতে সৌভরির বৈষ্ণব অপরাধ হল। ফলে সংসার বন্ধন হল। তখন সত্য-যুগ। মান্ধাতার পঞ্চাশটি কন্যা স্বয়ংবরা হয়ে সৌভরিকে বরণ করলেন। তপোবলে মদননিন্দিত কান্তি ধারণ করে যোগবলে পরমসুখসাগরে গা ভাসিয়ে মুনি সংসার করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁর মন ফিরল। বিষয়ভোগ সহজে নিবৃত্তি হয় না। কাঠ আর ঘি নিরন্তর জোগালে আগুন কখনও নেভে না—সৌভরির জ্ঞান ফিরলে বুঝতে পারলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন—ভক্তিবাধিনী দয়া আর করব না।

রাজর্ষি ভরত বহুদিন রাজ্যভোগ করবার পর যখন বুঝতে পারলেন যে, সংসারে নূতন সুখ আর কিছু নেই তখন তিনি

রাজ্য ত্যাগ করে বনে গেলেন। দৃষ্টশ্রুত যা কিছু বন্ধন তা লালসাতেই হয়—লালসাই বন্ধন। অন্য কোন কামনা যদি মনের কোণে স্থান না পায় তবে সে ভক্তি হবে উত্তমা। কৃষ্ণ-পাদপদ্ম মহিমার আরাধনা করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম অর্চনার এমনই মহিমা যে 'শ্রীকৃষ্ণার্চনং ভ্রষ্টমপি উদ্ধরতি'। হরিণজন্মেও ভরতের পূর্বস্মৃতি বিনষ্ট হয় নি। হরিণ-জন্মে ভরত সাধুদের কাছে বসে কৃষ্ণকথা শুনতেন। অবিদ্যা ব্যাঘ্রীর তাড়নায় সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সাধুবৈদ্য পুলহ পুলস্ত্যাদি ঋষির আশ্রমে এইভাবে ভরতের পশুজন্ম কাটল। পশু হয়ে ভরত যা করেছেন, আমরা মানুষ হয়েও তা করি না। তৃতীয় জন্ম জড়ভরত জন্মই ভরতের চরম জন্ম। এই জন্মই তাঁকে হরি-চরণে স্থান দিল। এতটুকু খাদ থাকা পর্যন্ত হরিচরণে যাওয়া যায় না। গোবিন্দ বড় রসিক রসের, নূন্যতা থাকলে নেন না, রসে পেকে তৈরী হলে তবে গোবিন্দের ভোগে লাগে। তৈরী আমের মত, তৈরী গোপী, তাই রাসলীলায় গোবিন্দের ভোগে লেগেছিল। গোপী তিন শ্রেণীর—নিত্যসিদ্ধা, কৃপাসিদ্ধা এবং সাধনসিদ্ধা। নিত্যসিদ্ধা ললিতা বিশাখা প্রভৃতি, কৃপাসিদ্ধা শ্রুতিগণ আর সাধনসিদ্ধা দণ্ডকারণ্যের মুনিগণ। এদের সকলকে ব্রজধামে ডাঁক দিলেন—রসপুষ্ট হবার জন্য। যেমন যেমন তৈরী হবে তেমনি তেমনি গোবিন্দের ভোগে লাগবে। নিত্যসিদ্ধা নিত্যই সুপক্ক সুরসিকা, রসের ন্যূনতা তাদের নেই। আর কৃপাসিদ্ধা যারা তাদেরও কোন দোষ থাকতে পারে না। গোবিন্দের কাছে যাওয়া বড় কঠিন। হরিণজন্মে ভরতের যা

কিছু খাদ ছিল তা কেটে গেছে। জড়ভরত এই চরম জন্মে জনসঙ্গে ভীত, কথা কইবেন না কারুর সঙ্গে। কারণ কথাই আসক্তির দ্বার। ভ্রাতৃজায়ার প্রদত্ত অবহেলিত কদন্ন পরম অমৃতজ্ঞানে ভক্ষণ করতেন। জড়ভরতের নিজের কোন চেষ্টা নেই। জড়ভরতকে ডাকাতেরা বলি দিতে নিয়ে গেল। জড়ভরতের কোন আপত্তি নেই। সমর্পিত আত্মার কোন আপত্তি থাকতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞশিরোমণি অধোবদনে উপবেশন করলেন। দেবী ভদ্রকালী ভক্তের মহিমা রক্ষা করবার জন্য ফেটে গেলেন। ভগবৎভক্তের মহিমা রক্ষা করতে পারায় দেবীর বড় আনন্দ। এই উপখ্যান শুনে মহারাজ পরীক্ষিৎ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—ব্রহ্মন্, ডাকাতেরা তো দেবীর পূজা করতে এসেছিল, তাহলে উল্টো ফল ফলল কেন? শ্রীশুকদেব উত্তরে জানালেন—মহদতিক্রম করলে তার ফল নিজের ওপরেই ফলে। দেবীর ওপর ভগবানের আজ্ঞা আছে ভক্তকে রক্ষা করবার জন্য। জড়ভরতের সমস্ত চিত্ত শ্রীভগবানের পাদপদ্মে ডুবে গেছে। হরিভক্তিতে লেগে থাকলে তার ভার হরিই নিজে নেন। হরিপাদপদ্ম ভজে না খেতে পেয়ে মরে গেছে এ দৃষ্টান্ত নেই। শ্রীবাস পণ্ডিত হাতে তিনতালি দিয়ে শ্রীগৌরসুন্দরকে বলেছিলেন—তিনবার তোমার নাম করে যদি খেতে না পাই গঙ্গায় ঝাঁপ দেব, আর লোকের কাছে বলব, হরিনাম খেতে দেয় না। রত্নাকর দস্যু (বাল্মীকি) দীর্ঘদিন তপস্যা করে উই ঢিপি হয়ে গেছেন কিন্তু বেঁচে আছেন—মরেন নি। অন্নজল খাদ্য না পেলেও এমন খাদ্য পেয়েছেন যাতে বেঁচে আছেন। খাদ্য

তো শুধু দেহের নয়, দেহের খাদ্য অন্নজল, আর আত্মার খাদ্য নামামৃত—এই রামনামামৃতের ঝরণা রত্নাকর দস্যু আকণ্ঠ পান করেছেন তাই তিনি মরেন নি। জগতের প্রতিটি বস্তু বৈচিত্র্য-পূর্ণ, তার কারণ সবটাতেই মায়া আর ভগবান মেশান আছে। গৌরগোবিন্দপাদপদ্ম যিনি ভজন করেন, তিনি হলেন ভাগবত পরমহংস। মহাজন বলেছেন,—'কৃষ্ণনাম ভজে যে সে বড় চতুর।' ক্রমশঃ চাতুরী করে সংসারকে ফাঁকি দিয়ে ভগবানের কাছে যেতে হবে—এরাই ভাগবত পরমহংস।

জড়ভরত বড় চতুর। রাজা রহূগণের পাল্কী বইছেন। এর দ্বারা কি তিনি প্রারব্ধ ক্ষয় করছেন? এতে বিচার আছে—যে জড়ভরতের পদরজঃ যোগী মুনি বাঞ্ছা করেন, তাঁর আবার প্রারব্ধ ক্ষয় কি? মাতা দেবহূতি পুত্র ভগবান কপিলদেবকে বলেছেন ঃ

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাৎ যৎপ্রহ্বণাদ্‌যৎস্মরণাদপি কচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥
—ভা. ৩।৩৩।৬

এ কথার দাম আছে। গোস্বামিপাদগণ বিচার করেছেন—ভগবানের নাম শ্রবণ করলেই তার প্রারব্ধ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়ে যায়। যজ্ঞের বাধক চণ্ডালত্ব যে দুর্জাতি তাও তৎক্ষণাৎ চলে যায় এবং সে যজ্ঞ করবার অধিকারী হয়। শ্রীজীবপাদ প্রশ্ন তুলেছেন, তাহলে সেই চণ্ডাল তখন যজ্ঞ করবে কি না? ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের টীকায় শ্রীজীবপাদ বিচার করেছেন, ভক্তিই একমাত্র প্রারব্ধ নষ্ট করে। অন্য কোন সাধন, জ্ঞান-

যোগ বা নিষ্কাম কর্ম কিছুতেই প্রারব্ধ যায় না—প্রারব্ধ কর্ম তাকেই বলা হবে যার ফল ভোগ করা আরম্ভ হয়েছে। অন্যান্য সাধনে সঞ্চিত কর্ম নষ্ট হলেও প্রারব্ধ নষ্ট হয় না। ভোগ না করা পর্যন্ত তার ক্ষয় নেই। ভোগের দ্বারাই একমাত্র প্রারব্ধ নাশ হয়। ভোগ না করে অন্য সাধনে প্রারব্ধ যায় না—'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি!' বেদান্তে জীবন্মুক্ত বলে একটি কথা আছে; এমনই ঠেকা যে মুক্তিলাভ করবার পরেও তার জীবনধারণ করতে হচ্ছে—ভোগ করে প্রারব্ধ নাশ করতে হবে বলে। জীবন্মুক্ত তাকেই বলা হবে যার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে অথচ প্রারব্ধ ক্ষয়ের জন্য দেহ ধারণ করে থাকতে হয়েছে। এই হল জ্ঞানশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভক্তিশাস্ত্রেও জীবন্মুক্ত সংজ্ঞা আছে। তুলারাশিতে অগ্নি সংযোগের মত ভক্তিস্পর্শমাত্রে প্রারব্ধ নিঃশেষ হয়। দেবর্ষিপাদ জীবন্মুক্ত শব্দের সংজ্ঞা করেছেন যে সর্বদা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত। দেবর্ষিপাদ তো জানেন না আমাদের জগতে কত আঠা– পাখী যেমন খাঁচায় থেকে থেকে বদ্ধ হয়ে যায়, ছেড়ে দিলেও উড়তে পারে না, আমাদেরও তেমনি পা বাঁধা আছে সংসারের খুঁটোয়। ভগবানের সঙ্গে জীবের কেমন করে সংযোগ হবে? ভগবান থাকেন কোথায় আর জীব থাকে কোথায়? মহাজন বলছেন, ভগবান দূরে থাকলেও ক্ষতি নেই 'যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥' নামসংযোগ হলেই ভগবানের সঙ্গে সংযোগ হল। ব্রহ্মজ্ঞানও প্রারব্ধ নাশ করতে পারে না। জ্ঞানবাদী প্রশ্ন তুলেছেন—ভক্তিসম্পর্ক যদি প্রারব্ধই

নষ্ট করে—তাহলে প্রারব্ধের ফলে যে দেহ ধারণ হয়—তা কেমন করে থাকে ? জ্ঞানীরা তো ভক্তির ঘরের লোক নয়—তাই বাইরের লোকের মত প্রশ্ন করেছেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ এর জবাব দিয়েছেন—ঐন্দ্রজালিক যেমন গলাকাটা খেলা দেখায়, গলা সত্যি করে না কাটলেও যেমন কাটাই দেখায়—এও তেমনি গৌরগোবিন্দের কৃপার খেলা—এখানেও তেমনি প্রারব্ধ না থাকলেও আছে বলে দেখায়। এতে প্রয়োজন কি ? প্রয়োজন আছে—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের রথ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ভগবান রথ বাঁচিয়ে রেখেছেন। তা না হলে অর্জুনকে শত্রুপক্ষের কাছ থেকে উপহাস, অপমান পেতে হত, অর্জুনকে আবার নূতন করে রথ খুঁজতে হত। গোবিন্দের দাস জীব হল রথী, দেহ তার রথ—এখানে যুদ্ধ হল মায়ার সঙ্গে। মায়া নানা শৃঙ্খলে জীবকে বেঁধেছে। মায়ার বন্দী জীব স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আনন্দ করে, মায়ার বাইরে সাধুর চরণে যেতে পারে না। মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে জীবের কৃষ্ণদাস্য সিংহাসন পেতে হবে। মায়া এবং মায়ার চর আমাদের নিরন্তর ধনী, মানী, কুলীন পণ্ডিতের সিংহাসন দিচ্ছে। অর্জুন তো তাঁর দুখানি হাত দিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু আমাদের হাত পাঁচখানি বা তার চেয়েও বেশী। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি এই হাত দিয়ে আমরা শ্রবণ কীর্তন প্রভৃতি বাণ নিক্ষেপ করলে মহামায়া অচিরে বিধ্বস্ত হবে। পিতামহ ভীষ্মের বাণে যেমন অর্জুনের রথ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল তেমনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভীষ্মের দেওয়া মন্ত্রবাণ যেদিন আমাদের কানে প্রবেশ করেছে সেইদিনই

আমাদের দেহ নাশ হয়েছে। কৃষ্ণ ইচ্ছায় অর্জুনের রথ টাটকা ছিল। নূতন রথ, খুঁজতে হয় নি। ভক্তের দেহও ভগবানের ইচ্ছায় ঠিক থাকে। কারণ নূতন দেহধারণে কাল বিলম্ব হবে। অর্জুনকে আঠার দিন যুদ্ধ করতে হয়েছিল। আর জীবকে অনেকদিন ধরে ভজতে হবে। প্রারব্ধ নাশ তখনই হয়ে গেছে, কিন্তু প্রারব্ধ যেন আছে এইরকম দেখায়। যার প্রারব্ধ নাশ হয়েছে তাকেও জানতে দেওয়া হয় না। কারণ তাহলে সে আর ভক্তি অঙ্গ যাজন করবে না। জ্ঞানিগণ এতেও সন্তুষ্ট নন। তাঁরা বললেন এ তো কথার চালাকি। প্রারব্ধ নাশ যার হয়েছে, আর যার নাশ হয় নি—এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য কি? শ্রীচক্রবর্তিপাদ বললেন, দুই ব্যক্তি—একজন প্রারব্ধ ভোগ করছে আর একজন অপূর্ব ভোগ করছে। প্রারব্ধভোগী আর অপূর্বভোগী—ওপরে ঘরের চালা ঠিক রেখে যেমন তলায় তলায় খুঁটি বদলান হয়, চালা জানতেই পারে না, তেমনি যার প্রারব্ধ নাশ হয়েছে, তার ভিতরে ভিতরে দেহ বদলে গেছে, কিন্তু জানতে পারে না অর্থাৎ তাকে জানতে দেওয়া হয় না; কারণ প্রাকৃত ধর্ম চলে গিয়ে অপ্রাকৃত ধর্ম তার এসে গেছে—এ কথা জানতে পারলে তার ব্যবহারে অসুবিধা হবে। আর ভক্তিযাজনও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। প্রারব্ধভোগী যে, তার পরকাল চিন্তা আসে না—অসাড়ে বিষয়ভোগ করে। আর যার প্রারব্ধ নাশ হয়েছে অথচ দেহ ধারণ করে কর্ম ভোগ করছে অর্থাৎ অপূর্ব কর্মভোগী, সে বিষয় ভোগ করতে গেলেই কাঁটা বেঁধার মত দুঃখ ভোগ করে—ব্যথা অনুভব করে। জড়ভরত এইরূপ অপূর্ব

কর্মভোগী ব্যক্তি। রাজা রহূগণের শিবিকা বহন করছেন নির্বিচারে।

রাজর্ষি ভরতের চরম কলেবর হল জড়ভরত জন্ম। নির্বাধে রাজার পালকি বইছেন। কোন আপত্তি নেই, সুখ বা দুঃখ কোনটাতেই আপত্তি করলে প্রারব্ধ বাড়বে। পাপ পুণ্য কোনটিকেই নেওয়া চলবে না—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমশাই তাই বলেছেন, 'পাপ পুণ্য দুই পরিহরি'।

পুণ্য যে সুখের ধাম তার না লইও নাম
পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি।

মহাজন বলেন, স্বর্ণশৃঙ্খল আর লৌহশৃঙ্খল। পাপের বন্ধন কখনও কাটতে পারে কিন্তু পুণ্যবন্ধন কিছুতেই কাটে না। তার আসক্তি বড় বেশী। যেমন লোহার শৃঙ্খল বন্ধন বলে মনে হয় কিন্তু সোনার শিকলে যদি চরণ আবদ্ধ থাকে, তাহলে আর বন্ধন বলে মনে হয় না, বরং মনে হয়—বেশ আছি। গীতায় ভগবান বলেছেন ঃ

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে। গীতা ২।৫০

দৈব হল পূর্বজন্মকৃত কর্ম—এরই নাম কর্মফল। দেবর্ষিপাদ বলেছেন ঃ

তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং কালেন সর্বত্র গভীররংহসা।

—ভা. ১।৫।১৮

জীবের পাওনা সুখ বা দুঃখ সে পাবেই, তার জন্য চেষ্টার প্রয়োজন নেই। ব্রহ্মা বলেছেন ঃ

তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥
—ভা. ১০।১৪।৮

যে ব্যক্তি ভগবানকে ফুলের মালা পরায় তার ওপর ভগবান যত না সন্তুষ্ট হন, অজ্ঞানে আচ্ছন্ন জীবকে তাঁর পাদপদ্মে উন্মুখ করে দিলে ভগবানের আর তৃপ্তির সীমা থাকে না। 'জীবকে আমার পাদপদ্ম পাইয়ে দিলে আমি বেশী সুখী হই'—এইটিই ভগবানের নিজের মত। ব্রহ্মাকে ভগবান জিজ্ঞাসা করছেন—'ব্রহ্মন্, তুমি তো সৃষ্টিকর্তা, তোমার তো কর্তব্য আছে। জীব কেমন করে আমার পাদপদ্ম পাবে এ সম্বন্ধে তুমি কি স্থির করেছ বা কি বিচার করেছ? তুমি বল—যদি তোমার বাক্যে ভুল থাকে তাহলে আমি সংশোধন করে দেব।' ব্রহ্মা বলছেন—"ভগবন্, আমি যখন বেদপাঠ করেছিলাম—বেদবক্তা যখন আমি তখনও আমার এ জ্ঞান হয় নি—তোমার কৃপায় এখন আমার জ্ঞান হয়েছে। যে ব্যক্তি তোমার কৃপাকে 'সু' এবং 'সম' করে দর্শন করে—'সু' অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়ে এবং 'সম' অর্থাৎ অন্যদেবতানিরপেক্ষভাবে।" আত্মকৃত-বিপাক হল নিজের কর্মফল। বিনা আপত্তিতে ভোগ করে, তোমার কৃপার দিকে কেমন করে তাকাতে হয়? তোমার কৃপার দিকে চাওয়া মানে তোমার কৃপাকে বুঝে নেওয়া। প্রতিক্ষণে তাঁর কৃপার দিকে চাইতে হবে। আকাশ, বাতাস, ফল, ফুল, নদী, জল, মাতাপিতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ঘর বিত্ত—সবই তাঁর করুণার প্রকাশ। কৃপার তিনটি রূপ—

ব্যবহারিক পারলৌকিক ও পারমার্থিক। সব তাঁর কৃপা। কৃপা না হলে পরমার্থের সঙ্গে সম্পর্ক হয় না, সাধুদর্শন হয় না। মহাজন বলেছেন :

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে।।

শ্রীগুরুকৃপা চিকের আড়ালে শ্রীগৌরগোবিন্দ থাকেন। কৃপা ছাড়া হরিনাম কানে ঢোকে না। সাধুদর্শন, হরিনাম আমাদের কাছে সস্তা হয়েছে, তাই আমরা কৃপা বলে বুঝি না। বর্ষার জল যখন ঘরে এসে ঢোকে তখন তাকে আমরা তাড়াতে যাই। আবার গ্রীষ্মকালে সেই একবিন্দু জলের জন্যই হাহাকার ওঠে। এখনকার যুগে নিতাইগৌরের করুণার বন্যার যুগ—প্রেমের প্লাবন বয়ে গেছে। চারিদিকে হরিনাম সঙ্কীর্তন, সাধুবৈষ্ণব দর্শন এত সস্তা হয়েছে যে কৃপা বলে বুঝতে পারা যায় না। কৃপা অনেক, শ্রীগুরুদেব অনেক কৃপা করেছেন। কৃপার চাপ যতই অনুভব হবে ততই দীনাতিদীন মূর্তি হবে। ভক্ত, আত্মকৃত বিপাক—অবশ্য ভোক্তব্য কর্মফল, বিনা আপত্তিতে ভোগ করে এবং তার মধ্যে তোমার কৃপা অনুভব করে। তারা কায়মনোবাক্যে ভগবানের চরণে প্রণাম করে—এইটিই সাধন। ব্রহ্মা বললেন, 'জীব যে উপায়ে কৃষ্ণপাদপদ্ম পাবে তার উপায় আমি এইটিই নির্ধারণ করেছি।' ভগবান স্বয়ং এতে সম্মতি দিয়েছেন। শ্রীজীবপাদ বলেছেন,—'নমঃ' পদটি ভক্তি অঙ্গের প্রতিনিধি অর্থাৎ প্রণামের দ্বারা কায়মনোবাক্যে শ্রবণাদিকেও বুঝাচ্ছে। পিতার সন্তান যেমন কেবলমাত্র প্রাণে বেঁচে থাকলেই

পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হয়, তেমনি সাধক যদি এইভাবে ভক্তিপথে স্থিতিলাভ করতে পারে, তাহলে সে মুক্তিপদে অর্থাৎ মুক্তি যাঁর পদে—(চরণে) থাকে সেই ভগবানের প্রেমসম্পত্তির দায়ভাগ হয়। অন্যান্য যুগের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের সন্তানেরা তপস্যা, যজ্ঞ, অর্চনা করছে, সাধনসম্পদ তাদের আছে কিন্তু কলির জীব কিছু পারে না। সাধনসম্পদহীন—তবু যদি শুধু পিতার অনুকূল হয়ে 'হা গৌর গোবিন্দ' বলে জীবন কাটাতে পারে (পিতাকে ত্যাগ যদি না করে পিতার ত্যাজ্য পুত্র যদি না হয়) তাহলেই পিতা ভগবানের প্রেমসম্পত্তির দায়ভাগী হবে। কাণা খোঁড়া ছেলে হলে কি হয়, বেঁচে থাকলেই ভাগের ঠাকুর। ভাগের বেলায় সমান। ভক্তিমার্গে থাকার নামই জীবন। শ্রীজীবপাদ বলেছেন,—ভক্তিমার্গে স্থিতিরেব জীবনম্।

এখন প্রশ্ন হতে পারে ভক্ত যদি নিজের বিপাকই ভোগ করল তাহলে আর কায়মনোবাক্যে কেমন করে ভজবে? শ্রীজীবপাদ তাই আর একটি 'অর্থ' করেছেন—ভুঞ্জান নয় অভুঞ্জান। লুপ্ত অকারটি প্রশ্লেষ করে নিতে হবে। অর্থাৎ ভক্তের আর কর্মফল (আত্মকৃত বিপাক) ভোগ করতে হয় না, কর্মফল তাদের আপনা থেকেই খণ্ডন হয়ে যায়। সাধক কিন্তু বুঝতে পারে না যে তার প্রারব্ধ খণ্ডন হয়ে গেছে। জড়ভরত তাই আপত্তি না করেই পালকি বইছেন দেখে মনে হচ্ছে প্রারব্ধ ভোগ করছেন। তা নয়। প্রারব্ধের মত দেখালেও প্রকৃতপক্ষে প্রারব্ধ নয়, প্রারব্ধবৎ। এই জড়ভরত জন্মই রাজর্ষি-

ভরতের তৃতীয় জন্ম বা চরম জন্ম। এই জন্মেই তাঁর হরিপাদপদ্ম প্রাপ্তি হয়েছিল।

ভগবান ঋষভদেবের একশত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র রাজর্ষি ভরতের পরিচয় আমরা পেলাম। রাজর্ষি ভরত ছাড়া আর নয় জন পুত্র ব্রহ্মাবর্ত প্রভৃতি নয়টি ভূমণ্ডলের অধিপতি হয়েছিলেন। আর একাশী জন কর্মমার্গ প্রবর্তক ব্রাহ্মণ হয়ে ভারতবর্ষে বাস করতে লাগলেন। বাকী যে নয়জন থাকলেন তাঁরাই নব যোগীন্দ্র নামে খ্যাত। এঁরাই মহারাজ নিমর সভায় সমাগত হয়েছিলেন। তাঁরা মহাভাগ্যবান, কারণ ভগবান দেখাই তাঁদের স্বভাব, বিষয় ভাবতে তাঁরা পারেন না। তাঁরা যদি অন্যকে কৃপা করেন তবেই তাঁদের মহাজন বলা হয় নতুবা নয়। মহাবৃক্ষ তাকেই বলা হবে, যাকে আশ্রয় করে অনেক পাখী থাকে। নৌকাকে এইজন্য মহাজন বলা হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মও তেমনি তরণী। নবযোগীন্দ্র অপরকে কৃপা করেছেন। তাই তাঁরা মহাজন—মহাভাগ্যবান। এই নয় জন যোগীন্দ্র মুনি অর্থাৎ মৌনব্রতধারী অথবা ভগবৎমননশীল। সাধুজন বাক্যে সংযত কিন্তু ভগবৎপ্রসঙ্গে বড় মুখর হয়ে ওঠেন। তাঁরা অর্থশংসিন, পরমার্থের নিরূপক। জগতে সাধারণত মানুষ অর্থ উপার্জনে পটু হয় কিন্তু পরমার্থ উপার্জনে যাঁরা চতুর তারাই প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান। এঁরা শ্রমণা, শ্রমবিমুখ বা শ্রমকাতর নন, কিন্তু শ্রমশীল, কিন্তু এ পরিশ্রম সংসারের জন্য নয়, আত্মাভ্যাসে কৃতশ্রমা। ভজনের পরিশ্রম এঁরা স্বীকার করেছেন। ভজনের জন্য যিনি যত পরিশ্রম করবেন, ভগবানের কৃপার ধারাও তাঁর

প্রতি তত ঝরে পড়বে। ভজনপথ এমনই যে, হরি পাওয়ার পরেও ভজন করতে হবে। পাওয়ার পরেও যে ভজন তাতেই আরও বেশী সুখ। এ ভজন হল হরিকে ধরে রাখবার উপায়, এ হল বণিকের বৃত্তি। মহারাজ অম্বরীষ যেমন অষ্টপ্রহর নবধা ভক্তিঅঙ্গ যাজন করতেন, তাতেও তৃপ্ত না হয়ে আরও বেশী করে ভজন করবেন বলে বনে গেলেন। এটি বণিকের স্বভাব। নিজের হাজার থাকলেও তারা সুখী হয় না। আরও চায়। তপোলোকে নবযোগীন্দ্র আছেন। সেখানে সনকাদি মুনিগণও আছেন। বাতবসনা যোগীন্দ্রগণ, এঁরা দিগম্বর মূর্তি। বাইরের বসনভূষণের প্রয়োজন হয় তারই যার দেহাভিনিবেশ আছে। আর যাদের দেহবুদ্ধি নেই তাদের আবার বসনের কি প্রয়োজন? আত্মবিদ্যাবিশারদ যোগীন্দ্র, আর্থাৎ, হরি-বিদ্যাতে বিশারদ। 'আততাৎ মাতৃত্বাচ্চ আত্মা হি পরমো হরি।' গর্ভোদশায়িরূপে ধারণ পোষণ ব্যাপকতা এবং মাতৃত্ব, এ আত্মবিদ্যা হল হরিকে পাবার বিদ্যা। এদের নাম যথাক্রমে—কবি, হবি অথবা হরি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড় অথবা দ্রুমিল, চমস এবং করভাজন। তাঁরা পৃথিবীতে বিচরণ করেন, জগতে যেদিকে তাঁরা দৃষ্টিপাত করেন তাতে ভগবানের রূপই প্রত্যক্ষ করেন। স্থাবর-জঙ্গম, সৎ-অসৎ, কার্য-কারণ, স্থুল-সূক্ষ্ম কিছু বোধ নেই। সর্বত্র তাঁদের ভগবৎদর্শন। ভগবান বলেছেন:

ময়াঽধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। গীতা ৯।১০

ঘট পেলে যেমন উপাদান কারণ মাটিকে পাওয়া যায়, কুম্ভকার যে ঘটের প্রতি নিমিত্ত কারণ, তাকে পাওয়া যায়

না, তেমনি ব্রহ্মাণ্ডঘট এই জগৎকে পেলে মায়াকে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ভগবানকে পাওয়া যায় না। কুম্ভকারের মত ভগবানকে খুঁজতে হবে। শাস্ত্র ভগবানের ঠিকানা যা বলেছেন তাতে বিশ্বাস করে ভগবানকে খুঁজতে হবে। শাস্ত্র বলেছেন, 'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ'। জগৎ পেলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রের উপদেশ শুনতে হবে। তামস অহঙ্কার থেকে পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি। যোগীন্দ্রগণ কার্যকারণাত্মক জগৎকে দেখছেন, স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎকে আত্মা হতে অভিন্নভাবে দেখছেন। মহাজন বলেছেন, ভক্তের দৃষ্টি এই রকমই হয়ঃ

> স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি।
> সর্বত্র হয় যে তার ইষ্টদেব স্ফূর্তি ॥

এ কথার ধারাটি কি? এ বাক্য মহাজন বললেন কেন? মনে করা যাক কোন মায়ের সন্তান হারিয়ে গেছে, হয়ত সে ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, তার সন্ধান পান নি। তখন সেই ছেলের অভাব তাকে সর্বদার তরে ব্যথা দেয়। পুত্রবিরহের ব্যথায় সে তখন মরমের কান্না কাঁদে। ছেলের ব্যবহার করা জিনিষপত্র দেখলে তার স্মৃতি আরও বেশী করে মনে পড়ে। ছেলের প্রতিটি জিনিষে ছেলের ছাপ পড়ে, তেমনি সাধক এ জগতের স্থাবর-জঙ্গম, পত্র-পুষ্প, ফল-জল, আলো-বাতাস, তরু-পল্লব, নদী-পর্বত যা দেখে তার মধ্যে স্রষ্টার স্মৃতি জাগে— মনে হয় এর মধ্যে স্রষ্টা আছেন। তাই স্থাবর-জঙ্গম যা কিছু দেখে সবেতেই ইষ্টদর্শন করে, নিজেকে তদনুগত হয়ে দর্শন করছে।

নয়জন যোগীন্দ্র, এঁরা অব্যাহতেষ্টগতয়ঃ, যথেচ্ছভাবে সর্বত্র বিচরণ করেন। এঁদের গতিতে কোথাও বাধা নেই, সুর সিদ্ধ সাধ্য গন্ধর্ব যক্ষ নর কিন্নর নাগ লোক—সর্বত্র অবাধগতি। তাঁরা যদৃচ্ছায় একদিন মহারাজ নিমির সভায় উপস্থিত হলেন। নব যোগীন্দ্র দৈবগতিতে স্বয়ং সমাগত হয়েছেন। মহৎ কৃপা যাদৃচ্ছিকী। কৃপা তো খাজনা নয়—তাই পাওনা নেই। কৃপাকারী হলেন দাতা এবং যাকে কৃপা করবেন সে হল ভিখারী। ভিখারীর যেমন কোন পাওনা থাকে না, কৃপা-গ্রহীতারও তেমনি। ভিখারী মুখে বলবে অনেক দিন খাই নি, কিন্তু সেটি যখন তার চেহারায় ফুটবে তখন দাতার হৃদয় গলবে, দাতা দান করবেন। আমরা মুখে বলি কৃপা করুন, কিন্তু কৃপা পাওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। প্রয়োজন কখন বুঝা যাবে? কৃপা না পেলে অন্নজল ত্যাগ হবে। আমাদের কৃপা প্রার্থনা হল, সব বজায় থাক, এর ওপর গৌরগোবিন্দ আসেন আসুন, আপত্তি নেই। কিন্তু তাতে কৃপা হয় না—কাম রাম একত্র থাকে না।

যাঁহা কাম তাহা নাহি রাম।
রবি রজনী নাহি মিলে এক ধাম॥

মহাজন বলেছেন: হয় লোক ভজ না হয় গৌর ভজ ভাই—
দুই বস্তু কভু নাহি মিলে এক ঠাঁই॥

মধ্যাহ্ন ভাস্কর আর অমানিশার অন্ধকার একত্র মিলতে পারে না। আমরা কৃপা প্রার্থনা করি, মুখস্থ কথা বলি। আমাদের কৃপা চাওয়াও তাই, সাধু গুরু বৈষ্ণব মনে মনে বোঝেন।

শুধু ব্যথা পাব বলে কিছু বলেন না। কৃপা পাওয়ার মত ভাব চেহারায় ফোটাতে পারলে মহাজনের কাছে যদি কৃপা করবার মত সম্পদ নাও থাকে ধার করেও তাঁরা কৃপা করেন। দোতলায় বসে কৃপা চাইলে যেমন কৃপা চাওয়াটা হাস্যকর হয়, আমরাও তেমনি অভিমানের দোতলা থেকে কৃপা চাইছি। তাই এটিও হাস্যকর হচ্ছে। কর্মনদীর স্রোতে জীব ভেসে চলেছে, 'নদীর প্রবাহে যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে'—'তীরসঙ্গম্ মহৎকৃপা'। মহৎ কৃপা লাভই জীবনে তীরে পৌঁছান। নবযোগীন্দ্র মহারাজ নিমির সভায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। কেউ তাঁদের চেনন না, কিন্তু তাঁদের স্বরূপের এমনই মহিমা যে সূর্যপ্রকাশতুল্য পরম ভাগবত এই নয়জনকে দেখে যজমান স্বয়ং নিমিরাজ, যজ্ঞীয় অগ্নি—আহ্বনীয়, গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি প্রভৃতি, ব্রাহ্মণ যাজ্ঞিকগণ সকলেই গাত্রোত্থান করে তাঁদের সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। নিমিরাজ বুঝলেন এঁরা নারায়ণপরায়ণ। আমাদের জগতের নারায়ণ-পরায়ণ শব্দে খাদ আছে। আত্মমহিমায় যদি সুখ অনুভব হয় তাহলে বুঝতে হবে ভক্তিস্পর্শ হয় নি। ভক্তিস্পর্শ যার হয়েছে সে শুধু গৌরগোবিন্দেরই মহিমা শুনবে। নিজের মহিমা শুনবে না। পরায়ণ শব্দের অর্থ হল শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, এখানে ষোল আনাই খাঁটি। তাঁদের কান্তি দেখে মনে হল, এঁরা কি তাহলে ব্রহ্মার পুত্র? বিনয়ে অবনত হয়ে নিমিরাজ 'অহো ভাগ্য' বলে মনে করলেন। এ যেন আশার অতিরিক্ত লাভ। ভিখারী যেন চার পয়সার পাওনার পরিবর্তে একটাকা পেয়ে গেছে। নিমিরাজ আজ যজ্ঞ করতে গিয়ে যজ্ঞেশ্বরের পার্ষদ্দের দর্শন পেয়েছেন।

এঁদের এমন কান্তি, এঁরা তাহলে বৈকুণ্ঠনাথের সাক্ষাৎ পার্ষদ্। আবার মনে মনে ভাবছেন, তাই যদি হয়—তাঁরা এখানে আসবেন কেন? বিষ্ণুভক্ত লোকদের পবিত্র করবার জন্য সর্বত্র বিচরণ করেন।

মানুষদেহ দুর্লভ, কৃমিকীটের কাছে এই মানুষদেহ সুদুর্লভ, আমাদের কাছে ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি সুদুর্লভ। প্রহ্লাদও বলেছেন, ক্ষণভঙ্গুর এই দেহ দিয়ে সুদুর্লভ হরিভজন যত তাড়াতাড়ি সেরে নিতে পারা যায় ততই লাভ। যে কাজ চুরাশি লক্ষ দেহে হয় নি, মনুষ্যদেহে সেই হরিভজন কাজ হয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ সাতদিন পরমায়ুতে কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করেছিলেন। খট্বাঙ্গ রাজা অর্ধমুহূর্ত পরমায়ুতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পেয়েছিলেন। কলিজীবের ওপর মহাপ্রভুর করুণা :

দিন গেলে হা গৌরাঙ্গ বলে একবার।
সেজন আমার হয় আমি হই তার॥

গৌরগোবিন্দের ভজন হল পরশমণি, যে পেয়েছে তার পক্ষে সুলভ—এটি হল মুক্তির সাধক। নিমিরাজ বললেন :

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্॥ ভা. ১১।২।২৯

বালিকা বন্ধ্যা নয়, জননী সে হতে পারে কিন্তু পিতৃসংযোগ ছাড়া যেমন বালিকা জন্ম দিতে পারে না, তেমনি মনুষ্যদেহও মুক্তি-সন্তান প্রসব করতে পারে কিন্তু শ্রীগুরুকৃপা সংযোগ ব্যতিরেকে তা একান্ত অসম্ভব। তাই বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শন—এ হল

অলভ্য লাভ! মনুষ্যজীবনের সুলভতা-দুর্লভতা বিচার হবে কাজের ওপর। একমাত্র মনুষ্যদেহ ছাড়া অন্য কোন দেহে হরিভজন হয় না—নীচেও কোন জন্মে নয়, ওপরেও কোন জন্মে নয়। দেবতারা হরিভজন করতে পারেন না স্বর্গে (স্বর্লোকে বা উপরের কোন লোকে)। সুখোন্মাদনা এমনই যে গোবিন্দ ভজতে দেয় না। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রজবাসীর পূজা গ্রহণ করছেন। ঐশ্বর্যের এমনই চাপ যে সে গুরুগোবিন্দ বুঝতে দেয় না। দক্ষ প্রজাপতি হয়েও শিবমাহাত্ম্য বুঝতে পারেন নি। শিবকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, শিব যজ্ঞভাগ পাবেন না। নন্দীর দক্ষের প্রতি অভিশাপ দক্ষের ছাগমুণ্ড হবে। ভৃগুমুনি শিবকে অভিশাপ দিয়েছেন ঃ

ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ॥ ভা. ৪।২।২৮

যাঁরা শিবব্রত করবেন বা তাঁর অনুমোদন করবেন, তাঁরা পাষণ্ডিমধ্যে পরিগণিত হবেন। তা যদি হয়, তাহলে শিব-চতুর্দশীব্রত বৈষ্ণবেরা করলে তো ভৃগুমুনির অভিশাপ লাগবে। এ বিষয়ে শ্রীজীবপাদ সমাধান করেছেন—শিবকে ঈশ্বরবোধে উপাসনা করলে অভিশাপ লাগবে, আর কৃষ্ণভক্ত হিসাবে উপাসনা করলে অভিশাপ লাগবে না। দক্ষের শিবহীন যজ্ঞের কথা দেবর্ষিপাদ ইচ্ছা করেই শিবপার্বতীকে নিবেদন করলেন। ইচ্ছা যে, মহতের নিন্দা যে করে সে দণ্ড ভোগ করুক। দক্ষ বৃহস্পতি সব যজ্ঞ করছিলেন—দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞসভায় প্রবেশ করলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ছাড়া আর

সকলে গাত্রোত্থান করে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে পিতা বলে কিছু বলেন নি, আর বিষ্ণু তো যজ্ঞেশ্বর সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে গাত্রোত্থানের কোন প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু মহেশ্বর যে গাত্রোত্থান না করে অবমাননা করলেন, এটি দক্ষ প্রজাপতির কাছে অসহ্য। বিশেষ করে আবার শঙ্করের সঙ্গে প্রজাপতির শ্বশুর-জামাতা সম্পর্ক। দক্ষের বিচার হল—আমাকে দণ্ড দেবে কে ? মহৎনিন্দায় যদি মহান ব্যক্তি রুষ্ট হন তাহলে দণ্ড পেতে হবে। শিব যদি নিন্দায় রুষ্ট হন তাহলে তো দণ্ড পাব। কিন্তু যদি তিনি রুষ্টই হন, তাহলে আর মহৎ হলেন কি করে ? আর যদি রুষ্ট না হন তাহলে আর দণ্ড কেমন করে আমাতে লাগবে ? সতী মা বলেছেন—মহানের নিন্দা করলে মহান রুষ্ট হন না বটে, কিন্তু তাঁর চরণের ধূলি রুষ্ট হয়ে তার দণ্ড বিধান করে—তার সমস্ত তেজ হরণ করে। এটি কিন্তু শোভন। স্মৃতিশাস্ত্র বলেছেন—গুরুনিন্দা শুনলে কর্ণ আচ্ছাদন করবে। সতীমা দেহত্যাগ করেছেন ; বলেছেন, শিব আমাকে দাক্ষায়ণি বলে সম্বোধন করবার আগে আমি দেহত্যাগ করব। কারণ 'মহৎনিন্দুক দক্ষের কাছ থেকে উৎপন্ন তোমার দেহ' এই অর্থেই তিনি দাক্ষায়ণি সম্বোধন করবেন। বিষমাখা অন্ন যদি ভুলক্রমে পেটে যায় তাহলে তা বমন করে ফেলতে হয়। এখানেও তেমনি, সতী মা দেহত্যাগ করলেন—যে দেহ দক্ষের কাছ থেকে উৎপন্ন হয়েছিল। শিব-অনুচর বীরভদ্র দক্ষের মস্তক ছেদন করতে না পেরে মুণ্ড ছিঁড়ে নিল। পরে তাতে ছাগমুণ্ড বসিয়েছিল—এ হল মহৎনিন্দার ফল। দক্ষ প্রজাপতি

তাতে অসন্তুষ্ট হন নি ; বরং বলেছিলেন—জগৎ আমাকে দেখে শিক্ষা করুক যে মহৎনিন্দা করলে তার ফল এমনই হয়। দক্ষ প্রজাপতি হয়ে এবং ইন্দ্র দেবতা হয়েও ভগবানকে চিনতে পারেন নি। তাহলে দেখা যাচ্ছে মনুষ্যজন্মের ওপরের জন্মেও হরি চেনা যায় না। তাই মনুষ্য দেহকেই সর্বাপেক্ষা দুর্লভ বলা হয়েছে, কারণ দেবতারাও ভজন করতে পারেন না। স্বর্গ হল ভোগের ভূমি। সেখানে ভজন চলে না—অতএব এই দেহ নিয়ে বিচার। দুর্লভতা প্রয়োজনবোধে।

মনুষ্যদেহ তো দুর্লভ, কিন্তু ভক্তদর্শন আরও দুর্লভ। হাজার বছর আগে একজন বৈষ্ণব যেখানে ছিলেন, সেখানে নেমে শিব সাষ্টাঙ্গে প্রাণাম করলেন, কারণ বৈষ্ণবমহিমা শিব জানেন। হরি না ভজলে বৈষ্ণব চেনা যায় না। মার্কণ্ডেয় ঋষি ভগবানের কাছে তাঁর মায়ার বিভূতি দেখতে চাইলেন। নারায়ণ বললেন 'তথাস্তু'। মার্কণ্ডেয় ঋষি মহাপ্রলয় দর্শন করলেন। মার্কণ্ডেয় অব্যয় পুরুষে ভক্তিলাভ করেছেন। তাই কিছু নেবেন না। না নিলেও শিব তাঁর কাছে এলেন। উদ্দেশ্য ঋষি কিছু না নিন আমার তো ভক্ত-সঙ্গ হবে। গুরুকৃপাসংযোগ হলে তবে মনুষ্যদেহজননী পুত্রবতী হবে—মুক্তি সন্তানকে প্রসব করবে।

মহারাজ নিমি পরমভাগবত যোগীন্দ্রগণকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে যথাবিধি পূজা করে আসন গ্রহণ করিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করলেন।

———

প্রথম প্রশ্ন

নবযোগীন্দ্রের প্রতি বিদেহরাজের যথাক্রমে নয়টি প্রশ্ন—

ভগবদ্ধর্ম তদ্ভক্ত মায়া তত্তরণানি চ।
ব্রহ্ম কর্মাবতারেহা ভক্তপ্রাপ্য যুগক্রমান্ ॥

প্রথম প্রশ্ন ভাগবতধর্ম কাকে বলে? দ্বিতীয় প্রশ্ন ভক্তের লক্ষণ কি? তৃতীয় প্রশ্ন মায়ার স্বরূপ কি? চতুর্থ প্রশ্ন মায়াকে উত্তীর্ণ হওয়ার উপায় কি? পঞ্চম প্রশ্ন ব্রহ্মের স্বরূপ কি? ষষ্ঠ প্রশ্ন কর্ম কাকে বলে? সপ্তম প্রশ্ন অবতারগণের চেষ্টা কি? অষ্টম প্রশ্ন অভক্তের গতি কি? নবম প্রশ্ন যুগের ক্রমনিরুপণ। নয় জন যোগীন্দ্র যথাক্রমে এই নয়টি প্রশ্নের উত্তর দেন।

এর মধ্যে প্রথম প্রশ্ন—ভাগবতধর্ম কাকে বলে? মহারাজ নিমি প্রশ্ন করছেন:

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্ ॥

—ভা. ১১।২।২৮

জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল বলতে কোনটি বুঝায়? অর্থাৎ কি করলে আর দুঃখের লেশ স্পর্শ করবে না। এ মঙ্গল কোন উপায়ে পাওয়া যায়? মহারাজ নিমির নবযোগীন্দ্রকে নয়টি প্রশ্নের মধ্যে সব পরমার্থ জগৎ, সব সাধনজগৎ বাঁধা হয়ে আছে। সাধুসঙ্গ জীবনে অল্পক্ষণের জন্য ঘটে। কাজেই তার মধ্যেই কাজ সেরে নিতে হবে। সাধুসঙ্গ পরশমণি—লোহায় স্পর্শ

করলেই সোনা পাওয়া যাবে। সাধুসঙ্গ বড় দুর্লভ। নবযোগীন্দ্রের দর্শনকে মহারাজ অলভ্য বলে মনে করেছেন। তাই সম্বোধন করছেন, 'হে অনঘা, অর্থাৎ যাদের দর্শনমাত্রে সকল পাপ নিঃশেষে দূরীভূত হয়ে যায়—নিমিরাজ যোগীন্দ্রগণকে কুশল প্রশ্নও করতে পারেন না—কারণ বিপদ সুলভ যাদের তাদেরই কুশল প্রশ্ন করা চলে, কিন্তু এঁদের কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। কাজেই কুশল প্রশ্ন চলে না। নিধি বলতে কুমুদ, শঙ্খ, পদ্ম প্রভৃতি বুঝায়। যে ক্ষণে সাধুসঙ্গ হয়, সেই ক্ষণটিরই মাহাত্ম্য। দৈবাৎ সাধুদর্শন হয়—জপে তপে হয় না, কৃষ্ণকৃপায় হয়। আচার্য শঙ্কর বলেছেন ঃ

তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে পরিহর চিন্তাং নশ্বর-বিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥

ধনে জনে মন দেওয়াই আমাদের স্বাভাবিক। সেখান থেকে মন আমরা তুলতে পারি না, তত্ত্বও চিন্তা করতে পারি না। যদি নিজে না পারা যায়, তাহলে সাহায্য নিতে হয়। পরোপকারী এবং বলবান হলেন সাধু—সাধুসঙ্গ হলে গৌরগোবিন্দ বলবার সুযোগ হল।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

ভগবানের জন্য আর্তির বীজ হল সাধুসঙ্গ। মহারাজ নিমির আশয় কি? যে ব্যক্তি দারিদ্র্যক্লিষ্ট, ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির, সে যদি সামনে অমৃত পায় তাহলে পান করতে যেমন বিলম্ব

করে না, তেমনি সংসারদারিদ্র্যক্লিষ্ট আমি। অমৃতের মত আপনাদের আগমন হয়েছে—আমার কি সে অমৃত ভোজন করতে দেরী করা উচিত? আপনাদের স্থিতি তো গোদোহন কাল পর্যন্ত। তাই চরণ যে বেশীক্ষণ পাব সে নিশ্চয়তা নেই, তাই আর বিলম্ব করতে পারি না।

আত্যন্তিক মঙ্গল কি? যে মঙ্গল এলে ভয় আর স্পর্শ করবে না। এ প্রশ্ন শুধু নিমিরাজের নয়, এ প্রশ্ন সর্বসাধারণের। এই আত্যন্তিক মঙ্গল কেমন করে লাভ হবে? ভাগবতধর্ম কাকে বলে? যে ধর্মের ফলে ভগবান হরি সন্তুষ্ট হয়ে নিজেকে পর্যন্ত দান করেন। আত্যন্তিক ক্ষেম এবং ভাগবতধর্ম—এ দুটি পৃথক প্রশ্নের মত শোনাচ্ছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুটি প্রশ্ন নয়—একই প্রশ্ন—কেবল প্রকারভেদ মাত্র। ভাগবতধর্মই আত্যন্তিক ক্ষেম, যা থাকলে ভয় মোটেই স্পর্শ করে না। মঙ্গল বলতে তাকেই বুঝায় যাতে ভয়ের নিবৃত্তি হয়। এ জগতে সুখের বস্তু মাত্রই কাঁটা-ফোটান আছে। পুত্র বিত্ত সবই পরের; তাকে আপন করে আমরা কষ্ট পাই। পুত্র তো চলেই যায়, কিন্তু সে আঘাত দিয়ে যায়। চিত্তের সে ঘা আর শুখায় না। ভয় সর্বত্রই এক প্রকার। ভয়ের কোন জাতি নেই। ভয় মানে হারিয়ে যাওয়া। আত্যন্তিক মঙ্গল কখনও হারায় না। ভগবান গীতায় বলেছেন:

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ গী. ২।৪০

ভক্তিধর্ম আরম্ভ করলেও তার ফল আছে, নাশ হবে না—

ভক্তিধর্মে ত্রুটি নেই। অন্য ধর্ম কিন্তু হাজার নিখুঁত করে করলেও যদি সমাপ্ত না হয় তাহলে কোন ফল নেই, কিন্তু হরি একবার বললেও তার ফল আছে। অজামিল তার সাক্ষী। ভগবদ্ভজনধর্মই আত্যন্তিক মঙ্গল। কর্ম, যোগ, জ্ঞান—সবটাতেই ভয় আছে, বিঘ্ন আছে—পথের পরিচয় জেনে তবে লোকে যেমন পথে অগ্রসর হয়। যদি শোনে পথ ভাল কিন্তু পথে কয়েকটি খুন হয়েছে, তবে আর সে পথে কেউ অগ্রসর হতে চায় না। তেমনি কর্ম, যোগ, জ্ঞান—এসব পথে প্রায়ই খুন হয়। সর্বজ্ঞ কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে তার গুপ্ত পিতৃধন পাওয়ার উপায় বলেছিলেন। মাটির নীচে ধনের কলসী পোঁতা আছে ; কিন্তু দক্ষিণ দিকে মাটি খুঁড়লে ধনের কলসী তো পাবেই না, ভীমরুল দংশনের জ্বালা পাবে—অর্থাৎ কর্মমার্গ অবলম্বনে নানারকম যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। কখনও স্বর্গে কখনও নরকে, কর্মফলে নানা গতি লাভ হবে এবং সেটি হবে দুঃখের আকর।

নানা যোনি সদা ফিরে কদর্য ভক্ষণ করে
তার জন্ম অধঃপাতে যায়।

পশ্চিমে যদি মাটি খোঁড় তাহলে এক যক্ষের হাতে পড়বে। সে বিঘ্ন করবে, ধন হাতে মিলবে না। এ যক্ষস্থানীয় হল যোগ-মার্গ, অর্থাৎ যক্ষ যেমন ধন রক্ষা করে মাত্র। নিজেও ভোগ করতে পারে না, অন্যকেও ভোগ করতে দেয় না। তেমনি যোগমার্গে পরমাত্মারূপে ভগবানকে যোগিগণ অনুভব করেন মাত্র কিন্তু নিজে শ্রীভগবানের মাধুর্য অনুভব করতে পারেন না এবং অন্যকেও করতে দেন না। আর উত্তরে মাটি খুঁড়লে

'আছে কৃষ্ণ অজগরে। ধন নাহি পাবে খুদিতে গিলিবে সবারে।' কৃষ্ণ-অজগর স্থানীয় হল জ্ঞানমার্গ। যাকে কৃষ্ণ-অজগরে গ্রাস করছে তার আর বেঁচে থেকে ভোগসুখ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই রকম জ্ঞানমার্গ যাকে গ্রাস করেছে তার পক্ষে আর ভক্তি-সুখ আস্বাদনের সম্ভাবনা নেই। তাই উপায় হল—

পূর্বদিকে তাতে মাটি অল্প খুদিতে।
ধনের জাড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥

সর্বজ্ঞের বাক্যের তাৎপর্য হল : দক্ষিণ দিকে সূর্যের গমনে তেজ মন্দ হয় এবং শীত উৎপাদন করে লোকের জড়তা এনে দেয়। এইরকম বিশ্বাসরূপ সূর্য দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ কর্মে গেলে তার তেজ মন্দ হয় অর্থাৎ তার থেকে আর অগ্রসর হতে পারে না এবং কর্ম-বিশ্বাসী ব্যক্তি কর্ম-উপদেশরূপে শীত উৎপাদন করে লোকের জড়তা উৎপাদন করে।

পশ্চিমে সূর্যের অস্তগমন কালে কেবল আলো মাত্র থাকে। কিন্তু সূর্যের তেজ কিছু থাকে না। এইরূপ বিশ্বাসরূপ সূর্য যোগরূপ পশ্চিম দিকে অস্তমিত হলে ক্রমে তেজ বৃদ্ধি না হয়ে হ্রাস হয়।

উত্তরে সুমেরু পর্বতে সূর্য আচ্ছন্ন হলে ঘোর অন্ধকার সমস্ত জগৎ গ্রাস করে। এইরকম জ্ঞানমার্গরূপ উত্তর দিগ্‌বর্তী বিশ্বাসরূপ সূর্য জগৎ অন্ধকারে আবৃত করে।

পূর্বদিক হতে যখন প্রভাতে সূর্যের উদয় হয়, তখন উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার নাশ করে এবং ক্রমে ক্রমে সূর্যের তেজের বৃদ্ধি হয় – সর্ব জগৎকে প্রকাশ করে। এইরূপ বিশ্বাসসূর্য

ভক্তিমার্গরূপ পূর্বদিকে উদিত হয়েই জগতের অন্ধকার নাশ করতে থাকেন এবং ক্রমে যত অগ্রসর হন, ততই তেজের বৃদ্ধি হয় এবং সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করেন। কিন্তু সূর্য উদয়ে পেচক প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণী যেমন অন্ধ হয়, এইরূপ ভক্তি-বিশ্বাস সূর্যের উদয়ে কতকগুলি বহির্মুখ জীব অন্ধ হয়। এইটিই দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর পূর্বদিকে কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তির স্থান নির্ণয় করে প্রতিপন্ন করলেন। অতএব,—

ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥
অতএব ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।
অভিধেয় বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, বিংশ পরিচ্ছেদ

অণিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধির কবলে পড়ে অথবা 'সোঽহং', 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এই বুদ্ধিতে সাধক কৃষ্ণপাদপদ্ম হতে বহু দূরে সরে যায়। এইটিই তার মৃত্যু। গৌরগোবিন্দ-পাদপদ্মভজনই একমাত্র নির্ভয়। মহারাজ নিমির প্রশ্ন—আত্যন্তিক মঙ্গল কাকে বলে? প্রথম যোগীন্দ্র কবি এর উত্তর দিলেন—প্রশ্ন হতে পারে কবি জবাব দিলেন কেন? প্রথম প্রশ্নের জবাব প্রথম যোগীন্দ্র দেবেন—এইটিই বিধেয়; কিন্তু দীপিকাদীপনকার এর একটি বিশেষ তাৎপর্য দেখিয়েছেন। 'কবি' শব্দের অর্থ যাঁর সূক্ষ্ম নিপুণ দৃষ্টি—'কবির্নিপুণদৃক্ বিদ্বান্'। এঁর কখনও ভ্রান্তি হতে পারে না—গৌরগোবিন্দপাদপদ্ম ছেড়ে আমাদের যে প্রতিষ্ঠার লোভ এইটিই আমাদের বুদ্ধির দোষ।

কাণাকড়ি দিয়ে যদি পরশমণি রোজগার করে আনা যায় তাহলে বাহাদুরি। আবার সেই পরশমণি যদি বুদ্ধিমানের কাছ থেকে আনতে পারা যায়, তাহলে আরও বাহাদুরি। আমাদের দেহ কিন্তু কাণাকড়ির চেয়েও নিকৃষ্ট, কারণ কাণাকড়ি তো পচে না। এ দেহ পচে যায়—অন্তর্যামী পরমাত্মা ছাড়া দেহের কোন সত্তাই নেই। আমাদের দেহ যখন আর কারো সেবায় লাগে না, একেবারে অপটু হয়ে যায়—তখন আমরা বলি 'গোবিন্দ, আমি তোমার'। ভগবান বুদ্ধিমান—কাণাকড়ির মত দেহ দিয়ে যদি সেই বুদ্ধিমান ভগবানের কাছ থেকে চিন্তামণির চিন্তামণি ভগবানকে আদায় করে নিতে পারে তারই বুদ্ধির দাম। ভয়গ্রস্ত জীবকে নির্ভয় করার নামই প্রকৃত বিদ্যাবত্তা। সুতরাং ভাগবত-ধর্ম উপদেশদানই প্রকৃত বিদ্যাবত্তার পরিচয়। কবি বিদ্বান, তাই তিনিই সেই বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়ে ভাগবতধর্মের উপদেশ দান করছেন, যাতে ভয়কাতর জীব চিরতরে নির্ভয় হতে পারে। কবি উত্তর দিলেন :

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাৎ বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ততে ভীঃ॥

—ভা. ১১।২।৩৩

এটি কবির মন্তব্য শ্লোক। তাই এর দাম খুব বেশী। কৃষ্ণপাদপদ্ম উপাসনাই একমাত্র নির্ভয়। গোবিন্দচরণের গন্ধ যেখানে সেখানে মৃত্যু যায় না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কে এই উপাসনা করবে? হরিভজনের অধিকারী কে? প্রেমানন্দদাসজী বলেছেন :

শ্রীকৃষ্ণভজনে সবে অধিকারী কুলের গরব নাই।
প্রেমানন্দ কহে যে করে গরব নিতাই মূরখ ভাই॥

জীবনে যে হরি বলতে পারে সে-ই উত্তম। বশিষ্ঠদেব ভগবান রামচন্দ্রকে বলেছেন, মাঘ মাসে প্রয়াগে গঙ্গাস্নানে যেমন মানুষমাত্রেরই অধিকার, তেমনি হরিভজনে সকলেরই অধিকার। যোগীন্দ্র কিন্তু সে কথা শুনলেন না। তিনি অধিকারী বিচার করেছেন। প্রেমানন্দদাস বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে কুলের গরব নেই। বিদুর দাসীপুত্র, তাঁর তো কুলের গরব ছিল না। কিন্তু তিনি তো ভগবানকে পেয়েছিলেন। বিদুরপত্নীর কাছে ভগবান ক্ষুধার্ত হয়ে চেয়ে খেয়েছেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে—শ্রুতি তো ভগবানকে অপিপাস অজিঘৎস বলেছেন। তাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছু নেই। তাহলে আবার তাঁর ক্ষুধা হয় কেমন করে? ভগবান গীতাবাক্যে বলেছেন:

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরে ব চ। গীতা ।২৪

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় গীতাভাষ্যে সমাধান করেছেন। ভগবানের ক্ষুধা আমাদের ক্ষুধার মত নয়। আমাদের ক্ষুধা প্রাকৃত প্রাণের বিকার। প্রাণবায়ু থেকে আমাদের ক্ষুধা পিপাসা ওঠে। তাই না খেলে আমাদের প্রাণ থাকে না। কিন্তু গোবিন্দের ক্ষুধা প্রাণবায়ুর বিকার নয়। তাঁর প্রাণ চিন্ময়, তাই না খেলে গোবিন্দের মৃত্যু হয় না, কারণ তাঁর মৃত্যু নেই। জীব গোবিন্দের নাম করে মৃত্যু অতিক্রম করে, আর সেই গোবিন্দের মৃত্যু হবে কেমন করে? চিদ্বস্তুর ক্ষুধা, পিপাসা হয় না। তাই না খেলে মরে না; কিন্তু খেতে পারে না তা

নয়। খেতে পারে, খাবার সামর্থ্য আছে। এ ক্ষুধা প্রেমের ক্ষুধা—আব্দার করে খাওয়ালে খায়। ভগবান স্বীকার করেছেন ঃ

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ। গীতা ৯।২৬

ভগবানের ক্ষুধা ক্ষুধা নয়, তাঁর ইচ্ছাই তাঁর ক্ষুধা। যখনই যার কাছে খেতে ইচ্ছা করবেন তখনই খেতে পারেন। বিতুর-পত্নীর বাৎসল্য প্রেমকে লক্ষ্য করে ভগবানের খাবার ইচ্ছা হয়েছে। ভক্তিকে বুঝতে পারা যায় না। বিতুরপত্নী গোবিন্দ খুঁজতে বাইরে যান নি। তিনি তাঁর প্রেম নিয়ে, ভক্তি নিয়ে কুটীরে বসে ছিলেন—গোবিন্দ খুঁজে খুঁজে আপনি এসেছেন। শ্রীপাদ রামদাসবাবাজী মহারাজ অনেক উঁচু স্তরেব কথা বলেছেন। গোবিন্দ লম্পট পুরুষ, রূপ ও যৌবনেরই দাম দেয়, অন্য কিছুর দাম দেয় না। তাই ভাবভূষণে ভজনযৌবনে সেজে ঘরে বসে থাকলে লম্পট গোবিন্দ আপনি আসবে —ডাকতে হবে না। বিতুরপত্নী প্রেমে বিহ্বল হয়ে গোবিন্দকে কলার খোসা খাইয়েছেন। ভগবানেরও ভক্তদর্শনে আকুল চিত্ত—তাঁরও ভুল হয়েছে—ভক্ত ভগবান—তুজনেরই ভুল। তাহলে মহাজনের মতে ইন্দ্রিয় থাকলেই হরিভজন করা যায়। যোগীন্দ্র কিন্তু এখানে অধিকার নির্বাচন করলেন। যাঁরা জানেন যে এ বিষয়বিষ ত্যাজ্য, ত্যাগ করবার ইচ্ছাও তাঁদের আছে, অথচ ত্যাগ করতে পারছেন না, তারাই হরিভজনের অধিকারী।

যোগীন্দ্রের মন্তব্যবাক্য থেকে জানা যাচ্ছে—ভয়নিবৃত্তির

উপায়, একমাত্র অচ্যুতের পাদাম্বুজ উপাসনা। আত্যন্তিক ক্ষেম, অর্থাৎ চরম মঙ্গল—যে মঙ্গলে ভয়নিবৃত্তি হয়। গোবিন্দ মহাভয়ের ভয়দাতা—ভয় চিকিৎসকের খাতির রাখে না। অর্থাভাব, পুত্রহারানো, ব্যাধি, লাঞ্ছনা, অপমান কত রকমের ভয় আমাদের ঘিরে রেখেছে। মৃত্যুই হল প্রধান ভয়, অন্যান্য ভয় হল খুচরো ভয়। জগতে সর্বত্র তো ভয়। এখানে আমরা অভয়কে পাব কেমন করে? কাঁটার শয্যায় শুয়ে যেমন তুলোর গদির সুখ আশা করা যায় না, এ জগৎ হল কাঁটার রাজ্য। এখানে এই ভয়ের রাজ্যে, মায়ার রাজ্য, আমরা অভয় চাইছি। কেমন করে তা সম্ভব হতে পারে? অভয় চাওয়া আমাদের জন্মগত অধিকার। কারণ আমরা অভয়ের অংশ। এই অভয় লাভ করার একটাই উপায়। ভগবানের সঙ্গে দাস-প্রভু সম্বন্ধ করতে পারলেই, ভয় পালাবে, অভয় আসবে। বলবানের আশ্রয় নিয়েছে জানতে পারলেই দুর্বল সরে যায়। মায়ার হাত হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার একটাই উপায়। ভগবান বলেছেন, 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।' মায়া জ্ঞানের খাতির রাখে না, খাতির রাখে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতির। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মশাই বলেছেন ঃ

গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।

একান্ত বিপদে পড়লে মানুষ যেমন শরণাগত হয়, তেমনি করে শরণাগত হতে হবে। করাগারে যারা থাকে তারা মনে করে বেশ আছি। আমরাও মহামায়ার কারাগারে থেকে ভাবি এ

কারাগারে আমরা বেশ আছি। আমাদের আত্যন্তিক উপায় নেওয়া হয় নি। শ্রীপাদ রামদাসবাবাজী মহারাজ বলেছেন—'গৌরগোবিন্দ তো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে গো, বসতে জয়গা পায় না। আমাদের কামনার ডাক ওতে আসে আসে ফিরে যায়, বসবার আসন পায় না। গৌরগোবিন্দ তো যে কোন আসনে বসেন না—বাসনানির্মুক্ত হৃদয়-আসনেই তাঁরা বসেন।' কবি যোগীন্দ্র তাই বলেলন কৃষ্ণপাদপদ্মভজনই অভয় অবস্থা পাওয়ার একমাত্র উপায়।

দেহেতে আত্মবুদ্ধি এবং দৈহিক মমত্ববুদ্ধি—'আমি' 'আমার' —এই আসক্তি আমাদের মজিয়ে রেখেছে। আমরা সুস্থ ও সুন্দর থাকতে চাই—যাতে করে আরও ভাল করে বিষয় ভোগ করতে পারি। ভজনের জন্য যদি এটি চাইতাম তাহলে ভালই হত। আসক্তি যে নরকে নিয়ে যায়, এ বোধ যাদের পাকা হয়ে গেছে, ত্যাগ করবার জন্য চেষ্টাও করছে কিন্তু পেরে উঠছে না, স্বভাবের দুর্বলতায় ত্যাগ করতে পারছে না, এরা হল উদ্বিগ্নবুদ্ধি। ভগবান উদ্ধবজীকে বলেছেন,—

ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।

—ভা. ১১।২০।৮

যারা অতিনির্বিণ্ণ অর্থাৎ বৈরাগ্য করেছে, তারা ভক্তিযোগের অধিকারী নয়। আর অত্যন্ত বিষয়াসক্ত যে সেও ভক্তিযোগের অধিকারী নয়। বৈরাগ্যবানের বৈরাগ্য করেছি বলে অভিমান থাকে। তাই ভক্তিমহারাণী তাকে কৃপা করেন না। নিজেকে দীন বলে ভাবতে না পারলে ভক্তিমহারাণীর কৃপা মেলে না।

ত্যাগ করতে পারছে না, অথচ ত্যাগ করা উচিত, সেজন্য নিজেকে অসহায় ভাবছে। তারই ভক্তিযোগে অধিকার। যার এক লক্ষ টাকার এক্ষুনি দরকার, অথচ মাত্র দশহাজার টাকা আছে, তার কাছে লক্ষ টাকার প্রয়োজন যেমন দশহাজার টাকার কিছু দাম আছে বলে মনেই করতে দেয় না তেমনি সম্পদ্, রূপ, বিদ্যা পাণ্ডিত্য যা কিছুই থাকে না কেন, তা দিয়ে যদি হরি না মেলে তাহলে তার কোন দামই নেই। একজন লোককে ঘরে বন্ধ করে বাইরে থেকে দরজায় তালা দেওয়া হয়েছে। ঘরে বন্দীদশায় ঘরের মেঝেতে দেখা গেল একটি কালসাপ বেরিয়ে তাকে তাড়া করেছে—এই অবস্থায় সেই লোকটির যে উদ্বেগ, আসক্তির ঘরে আমরা চাবিবন্ধ আছি এদিকে মৃত্যুরূপ কালসাপের তাড়া—এ উদ্বেগ যার জীবনে হয়েছে সেই হরিভজনে মুখ্য অধিকারী। হরিভজনে সবে অধিকারী আগে বলা হল, তবে আবার মুখ্য অধিকারী বিচার করা হল কেন? কোন বিদ্যালয়ে সকল রকম জাতির ছাত্রই ভর্তির অধিকার পায়, তার মধ্যে যদি কোন ব্রাহ্মণের ছেলে ছাত্রহিসাবে ভর্তি হতে আসে তাহলে কি সে ভাল অধিকারী বলে বিবেচিত হবে না? শ্রীবলদেব প্রমেয়রত্নাবলীতে বিচার করেছেন—'জ্ঞানবৈরাগ্যপূর্বা চেৎ ফলং সদ্যঃ প্রকাশয়েৎ'। জ্ঞান বৈরাগ্য নিয়ে যদি কেউ কৃষ্ণভজন করে সে হবে উত্তম অধিকারী, তার ফল তাড়াতাড়ি পাবে। ভক্তিকে সুসমিদ্ধ অগ্নি বলা হয়েছে। জলে ভেজান কাঠে আগুন তাড়াতাড়ি জ্বলে না। রোদে শুকাতে পারলে সে কাঠে তাড়াতাড়ি আগুন ধরে। তেমনি দুর্বাসনা জলে যদি হৃদয়

সিক্ত থাকে, তাতে ভক্তি-অগ্নি তাড়াতাড়ি জ্বলবে না। ধোঁয়াকে ধুইয়ে ধুইয়ে বিষয়রস মরিয়ে তবে তাতে অগ্নি জ্বলবে। বিষয়-রসলালসায় সিক্ত হলে সে হৃদয়ে ভক্তি কাজ করতে দেরী হবে। বৈরাগ্য-অগ্নিতে শুকালে তাড়াতাড়ি ভক্তি-অগ্নি জ্বলবে। আমরা ভক্তি যাজন করি কিন্তু কাজ পাই না বলে আক্ষেপ করি। কেমন করে কাজ হবে? ইচ্ছামত তেলেভাজা খেলে যেমন হজমিগুলির ক্রিয়া হয় না এখানেও তেমনি শ্রীগুরুদেবের দেওয়া মন্ত্র হল হজমিগুলি, আর প্রাকৃত ভোগসুখ হল তেলেভাজার মত কুপথ্য। ভজন বুঝতে হলে পাকস্থলী হালকা করতে হবে। মায়াব্যাধির ঔষধ হল কৃষ্ণবলা। 'জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যম্'—নিদানে বলা আছে। খেলে ফল পেতে দেরী হবে—উপবাস দিলে ফল তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে। এখানে উপবাস হল মায়িক ভোগ ত্যাগ। এই ত্যাগ যে যে পারিমাণে পারে সে তত তাড়াতাড়ি ফল পায়। আমরা যে ফল পাই না তার কারণ হল, আমরা উপবাস দিতে পারি না, অর্থাৎ মায়িক বস্তু ত্যাগ করতে পারি না। উদ্ধবজী ভগবানকে বলেছেন, তুমি তো পাকা চিকিৎসকের মত কলিজীবকে চিকিৎসার বিধান দিলে,—সব বিষয়বাসনা ত্যাগ করে আমাকে ভজ। কিন্তু কলিজীব তো তা পারবে না। জীব তোমার মত চিকৎসকের কাছে যাবে না। অর্জুনকে তো তুমি বলেছ,—'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—কিন্তু কেউ তা শোনে নি। সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য পর্যন্ত শুনেছে, কিন্তু পরের অংশটি আর শোনে নি। উদ্ধব জিজ্ঞাসা করছেন, তুমি যে চিকিৎসার উপায় বললে তার বিকল্প নেই?

ভগবান বললেন, বিকল্প আমি তো কিছু জানি না। তবে তুমি তো শাস্ত্রবিদ্—পরামর্শদাতা, মন্ত্রী, তুমি কোন উপায় জান তো বল, ঠিক হলে আমি সম্মতি দেব। উদ্ধব বললেন জীব তো বিষয় ভোগ না করে পারবে না। তা সেই বিষয় যদি তোমার অধরামৃত করে গ্রহণ করে তাহলে হবে না? ভগবান বললেন, হ্যাঁ, তা হবে—এর দ্বারা মায়া জয় হবে, কিন্তু এরকম বিষয়ভোগে যেন কপটতা না থাকে। বিষয়ভোগ করবার নিজের ইচ্ছা, তাই ভগবানের চরণে স্পর্শ করিয়ে নিলাম, এরকম করলে হবে না। ভগবানকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। নিজের কাছেই নিজেকে বঞ্চক হতে হয়। একমাত্র প্রসাদের দ্বারা জীবনধারণ করলে তবে তাকে ত্যাগী বলা হবে। যোগীন্দ্র বলছেন, কৃষ্ণপাদপদ্ম উপাসনা করলে বিশ্বাত্মনা অর্থাৎ সাকল্যে ভয় নিবৃত্তি হবে। শ্রীজীবপাদ বলেছেন—বিশ্বাত্মনা শব্দটি ব্যাপক। গোস্বামিপাদগণের ব্যাখ্যায় যোগীন্দ্রের কথা বুঝা যাবে। তা না হলে 'ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধি নাশ'। গৌরগণের কথা বুঝতে হবে। গৌরগণ হলেন ভাগবতদর্শনের চশমা। এই চশমা ধারণ করলে তবে আমাদের বুদ্ধি শুকবাক্য নেবে। 'বিশ্বাত্মনা' অর্থাৎ সাধন অবস্থাতেও ভয় নিবৃত্তি হয়। অন্য সাধনে সাধনকালে ভয়নিবৃত্তি নেই। সিদ্ধি হলে ভয়নিবৃত্তির ব্যবস্থা। মহাজন বলেন, জ্ঞান কর্ম যোগ—এঁরা পুরুষ জাতি, তাই হিসাব রাখেন। সাধক সাধন করে যাবে, সিদ্ধিকালে ফল পাবে, কিন্তু ভক্তিমহারাণী স্ত্রীজাতি। তিনি অত হিসাব রাখতে

পারেন না—তাই নগদ নগদ দেন। আজই গৌরগোবিন্দ বললে আজই তার ফল পাওয়া যাবে।

ভাগবতধর্মের লক্ষণ করেছেন প্রথম যোগীন্দ্র কবি— ভগবান নিজে যে ধর্মের কথা বলেছেন, অন্য কারো দ্বারা বলান নি, তার নাম ভাগবতধর্ম আর নিজেকে পাওয়ার জন্য যে ধর্ম বলেছেন, তার নাম ভাগবতধর্ম। জীব অনাদি কৃষ্ণ-বিমুখ। তাই ভাগবতধর্ম কোনদিনই নেবে না, তাই ভগবান তার উপায় নিজে চিন্তা করেছেন। মনু প্রভৃতি ঋষির মুখে বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে ভগবান বলিয়েছেন, কিন্তু মনু প্রভৃতি বক্তাও স্বাধীন নন। তাঁরাও ভগবানের আদেশে বক্তা। কিন্তু সদ্ধর্ম অত্যন্ত গোপ্য বলে ভগবান নিজে বলেছেন, যেমন কোন কৃতি পুরুষ অন্ন ব্যঞ্জন অন্য লোক দিয়ে পরিবেশন করান, কিন্তু পরমান্ন মিষ্টান্ন নিজে পরিবেশন করেন। কারণ এটি একটু হিসেব করে দিতে হবে। ভাগবত ধর্ম ভগবান নিজেই প্রথমে বলেছেন। কালের প্রবাহে বেদশাস্ত্র লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ভাগবান মীনরূপে সে বেদ উদ্ধার করেন। যে বাণীতে মদাত্মকধর্ম আছে, আর্থাৎ ভগবান যেখানে আত্মা বা স্বরূপ হয়ে আছেন—এই বাণী লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ভগবানই তাকে উদ্ধার করেন। এই মদাত্মক বাণী বলতে ভক্তিধর্মকেই বুঝায়। জ্ঞান যোগ, কর্ম, কোনটির সঙ্গেই ভগবানের সম্পর্ক নেই, শ্রবণকীর্তনময়ী ভক্তির সবটাই ভগবান। প্রতিটি অঙ্গের সঙ্গে ভগবান ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছেন। তাহলে ভাগবতধর্মের লক্ষণ হল দুটি : (১) ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য বলেছেন, (২) ভগবান নিজে বলেছেন। ভক্তিধর্ম ছাড়া ভগবৎপ্রাপ্তি হয়

না, ভক্তি দ্বারা ভগবান যে ভাবে প্রকাশিত হন এমন আর কোন সাধনে হয় না। ভগবান উদ্ধবজীর কাছে বলেছেন—'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ'। গীতাতেও ভগবান বলেছেন ঃ

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। গী. ১৮।৫৫

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যাঁরা ভাগবতধর্ম অবলম্বন করেন—তাঁরা কি ভাবে ভগবান পাবেন? যোগীন্দ্র বললেন, অনায়াসে পাবেন। কে পাবে? অবিদ্বান যে সেও পাবে। অবিদ্বানেরই হয়, বিদ্বানের হয় না, বলা হয়েছে ঃ

কুমতি তার্কিকগণ অধম পড়ুয়াজন—
তারা জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ।

পণ্ডিতের ভক্তি হয় না কারণ, তাঁরা নিজেদের পাণ্ডিত্যের অভিমান ত্যাগ করে বৈষ্ণবের চরণতলে বিকাতে পারেন না। শাস্ত্র বলেছেন—'ভক্তকৃপানুগামিনী ভগবৎকৃপা'। দেবতাদের ভোজন যেমন ঘৃতগন্ধি হতেই হবে, তেমনি দেবতার দেবতা শ্রীগোবিন্দের কাছে এই দেহনৈবেদ্য উৎসর্গ করতে হলে তাতে ভক্তকৃপারূপ ঘৃতগন্ধ থাকতেই হবে। এই ভক্তকৃপাগন্ধ দেহে না থাকলে গোবিন্দ তা গ্রহণ করেন না। মায়া নানা পদমর্যাদা দিয়ে আমাদের আটকে রেখেছে। অভিমানের বেড়া ভেঙ্গে সাধুর চরণে লুটাতে পারলে তবে কৃপা লাভ হবে। নিরন্তর অনুশীলন করতে হবে। গোবিন্দ জীবকে দেখে ভাবেন মায়ার দেওয়া উপহারে ভুলে আছিস্? ধন আছে তার সৎ ব্যয় কর, সাধুসেবা কর। বিদ্যা আছে—সে বিদ্যা বিনয়ভূষণে ভূষিত কর, 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্'। জীব যতক্ষণ অভাবগ্রস্ত না হবে

ততক্ষণ কৃপা প্রার্থনা করবে না। বিদ্যা, ধন, রূপ, যৌবন, আভিজাত্য যত কিছুর অভিমানই থাকে না কেন, সব অভিমান এপার পর্যন্ত, ওপারে কোন অভিমান যাবে না। নৌকায় উঠবার আগে পাথেয় সঞ্চয় করে নিতে হবে, নৌকায় উঠে পাথেয় খুঁজলে হবে না। কর্মময় নদীকেই ভবসাগর বা বৈতরণী বলা হয়েছে। সাগরে যেমন নিরন্তর হাঙর কুমীরের দংশন, তেমনি জীবের নিত্যবাসনার দংশন। ভাগবতধর্মের এই দুটি লক্ষণে স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ বিচার করা হয়েছে। স্বরূপলক্ষণ অর্থাৎ যার পরিবর্তন হয় না, আর তটস্থলক্ষণ হল যার পরিবর্তন হয়। ভাগবতধর্মের যে দুটি লক্ষণ করা হয়েছে তাতে ভগবান বলেছেন—এটি তটস্থ লক্ষণ। কারণ ভগবান ছাড়া আরও অনেকে বলেছেন, যেমন প্রহ্লাদ বলেছেন, আর ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য 'ভাগবতধর্ম—এই যে লক্ষণ করা হয়েছে, এটি স্বরূপ-লক্ষণ অর্থাৎ এটি অব্যভিচারী লক্ষণ, আর্থাৎ এর কখনও ব্যতিক্রম হয় না। ভাগবতধর্মকে আশ্রয় করলে ভগবৎপ্রাপ্তির কখনও ব্যতিক্রম হয় না। তাই এটি স্বরূপলক্ষণ।

ভাগবতধর্মের মহিমাপ্রসঙ্গে যোগীন্দ্র বলেছেন—যিনি বিশ্বাস করে এই ভক্তিধর্ম যাজন করেন তিনি কখনও গর্বিত হন না। কারণ গর্বস্থানে ভক্তি থাকেন না—দৈন্য-আসনে ভক্তির স্থান। মহাজন বলেছেন—'যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।' কর্ম, যোগ, জ্ঞান, গর্বেই নষ্ট হয়; তাই ভক্তি দেখেন আমারও যদি গর্ব থাকে তাহলে আমিও বিনাশ পাব। তাই ভক্তিতে আর গর্ব থাকে না। ভগবান কখনও কারও গর্ব সহ্য করেন

না। গোপীরা যে কৃষ্ণের প্রিয়তমা, সেই গোপবালাদের গর্বও কৃষ্ণ সহ্য করতে পারেন নি। গোপীদের যে গর্ব সে হল কৃষ্ণ পাওয়ার গর্ব। কিন্তু কৃষ্ণ পেলেও গর্ব করা চলবে না। গর্ব হলেই কৃষ্ণ সরে থাকেন। এই গর্বরোগ সারানোর জন্য কৃষ্ণ চিকিৎসা করলেন। মূর্খের গর্বই হয়। ভাগবতধর্ম যিনি যাজন করেন তাঁর অসতর্কতা বিঘ্ন হয় না। গৃহস্থ জেগে থাকলে যেমন চোর ঢুকতে পারে না, তেমনি সাধকও যদি সাধনরাত্রিতে জেগে থাকেন, তাহলে অপরাধ চোর ঢুকতে পারে না। কর্মী, যোগী, জ্ঞানী সকলেই বিঘ্নের দ্বারা অভিভূত হয়। তপস্বী বৈরাগীও বিঘ্নিত হয়। কিন্তু ভক্তিধর্মে বিঘ্ন প্রবেশের স্থান নেই। কর্মমার্গে স্বরবৈগুণ্য দেখা দিলেই বিঘ্ন, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করতে গিয়ে যদি স্বরে একটু উচ্চারণে ত্রুটি ঘটে, তাহলে অনর্থের সৃষ্টি হয়। যেমন বৃত্রাসুরের পিতার মন্ত্র উচ্চারণে ত্রুটি থাকায় বৃত্রাসুর নিজেই নিহত হলেন। যোগের পথে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি পথের দূরত্ব ঘটায়, অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছুতে দেরী হয়ে যায়। জ্ঞানমার্গে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে মায়িক বলে মনে করে—তাতে অপরাধ হয়। এইটিই বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তপস্বীরও গর্ব আছে —দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষি গর্বিত। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্ম দগ্ধ হয়ে গেলেও অপরাধরূপ সুবৃষ্টিপাতের ফলে আবার কর্মের (পাপের) অঙ্কুর জন্মায়। যেমন তক্ষকের দংশনে নধর বটবৃক্ষ ভস্মীভূত হলেও ধন্বন্তরী দ্বারা সেটি পুনরায় সঞ্জীবিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন—'প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর,

বিষ্ণু নিন্দা আর নাহি ইহার উপর'। বৈরাগ্যেও বিঘ্ন আছে। বৈরাগ্য করে প্রসাদ গ্রহণ করে না, অর্থাৎ প্রসাদে চিন্ময় বুদ্ধি করে না—ত্যাগ কিসের জন্য ? কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমলাভের জন্য কিন্তু তা আর তাদের হয়ে ওঠে না। শেষ পর্যন্ত প্রেম অনুরাগও শোষণ হয়ে যায় বৈরাগ্যং রসশোষণম্। কায়মনোবাক্যে দীন হতে হবে, মুখেও দীনতা রাখতে হবে। মুখে দীনতা করতে করতে অন্তরে দীনতা আসবে—ওপরে মলম লাগালে যেমন নীচে হাড়ের ব্যথা ভাল হয়। হরিভজনে বিঘ্ন বলে কিছু নেই। ভক্তিরজ্জু দিয়ে ভক্তগণ ভগবানের চরণের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে রাখে—তাই তারা কখনও ভ্রষ্ট হয় না।

ভক্তিযাজনে সবে অধিকারী—তাই বলে ভক্তি সস্তা নয়। হরিভক্তি মুক্তজনেরও প্রার্থিত বস্তু। বাক্য আছে ঃ

'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।'

ভগবদ্দর্শনের পর গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে যায়। বেদাদি শাস্ত্রে ভগবান বিধিনিষেধের জাল দিয়ে রেখেছেন। এইজন্য বেদকে ঈশতন্ত্রী বলা হয়। জীবমৎস্যকে ধরবে বলে। জাল থেকে মাছ পালতে না পারে, তার ব্যবস্থা করা হয়। এখানে শাস্ত্রের বিধিনিষেধে যাতে জীব আটকে পড়ে তার ব্যবস্থা করা হয়। বিষয়প্রীতির নামই গ্রন্থি, এরই নাম অহংকারগ্রন্থি, এরই নাম হৃদয়গ্রন্থি। ভক্তি যে অহৈতুকী—এটি যার প্রয়োজন বোধ নেই সে বুঝতে পারে না ; যার প্রয়োজন আছে সে বোঝে। হরিনামের কাছে কিছু চাইতে নেই। হরিনাম প্রেমরত্ন দিতে পারে। কিন্তু আমরা তো চাইতে জানি না। আমরা সেই

ভূরিদাতার কাছে বিচুলি চেয়ে বসব। জীবের স্বভাব দ্বিতীয় বস্তুকে নিয়ে আনন্দ করা। পুত্র, অর্থ, খাদ্য, পানীয়, শয্যা, আত্মীয়, মর্যাদা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বিতীয় বস্তু না হলে আমাদের আনন্দ হয় না। কিন্তু আত্মাতে যারা রমণ করে, তারা কোন দ্বিতীয় বস্তু স্পর্শ করে না। এ জগতে আত্মারামতার একটু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যখন আমরা আয়নায় নিজের মুখ দেখে আনন্দ পাই, তখন সেখানে আর দ্বিতীয় বস্তু কিছু নেই। নিজেই নিজের মুখ দেখে আনন্দ পাই, তাই অনেকক্ষণ ধরে দেখেও আশা মেটে না। কিন্তু আর কোন উদাহরণ জগতে নেই বলেই এটি নেওয়া হল। তা না হলে এটিও ঠিক উদাহরণ হয় না। কারণ আয়নায় যে মুখের দর্শন হয়, সেও মায়ার মুখের দর্শন। প্রকৃত যে 'আমি' তাকে দেখা হয় নি। কৃষ্ণভক্তির আয়নাতেই একমাত্র নিজেকে দর্শন হয়। জীবের স্বভাব নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত—সচ্চিদানন্দময় আত্মা যখন জ্ঞান বা যোগের আয়নায় উপলব্ধি করা হয়, তখনই আত্মারাম হয়। জ্ঞান, যোগ যত সাধনেই আত্মোপলব্ধি হোক না কেন, কৃষ্ণভক্তি আয়নায় যেমন আত্মোপলব্ধি হয়, এমন আর কিছুতে হয় না। তাই আত্মারাম মুনি শুকদেবও কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মুড়ি থেকে পিঁপড়ে ছাড়াতে গেলে পাশে মধু রাখতে হয়। কিন্তু আমাদের মন-পিঁপড়ে কিছুতেই বোঝে না। বিষয়-মুড়ি ছেড়ে সে কিছুতেই আসতে চায় না। পাশেই গৌরগোবিন্দভজন-মধু রয়েছে। কিন্তু বিষয় ছেড়ে মন আমাদের ভজনে কিছুতেই যায় না। এ বোধ আমাদের মনে আজও হয় নি।

হরি, হরিনাম, হরিভক্ত জগৎ মরুর আশ্রয়। তাই হরিকে, হরি কথাকে, এবং হরিভক্তকে সমান মর্যাদা দিতে হবে। নিজের যদি সামর্থ্য না থাকে তাহলে পেট ভরাবার জন্য যারা খায়, তাদের কাছে হাত পাততে হয়। তেমনি যাঁরা ভজন-খাদ্যে ভরপূর, নিরন্তর ভগবৎপ্রেমামৃত আস্বাদন করছেন, তাঁদের কাছে কাঙালের মত হাত পাততে হবে। কাঙালের চেহারা চোখে, মুখে, হৃদয়ে, বেশভূষায়, আচারে-ব্যবহারে ফুটিয়ে তুলতে হবে। তাহলে তাঁদের করুণা হবে। কারণ মরবার পরের পেট হরিনাম ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ভরবে না। অপরাধের জন্যই একমাত্র বস্তু পাওয়া আমাদের কাছে কঠিন হয়। পরমার্থের ভিক্ষুক আমরা। হরিভক্তি সাধনে মেলে না। আমাদের সাধন-সামর্থ্য তো নেই-ই, আর কেউ এ সম্পদ দানও করবে না। তাই যাঁরা আস্বাদন করেন তাঁদের পায়ের তলায় কুকুরের মত পড়ে থাকতে হবে। নিষ্কপট হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। বৈষ্ণব হলেন সর্বজ্ঞ, তাঁরা হৃদয় বুঝে কৃপা করবেন।

ভজনের অঙ্গের লঙ্ঘন করা যেতে পারে কিন্তু ভজন লঙ্ঘন করা যাবে না। এইটিই যোগীন্দ্রের বাক্যের তাৎপর্য। সাধন-পথ নির্ণয় করা বড় কঠিন। নিজে বুদ্ধি করে ঔষধ খেলে রোগের যন্ত্রণা বাড়বে বই কমবে না। চিকিৎসক যদি ঔষধ বেছে দেন তবেই রক্ষা। তেমনি শাস্ত্র হল ওষুধের আলমারি —জীব ভবরোগী। শ্রীগুরুদেব বিজ্ঞ চিকিৎসক, তিনিই পথ নির্ণয় করে দেবেন। ভগবানের উপাসনার নামই ধর্ম। ভগবানে অর্পিত সর্বকর্মই ভাগবতধর্ম—এ কথাটি দুই অর্থে বিচার করতে

হবে। কায়মনোবাক্যে যা কিছু করা যায়, সব ভগবানে অর্পণ করলে তার নামই ভাগবতধর্ম। ভগবান গীতাবাক্যে বলেছেন ঃ

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ গীতা ৯।২৭

যা করবে কর, আপত্তি নেই। সব কিন্তু নারায়ণে অর্পণ করতে হবে। এই অর্পণ দ্বারে ভগবানের সঙ্গে একটু সম্বন্ধ করার অভ্যাস হবে। দিন দিন একবার করে গোবিন্দপাদপদ্ম তো চিন্তা করা হবে। তাতেই পাপক্ষালন হবে। এই রকম করতে করতে কর্মের কর্তৃত্বাভিমান কমবে। প্রতিদিন অর্পণ করতে করতে মনে হবে, এমন কুৎসিত কর্ম ভগবানে অর্পণ করা ঠিক হবে না। এই বিবেক যখনই জাগবে, তখনই সে সাধুর কাছে যাবে। তার ফলে গুরুপদাশ্রয় হবে। গোবিন্দভজন নিখুঁত করে করতে হবে। কর্ম, জ্ঞান, যোগ খাঁটি নয়। তাই শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ করেছেন—'জ্ঞান-কর্মাদ্যনাবৃতম্'। ভজনে কোন কামনা মেশান চলবে না। গৌর-গোবিন্দপাদপদ্ম ছেড়ে কামনা অন্যত্র গেলেই তার নাম কপটতা। এই কপটতা অজ্ঞানতার ফলে হয়। অজ্ঞান বলেই আমরা গৌরগোবিন্দ ছেড়ে অন্য বস্তু চাই। যোগীন্দ্র ভাগবতধর্মের যে লক্ষণ করলেন, শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেছেন, এটি ভক্তিধর্মে প্রবেশের দ্বার। দরজাকে তো ঘরই বলতে হবে; অতএব এটিও ভাগবতধর্ম। শুভ-অশুভ যে কোন কর্ম করা যাক না কেন, কোন নিষেধ নেই। এতদিন কর্ম করে যেত, আজ নূতন করে অর্পণ করতে শিখল। কিন্তু কর্মার্পণের এমনই মহিমা যে

অর্পণকারীর চিত্তবৃত্তির পরিবর্তন ঘটবেই। অর্পণ করতে করতে মনে হবে, ভগবানকে অর্পণ করছি। তাঁকে কি খারাপ জিনিষ দেওয়া চলে? তখন তার স্বভাবের সঙ্গে ঝগড়া চলতে থাকে। যে ফুল দেবতার পূজায় চলে না, সে ফুল তুলে লাভ কি? শ্রীচক্রবর্তিপাদ বিচার করেছেন, দন্তধাবন, স্নান, গাত্রমার্জন প্রভৃতি শারীরিক চেষ্টা ভাগবতধর্ম কেমন করে হবে? বিষয় ভোগের জন্য লোকে এই সব করে। এর ওপরে যাগযজ্ঞাদি করবার জন্যও এসব কায়িক কাজ করে, আবার ভক্তজনেরও এ শারীরিক চেষ্টা দেখা যায় কৃষ্ণ আরাধনার জন্য। কৃষ্ণ আরাধনার জন্য করে বলেই এর নাম ভাগবত ধর্ম। যে ব্যক্তি সেবার জন্য ফুল তুলে দেয়, মালা গাথে বা চন্দন ঘষে, যে গাভী সেবার জন্য দুধ দেয়--এরা সকলেই ভক্তির অংশ পাবে। সকলে তো সব কাজ করতে পারে না। যে করে তার আনুকূল্য করতে পারলেও লাভ আছে। কৃষ্ণ-আরাধনার জন্য যদি পুত্রোৎপাদন চেষ্টা হয় তাহলে সেটিও ভাগবতধর্মের মধ্যে পড়বে। ভগবৎ-ভজন-প্রীতিই মেরুদণ্ড। এর থেকে সরে এলে চলবে না।

সংসার থেকে ভক্তের ভীত হবার কোন কারণ নেই। অপূর্বদেহেন্দ্রিয় সংযোগের নামই সংসার। যেমন বনের পাখীর খাঁচার সঙ্গে সংযোগ হয়। এইটিই আসল সংসার। আর স্ত্রী পুত্র নিয়ে বাস হল নকল সংসার। আসল সংসার ভাঙতে পারলে তবে নকল সংসার ভাঙবে। পুত্র জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু নিয়ে জন্মায়। কথাটি রূঢ় কিন্তু সত্য—পিতামাতা পুত্রের কল্যাণ করতে জানে না। গোবিন্দভজন দিতে পারলে বা

দেওয়াতে পারলে স্বজন হবার দাবী করা যাবে। কৃষ্ণে উন্মুখ ব্যক্তির সংসারবন্ধন নেই, কৃষ্ণবিমুখ জনেরই সংসার।

ভক্তের সংসার হতে ভয় নেই। ভক্তিধর্মে যে ব্যক্তি প্রবর্তিত হয়েছে, তার ভয় স্বতঃই অপসারিত হয়। দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশের নাম ভয়। আমি অর্থাৎ আত্মা ছাড়া আর যা কিছু সবই দ্বিতীয়। চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সবই আত্মার অতিরিক্ত আত্মা নয়। এ হল আত্মার উপাধি। এই উপাধিতে আত্মার অভিনিবেশ হয়েছে। কিন্তু লাঠিতে ঘুন ধরলে আমি কেন ঘুন ধরি? সংসার ভয় মানে জন্মমরণ ভয়। যে ব্যক্তি ঈশাদপেত অর্থাৎ ঈশ বিমুখ, তারই ভয়, ঈশ উন্মুখের ভয় নেই। মহারাজ নিমির তরফ থেকে স্বামিপাদ প্রশ্ন করেছেন, অজ্ঞানের ফলে ভয়ের উৎপত্তি। তাহলে জ্ঞানের দ্বারাই তো সে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হবে। তবে ভয়নিবৃত্তির জন্য পরমেশ্বরের ভজন বিধান হল কেন? কারণ এর আগে যোগীন্দ্র অচ্যুতের পাদপদ্ম উপাসনাই ভয় নিবৃত্তির হেতু বলে স্থাপন করেছেন। অন্ধকারে রজ্জু দেখলে সাপ বলে মনে হয়। এই সাপ দেখা থেকে ভয়ের উৎপত্তি। আলো এলে যখন রজ্জুজ্ঞান হল তখন সর্পভয় নিবৃত্তি হল। আমাদের স্বরূপের বোধ নেই। এই অজ্ঞান থেকে মায়িক দেহ-ইন্দ্রিয়তে আমরা আমি বোধ করেছি। সত্যকার আমি যে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব এই স্বভাব ভুল হয়েছে। ভয় বলতে জন্ম মরণ রোগ শোক মোহ ইত্যাদি। আত্মজ্ঞান হারিয়ে যাওয়ার ফলে এই অবস্থা। জ্ঞানালোকের ফলে এই অজ্ঞান চলে যাবে।

তবে আবার পরমেশ্বরের ভজন বিধান করলেন কেন? জীবের বন্ধন ঘটেছে মায়ার দ্বারা। মায়ার দ্বারাই এই স্বরূপবিস্মৃতি—যার নাম দিয়েছেন যোগীন্দ্র অস্মৃতি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ অনুবাদ করেছেন ঃ

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল।
তে কারণে মায়া পিশাচী তার গলায় বাঁধিল।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, জীব যদি নিত্যদাসই হয়, তাহলে আবার ভুলবে কেমন করে? একটি উদাহরণ দিলে কথাটি স্পষ্ট হবে। যত্নবাবুর ছেলে পাগল হয়েছে জন্মাবধি। তাই পিতার নাম জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারে না—যা তা বলে। কিন্তু সুস্থমস্তিষ্ক যাদের তারা জানে যে সে যত্নবাবুর ছেলে। তেমনি ভগবানের সন্তান জীব পাগল হয়েছে। তাই সে বলতে পারে না যে, সে নিত্যকৃষ্ণদাস। জিজ্ঞাসা করলে সে যা তা বলে। অহং ধনী মানী কুলীন পণ্ডিত। কিন্তু সাধু শাস্ত্র গুরু বৈষ্ণব এঁরা সুস্থমস্তিষ্ক লোক, তাঁরা জানেন জীব নিত্যকৃষ্ণদাস। মাতার কাছে যেমন পিতার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি বেদমাতার কাছে পরমপিতা শ্রীগোবিন্দের পরিচয় পেতে হবে। জীব অংশ, গোবিন্দ অংশী—তাহলে গোবিন্দের সঙ্গে জীবের দাসসম্বন্ধ। আগে দাসত্বসম্বন্ধ ঠিক হোক, পরে অন্য সম্বন্ধ আসবে। অণু সব সময় দাস, আর বিভু যে সে প্রভু। জগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাই দেখা যায়। অণু দাস ভাব নিয়ে বিভুর কাছে যায়। বিদ্যা, জ্ঞান, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন—এ সব বিষয়ে যে অণু সে বিভুর দাসত্ব করে। জীবশরীরকে ক্ষেত্র এবং

জীবাত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়েছে। ক্ষেত্রজ্ঞ পরবান্ সদা। জীব পরবান্ অর্থাৎ 'দাস'। কার দাস? পদ্মপুরাণ বললেন, 'দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন'। শ্রীহরিরই দাস, অন্য কারও নয়। তাহলে জীব অণু এবং ঈশ্বর বিভু হওয়ায় দাস এবং প্রভু সম্বন্ধটি পাকা হল। যার যে বিষয়ে অভাব আছে, অর্থাৎ অণু যে সে বিভুর কাছে দাসত্ব করে। বিভু তার দাসত্ব গ্রহণ করে পারিতোষিক দেয়। তেমমি সুখের অভাবে, আনন্দের অভাবে অণু জীব দাসত্ব নিয়ে বিভু গোবিন্দের কাছে যাবে। গোবিন্দ তার দাসত্ব গ্রহণ করে নিজ পাদপদ্মসেবা পারিতোষিক দেবেন। জীব অনাদি কৃষ্ণবিমুখ। এই বিমুখতাই জীবকে গোবিন্দের কাছ থেকে বিচ্যুত করে পৃথক করে রেখেছে। অনাদিবদ্ধ জীবের এই অনাদি বিমুখতা কৃষ্ণদাসী মহামায়া লক্ষ্য করেছেন। গোবিন্দ ইচ্ছা করেই মহামায়াকে আদেশ করলেন, জীবকে একটু শাসন কর। গোবিন্দ-ইচ্ছাতেই মহামায়া জীবকে শাসন করে। গোবিন্দ আজ্ঞা দিলেন, এমন শিক্ষা দাও, যাতে জীব উন্মুখ হয়। এটি গোবিন্দ-গুণই বলতে হবে। জীবের প্রতি মায়ার দণ্ড ভগবানের প্রতি উন্মুখতারই হেতু হবে। মায়া জীবকে বেপরোয়াভাবে দণ্ড দিয়েছে। কিন্তু যেমনটি আদেশ ছিল, সে রকম দণ্ড দেয় নি। দণ্ডের পরিমাণ এত বেশী হয়ে গিয়েছে যে, মায়া আর গোবিন্দের সামনে দাঁড়াতে পারছে না, লজ্জা পাচ্ছে। যেমন গৃহশিক্ষকের ওপর অভিভাবকের আদেশ দেওয়া থাকে, ছেলেকে শাসন করবার; কিন্তু রাগের মাথায় শাসনের মাত্রা বেশী হয়ে গেলে গৃহশিক্ষক

যেমন অভিভাবকের সামনে যেতে লজ্জা পায়, মায়ার অবস্থাও তাই। দণ্ড দেওয়ার উদ্দেশ্য হল সংশোধন করা, আর যাতে সে কোনদিন অন্যায় না করে। কিন্তু দণ্ড বেশী দিলে সে ছ্যাচড়া হয়ে যায়। আমাদের অবস্থাও তাই। একে মায়ার দেওয়া পুত্র, অর্থ, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা পেয়ে আমরা গৌরগোবিন্দ ভুলে আছি। কিন্তু এ দণ্ডেও আমরা সন্তুষ্ট নই। আরও দণ্ড পেতে চাই। বেশী করে, অর্থ বিত্ত প্রার্থনা করি, যাতে কোনও দিন গৌরগোবিন্দ বলতে না পারি। এখন প্রশ্ন হতে পারে মহামায়া গোবিন্দের আদেশের অতিরিক্ত শাস্তি জীবকে দিলেন কেন? অজ্ঞ যে সে যথাদেশে কাজ করতে পারে না, অতিরিক্ত করে ফেলে, কিন্তু মহামায়া তো অজ্ঞ নন। মহামায়া শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেছেন। কিন্তু গোবিন্দের আদেশের অতিরিক্ত দণ্ড জীবকে দিয়েছেন—কেন? শ্রীজীবপাদ বলেছেন,—জীবানামনাদিভগবদ্বৈমুখ্যমসহমানা। মহামায়া হলেন শ্রীগোবিন্দের দাসী, কাজেই তাঁর প্রভুকে জীব অনাদি কাল থেকে ভুলে আছে,—এ বিমুখতা মহামায়া সহ্য করতে না পেরে জীবকে কঠোর শাস্তি দিয়েছে। জীবের অনাদি-বিমুখতার দুরবস্থা মায়া সহ্য করতে পারে নি। হিতৈষিণী শিক্ষয়িত্রীর মত জীবকে শাসনের সুরে বলেছেন, সারা দিনটা গেল, একবারও বই নিয়ে বসলি না। গোবিন্দকে একবারও ডাকলি না, যেমন গোবিন্দকে ভুলে রইলি তেমনি ভুলেই থাক। কিছুতেই যেন আর মনে না পড়ে। এই বলে অর্থ, বিত্ত, পুত্র, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন।

মায়া জীবকে দুটি চাবুক দিয়েছে—একটি অস্মৃতি অপরটি বিপর্যয়। মায়া আক্রমণের পূর্বে জীব কৃষ্ণবিমুখ ছিল। কিন্তু আত্মজ্ঞান তার লোপ পায় নি। আত্মা যে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব—এ জ্ঞান তার ছিল। কিন্তু মায়া আক্রমণের পর জীবকে সে আরও বেশী করে ভুলাল, অর্থাৎ তার আত্মজ্ঞান হরণ করে নিল। এই আত্মস্বরূপ ভুল হওয়ার নামই অস্মৃতি আর এরই ফলে দ্বিতীয় চাবুক এল বিপর্যয়। আত্মজ্ঞান থাকতেই মায়ার আক্রমণ হয়েছে। কাজেই আত্মজ্ঞান ফিরে পেলেও মায়া আক্রমণের বাধা হবে না। মায়া আত্মজ্ঞানের খাতির রাখে না। 'হা গোবিন্দ' বলে গোবিন্দপাদপদ্মে শরণাগতির খাতির রাখে। হাতে লাঠি থাকা অবস্থায় ডাকাতে আক্রমণ করে লাঠি কেড়ে নিয়ে তাকে বেঁধেছে। তাই যদি সে লাঠি ফিরে পায়ও তাহলে তার বন্ধন-দশার নিবৃত্তি হবে না। দ্বিতীয় চাবুক হল বিপর্যয়। বিপর্যয় হল—অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধি অনাত্মনি, অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি। মায়ার তিনটি গুণ—সত্ত্ব রজঃ তমঃ। রজোগুণ থেকে সৃষ্টি সত্ত্বগুণে স্থিতি এবং তমোগুণে সংহার। রজোগুণের বৃত্তি প্রকৃতি। এই প্রকৃতিই জীবের জ্ঞান নষ্ট করে। তমোগুণ থেকে অবিদ্যাবৃত্তির জন্ম। প্রকৃতি জীবের জ্ঞান নষ্ট করে অবিদ্যাকে আদেশ করলেন এইবার আত্মজ্ঞানশূন্য জীবকে মায়িক দ্রব্য গছিয়ে দাও। জ্ঞান হারালে জীবকে দিয়ে যা খুশী তাই করানো যাবে। এই অবিদ্যা-কুহকিনী জীবের কাছে নানা ছাঁদে মনোমুগ্ধকর অবস্থায় দাঁড়ালেন। বড় সুন্দররূপে চুরাশি লক্ষ দেহের ডালা সাজিয়ে

জীবের কাছে ধরলেন—স্বৈরিণী রমণী যেমন বিচিত্রফুলের মালা গেঁথে পুরুষের কাছে ধরে। অবিদ্যা জীবকে প্রলুব্ধ করে—এই মায়িক দেহ গ্রহণ কর, এতে ইন্দ্রিয় আছে, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ভোগ করতে পারবে। যত ইচ্ছা বিষয় ভোগ করতে পারবে, খুব আনন্দ পাবে। জীব এতে মুগ্ধ হয়ে অবিদ্যার কুহকে পড়ে মায়ার দেহ গ্রহণ করল এবং তাকে যখন আমার বলে গ্রহণ করল, তখনই জীবের মৃত্যু—'তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ'। এই হল মায়ার কাজ। এই মায়ারোগের চিকিৎসা কি? ভগবদ্ভজনই মায়ারোগের চিকিৎসা। এ ছাড়া রোগ নিবৃত্তির অন্য কোন উপায় নেই। গীতায় ভগবান বলেছেন :

'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। গীতা ৭।১৪

শ্রুতিও বলেছেন :

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

—শ্বেতাশ্বতর উঃ

মায়াকে না ভজে যার মায়া তাকে ভজলেই এই মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি। 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে'—এখানে 'মাম্' পদের দ্বারা ভগবান নিজেকে দেখিয়ে বললেন, শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন নন্দনন্দনই আশ্রয়ের বিষয়। আত্মদুর্লভ বস্তু দিয়ে গোবিন্দপূজা করতে হবে। সমস্ত দ্রব্যে যেমন বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভেজাল দেওয়া হয়, তেমনি আমাদের ভজনেও ভেজাল আছে। ভজন করি—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ বন্দন—যা কিছু করি না কেন, তার মধ্যে প্রার্থনা মেশান থাকে। আমার গৃহ, বিত্ত, দেহ, দৈহিক সব কিছুর আরও শ্রীবৃদ্ধি হোক। ভগবানকে ভজি

কিছু আদায়ের জন্য, প্রেমে ভজি না। এই ভজনে 'প্রপদ্যমান' কথাটি সঙ্গত হল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'প্রপদ্যমান' হলে তবে মায়া ছাড়বে, তার আগে না। জাল তেখিয়ে সূতো দিয়ে তৈরী। তাই জালে পড়া পাখী যদি নিজে জাল থেকে পালাবার চেষ্টা করে তাহলে আরও জড়িয়ে যায়। কিন্তু মুক্তির জন্য যদি কাতর হয়ে ব্যাধের শরণাগত হয়, তাহলে মুক্তি পেতে পারে। তেমনি জীবের মুক্তিও নিজের সাধনে হয় না। গোবিন্দচরণে শরণাগত হলে তবে মায়া ছাড়ে। বুধ অর্থাৎ বুদ্ধিমান তাঁকে ভজবে। শ্রীগুরুচরণপ্রসাদাৎ লব্ধবিবেকঃ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণায় যার বিবেক লাভ হয়েছে সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান। কেমন করে অর্থাৎ কি দিয়ে ভজবে? একয়া ভক্ত্যা অর্থাৎ অব্যভিচারিণী কেবলা শুদ্ধাভক্তির দ্বারা ভজবে। শ্রীগুরুদেবে দেবতা এবং প্রিয়তম বুদ্ধি করে। এই শুদ্ধা ভক্তিতে শ্রীগোবিন্দ ভজলে মায়ার হাত হতে নিষ্কৃতি। গোবিন্দ বলে আলো জ্বাললেই মায়ার অন্ধকার নাশ হবে।

এই ভক্তিমহারাণীর চৌষট্টি প্রকার অঙ্গ। তার মধ্যে নয়টি অঙ্গ প্রধান ঃ

চৌষট্টি অঙ্গের শ্রেষ্ঠা নববিধা ভক্তি।
তারা কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি

প্রহ্লাদজীর বিধান অনুযায়ী ঃ

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ ভা. ৭।৫।২৩

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদসেবন, অর্চন, দাস্য, সখ্য

আত্মনিবেদন--এই নয়টি অঙ্গ থেকে যোগীন্দ্র প্রধান দুটি অঙ্গ নিয়েছেন—শ্রবণ এবং কীর্তন। জগতে যেমন দেখা যায় আগে জমা পরে খরচ, তেমনি আগে শ্রবণ করে জমা করতে হবে, পরে খরচ অর্থাৎ কীর্তন। শ্রবণে আবার ক্রম আছে, নাম রূপ গুণ লীলা, কীর্তনের বেলাতেও তাই। সাধুরা ভক্তিলম্পট। শ্রীজীব-পাদ বিধান দিয়েছেন প্রথমে নাম শ্রবণ। এ নামকোথায় পাওয়া যায়? মহৎমুখ নির্গলিত নামই একমাত্র শ্রবণযোগ্য এবং এই নামই কৃপা করতে সক্ষম, অন্য নাম নয়। যেমন দুধ বলকারক সন্দেহ নেই, কিন্তু তা যদি সর্পোচ্ছিষ্ট হয় তাহলে তা বলসঞ্চারের পরিবর্তে বিষক্রিয়া করবে এবং তা মৃত্যুর কারণ হবে। বৈষ্ণব-মুখ নির্গলিত নামই আস্বাদনের বস্তু। সকল মহাজনই বর্ণনা করেছেন, শ্রীশুকমুখনির্গলিত শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রবণযোগ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলেছেন, 'ভাগবত পড় গিয়া বৈষ্ণবের স্থানে।' যোগীন্দ্র ভক্তি অঙ্গ যাজনে শ্রবণ কীর্তন দুটি অঙ্গ বললেন। তিনটি প্রধান অঙ্গের মধ্যে স্মরণাঙ্গ ভক্তিকে বাদ দিলেন। কারণ স্মরণ মনের কাজ। মনের কাজ করা কঠিন। মনের রুচি আগে হবে না। শ্রবণ কীর্তন করতে করতে অর্থাৎ কান ও বাক্যের কাজ করতে করতে মনের রুচি আসবে। মনের রুচি একবার হয়ে গেলে তখন আর ভাবনা নেই। শ্রবণ করে করে ভাণ্ডারে জমলে তখন গায়ন্—শৃণ্বন্ ও গায়ন্—দুটিতেই শতৃ প্রত্যয় দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা নিত্য বর্তমানতা দেখান হয়েছে। অর্থাৎ সব সময়ের জন্যই কোন না কোনটিকে বর্তমান করে রাখতে হবে। একটিকেও ছাড়া চলবে না। বক্তা

থাকলে শ্রবণ, শ্রোতা থাকলে কীর্তন, আর যেখানে বক্তা এবং শ্রোতা দুই-এরই অভাব সেখানে গৃণন্। এইভাবে অসঙ্গ হয়ে বিচরণ করবে। অসঙ্গ অর্থাৎ বস্ত্বন্তরাসক্তিশূন্য। ভক্তি হলেন জননী এবং বৈরাগ্য তাঁর পুত্র। জ্ঞান-বৈরাগ্য হতে ভক্তির জন্ম নয়, ভক্তি হতে জ্ঞান-বৈরাগ্যের জন্ম। শ্রীসূতমুনির বাক্য ঃ

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥ ভা. ১।২।৭

ভগবানের যে কোন নাম অর্থাৎ যে দেশে যে নাম প্রচলিত তা উচ্চারণ করলে বা শুনলেও কাজ হবে। যেমন কৃষ্ণ বলতে বা শুনতে যদি কহ্ন, কানড়, কান বলা যায় বা শোনা যায়, তাহলে ফল হবে। শ্রবণকীর্তন অপেক্ষা স্মরণাঙ্গা ভক্তি প্রধান হবে না। দেবর্ষিপাদ নারদ একথা গোপকুমারকে বলেছেন। ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে কোন্‌টি প্রধান বিচার হবে কি করে? ভগবানের সামনে বসে যে অঙ্গ সাধন করা যায় সেইটিই প্রধান বলে ধরতে হবে। দেখা গেল এক কীর্তনাঙ্গা ভক্তি ছাড়া অন্য কোন অঙ্গই ভগবানের সামনে বসে করা যায় না। অতএব কীর্তন অঙ্গটি সকল অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যোগীন্দ্র যদিও বললেন, অসঙ্গ অর্থাৎ নিস্পৃহ হয়ে শ্রবণ কীর্তন করবে। কিন্তু নিস্পৃহ হয়ে শ্রবণ কীর্তন করব, এ মনে করলে আর কোনদিন করা হয়ে উঠবে না। স্পৃহা নিয়েই শ্রবণ কীর্তন করতে হবে। শ্রবণ কীর্তন করতে করতে স্পৃহা কমবে। যেমন উদরে অন্নের গ্রাস যতই দেওয়া যাবে ততই ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে। আত্মার খাদ্য হল একমাত্র ভগবানের নাম, চিৎ খাদ্য।

আত্মা মায়ার খাদ্য অন্ন জল কিছুই গ্রহণ করে না—মানুষ যেমন গোরুর খাদ্য বিচুলি খায় না। যেমন সাঁতার শিখতে হলে আগে জলে নামতে হবে, তেমনি ভজন করতে আরম্ভ করলে তবে মিথ্যা ছাড়বে। মিথ্যা ছেড়ে ভজন করা যাবে না। সত্যকে আশ্রয় না করলে মিথ্যা ছাড়বে না।

শ্রীযোগীন্দ্র শ্রবণ কীর্তনের কথা বলে পরে বলেছেন, শ্রবণ ছেড়ে শুধু কীর্তনও আবার নামকীর্তন – লীলাকীর্তন নয়। স্বপ্রিয়নামকীর্তনের দ্বারাই প্রেমলাভ হবে। ভগবানের যে নামটি সাধকের প্রিয় সেইটি উচ্চারণ করলেই কাজ হবে। নবযোগীন্দ্র ভক্তিযোগের বিধান করছেন। সাধক দুই প্রকার—মুক্তিসাধক ও প্রেমসাধক। যুগধর্মের আচরণের দ্বারা মুক্তি সাধন পর্যন্ত হয়। কিন্তু প্রেমসাধক মুক্তি পর্যন্ত চায় না। শুধু যুগধর্ম আচরণে প্রেমসাধন হয় না। ভক্তি আশ্রয় না করলে হবে না। কলিযুগের সুবিধা হল, যেটি যুগধর্ম, সেইটিই ভক্তিধর্ম অর্থাৎ নামসঙ্কীর্তন কলিযুগোচিত ধর্ম, আবার এটি ভক্তিধর্মও বটে। কাজেই এই নামসঙ্কীর্তনকে আশ্রয় করলে দুটি কাজই হবে। যুগধর্মও পালন করা হবে, আবার ভক্তি আচরণ করাও হবে। মুক্তিসাধন প্রেমসাধন দুই-ই হবে। মুক্তি প্রেমভক্তিতে ক্রোড়ীকৃত হয়ে আছে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রেমভক্তি লাভ করেছে, মুক্তি তার পাওয়া হয়ে গেছে। স্বপ্রিয়নাম বলতে এর পিছনে একটু কথা আছে—সাধকের কোন নাম প্রিয় হতে পারে না। শ্রীগুরুদেব তাঁর নিজের প্রিয়তা কৃপা করে সাধককে দান করেন। তখন শ্রীগুরুদেবের প্রিয় নামই সাধকের প্রিয়

হয়ে ওঠে। নামকীর্তন করতে করতে যখন সাধকের প্রেম হয়, তখন তার সংসারের অতীত চেষ্টা দেখা যায়। প্রেম যার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, সে জানে না, কিন্তু বিজ্ঞ সাধু গুরুবৈষ্ণব জানেন। যার হৃদয়ে যত প্রেম, তার দর্শনের উৎকণ্ঠা তত। দর্শনের উৎকণ্ঠা-অগ্নিতে চিত্তস্বর্ণ গলে যায়। শ্রীচক্রবর্তিপাদ বললেন, 'দর্শনোৎকণ্ঠাগ্নিদ্রুতীকৃতচিত্তজাম্বুনদঃ'। প্রেমের বিক্রিয়ায় তখন সাধক হাসে কাঁদে নাচে গায়। ক্ষুধা থাকলে যেমন অন্নদর্শনের জন্য উৎকণ্ঠা হয়, প্রেম থাকলেও তেমনি ভগবৎদর্শনের জন্য উৎকণ্ঠা হয়। ভক্ত হাসে কাঁদে কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীবপাদ সংক্ষেপে বলেছেন, 'হাসাদীনাং কারণানি ভক্তিভেদানন্ত্যাদনন্তান্যেব জ্ঞেয়ানি'। শ্রীচক্রবর্তিপাদ এ বিষয়ে দিগ্‌দর্শন করেছেন—কৃষ্ণের নিত্যকর্ম আছে ঃ

বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ।
স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধি পয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।
মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি।
দ্রব্যালাভে স গৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্॥
—ভা. ১০।৮।৩০

অসময়ে বাছুরের গলার দড়ি খুলে দেওয়া—সঙ্গীদের নিয়ে পাড়া প্রতিবেশীর ঘরে ঢুকে মাখন চুরি করা, ঘুমন্ত শিশুদের চিমটি কেটে কাঁদিয়ে জাগিয়ে দেওয়া, এসব গোপালের নিত্যকর্ম। জরতী বুড়ী বাধা দিতে গেলে তার মুখেচোখে গোপাল ননী

মাখিয়ে দিয়ে তাকে নাজেহাল করে। সাধক যখন প্রভুর এ বাল্যলীলা স্মরণে ডুবে যায় তখন আনন্দে উচ্ছলিত হয়ে হেসে ওঠে। প্রভুর দর্শন না পেয়ে উৎকণ্ঠায় রোদন করে, চিৎকার করে কোথায় তুমি, একবার দেখা দাও, তোমার দর্শন ছাড়া প্রাণ যে বাঁচে না। ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের অর্তিতে দেখা না দিয়ে পারেন না। কাছে এসে মৃদুমধুর হেসে বলেন—'এই তো আমি এসেছি আর তোমার দুঃখ কিসের ?' প্রাণপ্রিয়ের দর্শন পেয়ে প্রাণবল্লভকে বুকে ধরে সাধক আনন্দে গান করে, নৃত্য করে। ঠিক যেন উন্মাদের আচরণ। কিন্তু উন্মাদ নয়, উন্মাদবৎ। উন্মাদ অবস্তুকে বস্তু জ্ঞান করে। আর ভক্ত বস্তুকেই বস্তু জ্ঞান করে, গ্রহগৃহীতের মত, লোকের হাস্য প্রশংসাকে অপেক্ষা না করেই নৃত্য গীত করে। বঁড়শীবিদ্ধ মাছ যেমন অন্য মাছের মত জলের মধ্যে সাঁতার দিলেও যে বঁড়শীবিদ্ধ করেছে সে জানে যে মাছটি তার হাতে তেমনি এই প্রেমিক ভক্ত সংসারের মাঝে আর পাঁচ-জনের মত চললেও সাধু গুরু বৈষ্ণব বোঝেন, এটি সংসারের জীব নয়। তৃষ্ণার্তের কাছে অমৃতসাগর যেমন, প্রেমোৎকণ্ঠার কাছে কৃষ্ণদর্শন তেমনি। প্রেমিক ভক্ত প্রেমে সর্বত্র তাঁর ইষ্ট দেবতাকে দর্শন করেন।

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি
সর্বত্র হয় যে তার ইষ্টদেব স্ফূর্তি
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।

এইটিই প্রেমের খাঁটি লক্ষণ।

এর পরে নিমিরাজের পক্ষ থেকে স্বামিপাদ, প্রশ্ন করেছেন,

যোগারূঢ় ব্যক্তি বহু জন্মের সাধনাতেও যা পায় না, একমাত্র নাম সঙ্কীর্তনের ফলে তা কেমন করে সম্ভব হবে? এর উত্তরে যোগীন্দ্র বললেন:

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥
ভা. ১১।২।৪২

যেমন যেমন ভজন তেমনি তেমনি প্রাপ্তি। ঠিক ভোজনের মত। যেমন যেমন ভোজন তেমনি তেমনি ক্ষুধার নিবৃত্তি। ক্ষুধার্ত ব্যক্তির যেমন তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষুন্নিবৃত্তি—এই তিনটি বস্তু হারিয়ে গেছে, তেমনি আমাদেরও তিনটি বস্তু হারিয়ে গেছে। ভক্তি, ঈশ্বরানুভূতি এবং সংসারে বৈরাগ্য—তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষুন্নিবৃত্তি ফিরে পাওয়ার একমাত্র উপায় হল ভোজন করতে আরম্ভ করা। আর ভক্তি, ঈশ্বরানুভূতি ও সংসারে বৈরাগ্য ফিরে পাওয়ার একমাত্র উপায় ভজন আরম্ভ করা। প্রতিটি গ্রাসে শুধু নয়, প্রতিটি অন্নে যেমন তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষুন্নিবৃত্তি অংশ আছে, তেমনি প্রতিটি নামোচ্চারণই সফল। সবই কাজে লাগবে, একটিও বিফল হবে না। পারা খেয়ে যেমন হজম করা যায় না, তেমনি সংসারের বস্তু গৌর-গোবিন্দের নাম হজম করতে পারে না। আধপেটা খাওয়া হলে তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষুন্নিবৃত্তির যেমন কিছুটা বুঝা যায়, দু'এক গ্রাস অন্ন পেটে গেলে বুঝা যায় না, তেমনি অনাদি কালের উপবাসী আত্মার আধাআধি ভজন হলে তবে ভক্তি, ঈশ্বরানুভূতি ও সংসারে বিরক্তির চেহারা কিছুটা ফুটবে, তার আগে পর্যন্ত কিছু বুঝা যায় না।

জ্ঞান, যোগ যেমন সাধনের সিদ্ধিদশায় ফল দান করে, সুখ দান করে, ভক্তি কিন্তু তা নয়—এখানে সাধনদশাতেই সুখ-প্রাপ্তি। ভক্তিসাধনের সাধনকালে এত আনন্দ যে অন্য সাধনের সিদ্ধিকালেও সে আনন্দ নেই। ভজন ও ভোজন—দুটির মধ্যে তফাৎ হল, বহু ভোজন করা যায় না, কিন্তু বহু ভজন করা যায়। যত ভজন করা যায় শ্রীগুরুকৃপায় তত ভজনস্পৃহা বাড়ে। এই ভজনস্পৃহা বাড়ায় শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন। শিশুকে যেমন প্রথমে দুধ খাইয়ে সব খাদ্য খাওয়ার যোগ্য করা হয়, তেমনি নামসঙ্কীর্তন করতে করতে ভজন-ক্ষুধা বাড়ে। তখন সব সাধন করবার শক্তি লাভ হয়। শ্রবণ কীর্তন অপ্রাকৃত খাদ্য, যত খাওয়া যায়, ততই ক্ষুধা বাড়ে। শ্রীযোগীন্দ্র বললেন,— অনুবৃত্তিতে ভজন করতে হবে—ভক্তি, ঈশ্বরানুভূতি ও বৈরাগ্য এই তিনটি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ভজন করতে হবে। এর বিরাম দিলে চলবে না। তারপর পরাশান্তি সাক্ষাৎভাবে লাভ হবে। মায়ার জগতে যে শান্তিলাভ তা অসাক্ষাৎ শান্তি। কারণ তাতে দ্রব্যের আবরণ থাকে। সুখ-সাধনে প্রবৃত্তি হলে সাক্ষাৎ শান্তি লাভ হয় না। খাদ্য বস্ত্র প্রভৃতির আবরণে শান্তিতে বাধা পড়ে। কিন্তু শ্রবণ কীর্তনাদি ভক্তিঅঙ্গ-যাজনে মায়ার আবরণ না থাকায় আনন্দেতেই প্রবৃত্তি—এতে সাক্ষাৎ শান্তিলাভ হয়। আর্তি করে ভজন করলে কোন অমঙ্গল আসতে পারে না। একবার নাম করলেই সকল পাপ ক্ষালন হয় বটে, কিন্তু তবু বার বার নাম করতে হবে। একটি প্রদীপ জ্বাললে যেমন শতবছরের অন্ধকার নিঃশেষে নাশ হয়, কিন্তু যদি সেই প্রদীপ নিভে যায়,

তাহলে আবার অন্ধকার আসে। তাই প্রদীপকে নিভতে দেওয়া চলবে না, অবিরত জ্বালিয়ে রাখতে হবে। গোবিন্দনামের প্রদীপ জিহ্বায় নিরন্তর ধরে রাখতে হবে। প্রাকৃত জগতে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য যেমন তাড়াতাড়ি ভোজন করতে হয়, তেমনি ভবক্ষুধা নিবারণের জন্য তাড়াতাড়ি ভজন করতে হবে। কিন্তু যদি মনে করা যায় এটিও তো কৃপা-সাপেক্ষ, ভজন তো কৃপা ছাড়া হয় না, তাহলে আমার আর কি করবার আছে? এটি কেবল প্রবঞ্চনা। কৃপা চাইবার চেহারা দেখাতে হবে। দরিদ্রের সাজ সেজে চেহারায় ভিক্ষুকতা ফোটাতে হবে, আর্তি জানাতে হবে। ব্যাকুলতা বাড়াতে হবে। খোলাম কুচির হরির লুট দিতে হবে। তা দেখে কোনদিন কোন দয়ালু ব্যক্তি সত্যকার হরির লুট কিনে দেবেন। নিজের প্রচেষ্টাই কৃপাময়ের কৃপা আকর্ষণ করবে। নিজের প্রচেষ্টা থাকলে তা দেখে সাধু গুরু বৈষ্ণব সত্যকার টাকা দিয়ে হরির লুট কিনে দেবেন। তাই শ্রীযোগীন্দ্র বললেন, অনুবৃত্তিতে ভজন করলে আর কখনও ভয় স্পর্শ করবে না। মূলে নিমিরাজের যে প্রশ্ন ছিল—ভাগবতধর্ম কাকে বলে এবং আত্যন্তিক মঙ্গল কার নাম—এ দুটি পৃথক প্রশ্ন নয়, একটিই প্রশ্ন। এ প্রশ্নের সমাধান শ্রীযোগীন্দ্র করলেন। এ ভাগবতধর্ম যাজনে একমাত্র ভাগবতজনই অধিকারী।

———

দ্বিতীয় প্রশ্ন

মহারাজ নিমি দ্বিতীয় প্রশ্ন তুলেছেন ঃ

অথ ভাগবতং ব্রূত যদ্ধর্মো যাদৃশো নৃণাম্।
যথা চরতি যদ্ ব্রূতে যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়ঃ॥ ভা. ১১।২।৪৪

ভাগবত লক্ষণ জানতে চেয়েছেন নিমিরাজ। ভাগবত বলতে দু'জনকে বুঝায়—এক ভাগবত শাস্ত্র আর এক ভক্তিরসপাত্র। নিমিরাজের প্রশ্ন—ভাগবতধর্ম যাঁরা যাজন করেন তাঁরা কেমন? প্রশ্নটি যুক্তিযুক্ত। ভক্তকে কি কি লক্ষণে চিনতে পারা যাবে? তার স্বভাব কেমন? তার কায়িক, বাচিক এবং মানসিক চিহ্ন কি কি যার দ্বারা তার ভগবৎপ্রিয়তা বুঝতে পারা যায়? বস্তুর সত্তা কায় মন এবং বাক্য তিনটি ভাবে অভিব্যক্ত হয়। মন যা করে তা দেহ এবং বাক্যের ছটায় ফুটে ওঠে। ভক্তের লক্ষণ কি এ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন দ্বিতীয় যোগীন্দ্র শ্রীহরি। প্রশ্নটি দ্বিতীয় এবং উত্তরও দিয়েছেন দ্বিতীয় যোগীন্দ্র হরি। ভগবান ভক্তের গুণ গাইবেন এবং ভক্ত ভগবানের গুণ গাইবেন —এইটিই হল শোভা। ভক্ত নিজের গুণ নিজে গাইতে পারেন না। গাইলেও ভাল দেখায় না বা শোনায় না। যোগীন্দ্রের নাম 'হরি' হলেও হরি নামটি তো ভগবানের। অতএব ভগবান ভক্তের লক্ষণের উত্তর দিচ্ছেন, ভগবানের শ্রীমুখে ভক্তের মহিমা কীর্তন বড় মানায়।

ভক্ত তিন প্রকার : উত্তম, মধ্যম, এবং কনিষ্ঠ অথবা প্রাকৃত। ভক্ত কখনও অধম হয় না। উত্তম ভক্তের লক্ষণ যোগীন্দ্র বললেন :

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষু ভাগবতোত্তমঃ॥ ভা. ১১।২।৪৫

সর্বপ্রাণীর মধ্যে যিনি পরমাত্মার ভগবৎভাব অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য ভাবকে দর্শন করেন এবং ভগবানের মধ্যে যিনি সর্বভূতকে দর্শন করেন, তিনি ভাগবতোত্তম অর্থাৎ উত্তম ভাগবত। পূর্বে স্বামিপাদ বলেছেন, এই আত্মার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান দর্শন করে, তারপর আবার যদ্বা করে অন্য অর্থ করলেন। দীপিকা-দীপনকার বললেন, স্বামিপাদের এ যদ্বা কেন? উত্তর হল 'আম্রনিম্বন্যায়াপত্তেঃ'। আম্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা হলে যেমন নিম্ব সম্বন্ধে উত্তর সমীচীন নয়, তেমনি নিমিরাজ প্রশ্ন করেছেন, 'অথ ভাগবতং ব্রূত' তার উত্তরে ব্রহ্মজ্ঞান হবে কেন? ব্রহ্ম-জ্ঞানে জীব ব্রহ্ম ভেদ স্বীকার করা হয় না। তাই ব্রহ্ম জ্ঞানের প্রসঙ্গে ভক্ত সংজ্ঞাই হয় না। তাহলে উত্তম ভক্ত কেমন করে হয়? অক্ষর-নিরুক্তিতে আত্মা শব্দের অর্থ 'হরি' পাওয়া যায়। 'আততাচ্চ মাতৃত্বাৎ চ আত্মা এব পরমো হরিঃ।' ভগবানের যে ষড়ৈশ্বর্য—সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য, সমগ্র বলতে যার সমান বা যার চেয়ে বেশী অন্য কোথাও দেখা যায় না, এই ষড়ৈশ্বর্যশালিতা যিনি সর্বভূতে দর্শন করেন, তিনি উত্তম ভক্ত। সর্বপ্রাণীতে পরমাত্মা বন্ধুর মত রয়েছেন। জীব যখন কর্মবশে

কৃমি কীট দেহ পায়, তখনও পরমাত্মা তাকে ত্যাগ করেন না। প্রতিভূতে পরমাত্মা যেমন আছেন তাঁর ষড়ৈশ্বর্যও আছে। অগ্নিকে দেখলে যেমন তার দাহিকা শক্তিকে দেখা হয়ে যায়, তেমনি সর্বভূতে যে ব্যক্তি পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি পরমাত্মার ষড়ৈশ্বর্যও দর্শন করেন। এখন যোগীন্দ্র বলেছেন, 'সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ'। দৃশ্ ধাতুর একটি অর্থ যদিও জানা (জ্ঞান) হয়, এখানে কিন্তু শুধু জ্ঞান অর্থ নিলে হবে না। কারণ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। তাই বলে তাঁকে ভক্ত বলা চলবে না। এখানে দৃশ্ ধাতুর অর্থ চোখে দেখা। সর্বভূতে যিনি ভগবানকে চোখে দেখেন তিনি উত্তম ভক্ত। আর ভগবানের মধ্যে যিনি সর্বপ্রাণীকে দর্শন করেন তিনিও উত্তম ভাগবত। মশক কৃমি কীটের মধ্যেও যিনি ভগবানকে চোখে দেখেন তিনিই উত্তম ভক্ত। সর্বভূতেষু বলতে চেতনা-চেতনেষু স্থাবরজঙ্গমেষু—চেতন হল স্ফুটচৈতন্য, অচেতন হল অস্ফুটচৈতন্য —সকলের মধ্যে ভগবানকে দর্শন—

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি।
সর্বত্র হয় যে তার ইষ্টদেব স্ফূর্তি॥

অচেতন স্ফটিকস্তম্ভে প্রহ্লাদজী ভগবানকে দর্শন করেছেন, প্রহ্লাদজী নিজ উপাস্যকেই দর্শন করেছেন, নরসিংহ মূর্তি নয়। ব্রহ্মা প্রভৃতির বাক্য সত্য করবার জন্য ভগবান পরে নরসিংহ মূর্তিতে আবির্ভূত হন।

শ্রীজীবপাদ অর্থ করেছেন, আত্মনি স্বচিত্তে, নিজের চিত্তে যে ভগবান স্ফুরিত হন, নিজ চিত্তে স্ফুরিত ভগবানের আশ্রিতভাবে

যিনি সর্বভূতকে দর্শন করেন, তিনি ভাগবতোত্তম। বৃন্দাবনের তরুলতা কৃষ্ণপ্রেমে সমৃদ্ধ, পুষ্প ফলভারে অবনত, শাখা প্রশাখা সন্তানসন্ততির মত প্রণত হয়েছে। মধুধারা-ছলে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করছে, অঙ্গে তাদের রোমোদ্গম, অঙ্কুরছলে তারা রোমাঞ্চ ধারণ করেছে। ব্রজের গোপরমণী কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হৃদয় নিয়ে তাদের দর্শন করে এই ভাবই প্রকাশ করেছেন। শ্রীযমুনার মধ্যেও গোপবালারা নিজেদের কৃষ্ণপ্রেম লক্ষ্য করেছেন। কৃষ্ণের বেণুনাদ শুনবার পরে মদন বিকারে শ্রীযমুনার আবর্তছলে গতি মন্থর হয়েছে। তরঙ্গবাহু দিয়ে মুকুন্দচরণ যুগলকে আলিঙ্গন করে নিজ বক্ষের সুরভিত কমলরাজি প্রেমে উপহার দিয়েছে। গিরিরাজ গোবর্ধনের মধ্যে নিজ প্রেম দর্শন করেছেন। এ দৃষ্টি উত্তম ভক্তের।

উত্তম ভাগবতের আর একটি লক্ষণ, ভগবানের মধ্যে সর্বভূত দর্শন, নিজ উপাস্যে যিনি সর্বভূতের সত্তাকে দর্শন করেন—যেমন মা যশোমতী কৃষ্ণের মৃদ্ভক্ষণলীলাতে তাঁর বদন মণ্ডলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেছিলেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ অর্থ করেছেন, 'পশ্যেৎ' পদে দেখছে, এ অর্থ নয়। কিন্তু তাদের কৃষ্ণদর্শনের যোগ্যতা আছে এইটিই বুঝতে হবে। অর্থাৎ দর্শনের ইচ্ছা করলে যে কোন সময় দর্শন করতে পারবে। তারা যে সবসময় কৃষ্ণদর্শন করে তা নয়। তাহলে নারদ, ব্যাস, শুক, এদের ক্ষেত্রে অব্যাপ্তি হয়। অর্থাৎ তাঁরা যদি সর্বদা ভগবৎ দর্শন করেন, তাহলে তাঁদের আর উপদেশ করা চলে না। আর তা ছাড়া ভগবৎ-দর্শন কারো বাঁধা

থাকে না। রাধারাণী যে কৃষ্ণপ্রেমরাজ্যে সবচেযে ধনী তাঁরও বিরহ আছে। বিরহ না থাকলে মিলন মধুর হয় না। সর্বত্র সর্বদা যদি কৃষ্ণদর্শন হয় তাহলে তো কৃষ্ণে অরুচি হয়ে যাবে। তাই কৃষ্ণকে সুরস করবার জন্যও ভক্তের কাছে কৃষ্ণ সময় সময় দুর্লভ হন। বিপ্রলম্ভ যোগেই শৃঙ্গাররসের পুষ্টি। কৃষ্ণও তেমনি ভক্তদের কাছে নিজেকে সুরস করবার জন্য মাঝে মাঝে দুর্লভ করেন। কৃষ্ণ নিজে গোপবালাদের কাছে বলেছেন, ভক্তকে দর্শন না দিলে আমার কষ্ট হয়। কিন্তু তবু তাদের দর্শন দিই না, কারণ তাতে তাদের অনুরাগ কমে যাবে। ভগবানের এই স্বভাব সর্বত্র, এমন কি গোপী পর্যন্ত। ভক্তের সর্বত্র ইষ্টদর্শনের যোগ্যতা আছে। কিন্তু উৎকণ্ঠা যখন অত্যন্ত বেশী, তখন দর্শন করে। কামুক ব্যক্তি যেমন জগৎকে কামিনীময় দেখে, ধনকামী যেমন ধনময় জগৎ দেখেন তেমনি ভগবৎদর্শনোৎসুক ভক্ত সমস্ত জগৎকে ভগবন্ময় দর্শন করেন। উত্তম ভক্ত আত্মবৎ সর্বভূতানি পশ্যেৎ। উত্তম ভাগবত সমস্ত জগৎকে ভাবেন সকল ভূতবর্গই আমারই মত ভগবানে প্রেম করে।

মধ্যম ভক্তের লক্ষণে শ্রীযোগীন্দ্র বলেছেন, ঈশ্বরে অর্থাৎ ভগবানে মধ্যম ভক্ত প্রেম করবে এবং তদধীনে এখানে তস্য অধীন, 'তদধীন' এভাবে ব্যাখ্যা করা চলবে না। তাহলে তাঁর সকল সৃষ্টকে বুঝায়। কিন্তু এইভাবে অর্থ করতে হবে, স অধীনঃ যেষাম্, ভগবান যাঁদের অধীন অর্থাৎ ভক্তজন—ভক্তে মৈত্রী, বালিশ জনে অর্থাৎ ভক্তিহীন জনে কৃপা এবং বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্বেষ্টাতে

উপেক্ষা—এইরূপ ভেদ দুটিই মধ্যম ভক্তের চরিত্রে দেখা যায়। উত্তম ভক্তে এরকম কোন ভেদবুদ্ধি নেই, তাঁরা সকলের মধ্যেই ইষ্ট দর্শন করেন। ভগবানে এবং ভক্তজনে যাঁরা বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন, তাঁদের প্রতি মধ্যম ভক্তের থাকবে উপেক্ষা। অর্থাৎ তাঁদের উক্তিতে চিত্ত ক্ষুব্ধ হবে না, অথচ উদাসীন থাকবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে চিত্ত বিক্ষুব্ধ হবে না কেন? এই যে বিষ্ণু-বৈষ্ণবদ্বেষী তারাও তো ভগবৎভক্তিহীন। কাজেই তারাও বালিশ; আর বালিশ বলে তাদের ওপরেও কৃপা আছে, কৃপা আছে বলেই চিত্ত ক্ষুব্ধ হয় না। হিরণ্যকশিপুর ওপরে যেমন প্রহ্লাদের ভাব। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের ওপরে কত পীড়ন করেছেন—পিতাকে বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী জেনেও তাঁর প্রতি প্রহ্লাদ ক্ষুব্ধ হন নি, অজ্ঞ জনে যে নিজের বলদাতা, অশ্রুদাতাকে চেনে না, তার সম্বন্ধে ক্ষোভ করে লাভ কি? এখানে বলবার তাৎপর্য হল, ভগবানে এবং ভক্তে যারা দ্বেষ করে তাতে অভিনিবেশ না থাকা দরকার। এদের উত্তম ভক্তের মত সর্বত্র প্রেমের স্ফূর্তি হয় না। এইজন্যই মধ্যম বলা হয়েছে।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ বলেছেন, ঈশ্বর বলতে নিজের উপাস্য দেবতা, তাঁতে মধ্যম ভক্ত নিষ্ঠাবান হবে। অনেকে বলে থাকেন, আমাদের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ নয়, আমরা সকলকেই ভজি। কিন্তু সকলকে ভজা ভক্তির লক্ষণ নয়, এতে ব্যভিচারিতাই প্রকাশ পায়—প্রেম সর্বত্র হতে পারে না। প্রেম একজায়গাতেই হয়, পতিব্রতা স্ত্রীর যেমন। এই প্রেম ঘনীভূত হয়ে পাঁচটি আকার ধারণ করে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। প্রেম

ঘন না হলে এ চেহারা হয় না। দুধ দিয়ে তো নাড়ু তৈরী হয় না, ক্ষীর দিয়েই নাড়ু তৈরী হয়।

পূর্বের পূর্বেরটি পরের পরের চেয়ে দুর্বল। শান্তরস অপেক্ষা দাস্যরসের উৎকর্ষ। দাস্যরস হতে সখ্যরসের, সখ্যরস হতে বাৎসল্যরসের, বাৎসল্য হতে মধুর রসের উৎকর্ষ। মধুর রসে সকল রসের অবস্থিতি। অতএব মধুর রসই সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রেম অর্থাৎ আসক্তি, আসক্তি না হলে মজা যায় না, না মজলে ভজন হয় না। মজা অবস্থায় ভজন আর না মজা অবস্থায় সাধন। সাধন হল জোর করে ইন্দ্রিয়কে টেনে নিয়ে যাওয়া আর ভজন হল লোভে পড়ে ইন্দ্রিয়ের স্বতঃস্ফূর্ত গতি। ভগবানে আসক্তির অর্থ কি? ভগবানের রূপ, গুণ লীলায় ইন্দ্রিয়সহ আত্মাকে জড়িয়ে নেওয়াই আসক্তি। মধ্যম ভক্ত যে বালিশ জনে কৃপা করবে, কেমন করে কৃপা করবে? জগৎ ভরেই তো মূর্খজন, ভক্তিহীন জন, এর সংখ্যা তো বহু। তাদের সকলকে ধরে ধরে কি কৃপা করবে? কিন্তু রাজর্ষি ভরত, আচার্য বেদব্যাস, দেবর্ষিপাদ নারদ, আজন্মমুক্ত শ্রীশুকদেব, গোস্বামি পাদ, এদের তো সকলকে কৃপা করতে দেখা যায় নি। এখানে সিদ্ধান্ত হল, যে সকল ভক্তিহীন অর্থাৎ বালিশ পাত্রে কৃপা স্বয়ং উদিত হবে, সেইখানেই কৃপা হবে। এখানে কৃপা স্বয়ং কর্ত্রী। শ্রীচক্রবর্তিপাদ বলেছেন, পাহাড়ের এক জায়গায় ঝরণা ঝরে, অন্যত্র শুষ্ক, এর যেমন কারণ নির্ণয় করা যায় না, তেমনি মহাজনের কৃপা ঝরণাও যে কোথায় ঝরবে, আর কোথায় ঝরবে না বলা যায় না; কৃপার ধারাই এই রকম। ভগবানে যারা

দ্বেষ করে, তাদের উপেক্ষা করতে হবে। এখানে কৃপা করা চলবে না, বরং দূর থেকে তার মঙ্গল চিন্তা করাই সদাচার। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, কৃপা করার লক্ষণ তো মধ্যম ভক্তে বলা হয়েছে। তাহলে কি উত্তম ভক্ত কৃপা করবে না? তার উত্তরে বলা যায়, উত্তম ভক্তও কৃপা করবে—যেমন দশম শ্রেণীতে যে পড়ে, তার ভেতরে যেমন ৮ম বা নবম শ্রেণীর ছাত্রের জ্ঞান তো আছেই, উপরন্তু ১০ম শ্রেণীর নিজস্ব জ্ঞান আছে। তেমনি উত্তম ভক্তের মধ্যে মধ্যম ভক্তের লক্ষণ তো আছেই, উপরন্তু সর্বভূতে ইষ্টদর্শনরূপ যে উত্তম ভক্তের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সেটিও আছে। কাজেই মধ্যম ভক্তের কৃপা করা স্বভাবটি উত্তম ভক্তের মধ্যেও আছে। উত্তম ভক্ত ভগবৎদর্শনের উৎকণ্ঠায় তন্ময় হয়ে সর্বভূতে চেতনাচেতনে ইষ্ট দর্শন করে। এ জগতেও দেখা যায়, পুত্রের জন্য মায়ের অত্যন্ত উৎকণ্ঠায়, যে কোন ব্যক্তি এলেই পুত্র আসছে বলে মনে করেন। কিন্তু সে ব্যক্তি পুত্র হয় না, কারণ এ জগতের তন্ময়তা মিথ্যা। আর ভগবানের দর্শনের উৎকণ্ঠায় ভক্তের সর্বভূতে ভগবৎদর্শন হয়, কারণ ও জগতের তন্ময়তা সত্য। লোহা কালো এবং কঠিন। তার এ গুণের কিছুতেই পরিবর্তন হয় না। একমাত্র অগ্নিতে যদি লোহাকে নিক্ষেপ করা যায়, তাহলে লোহার কাল রং কঠিনত্ব চলে গিয়ে লাল ও তরল হয়, তেমনি আমাদের এ প্রাকৃত মায়িক ইন্দ্রিয় লোহার মত। তাকে যদি সচ্চিদানন্দময়ী ভক্তি অগ্নিতে নিক্ষেপ করা যায়, তাহলে ভক্তি অগ্নির, সচ্চিদানন্দের স্পর্শ তাতেও লাগবে। তখন আমাদের প্রাকৃত

ইন্দ্রিয়ও সচ্চিদানন্দময় হয়ে উঠবে। অমৃতসাগরে স্নান করতে পারলে সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়। কিন্তু স্নান করাই কঠিন। মায়িকতা ছেড়ে আমরা থাকতে পারি না। উত্তমতা আমাদের সয় না। বিষ্ঠার কৃমিকে গোলাপে স্থান দিলে সে তা সহ্য করতে পারে না, সরে গিয়ে আবার বিষ্ঠাতেই বসে। অগ্নি যেমন সর্বভূক্, কোন কিছু গ্রহণ করতে তার বাধে না, তেমনি সচ্চিদানন্দময়ী ভক্তিও সব জিনিষকেই, যা কিছুই তার সংস্পর্শে আস্থক না কেন, সকলের ওপরে নিজের বরণ ধরিয়ে দেয়। যে ভক্তের সর্বভূতে ভগবৎ-দর্শন-যোগ্যতা গুণটি এখনও প্রকাশ পায় নি, অথচ এই চারিটি লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, সে হল মধ্যম ভক্ত। উত্তম ভক্তে মধ্যম ভক্তের চারটি লক্ষণ তো দেখা যায়ই, উপরন্তু সর্বভূতে ভগবৎ দর্শন লক্ষণটি তার নিজস্ব আছে। মধ্যম ভক্তে যখন সর্বভূতে ভগবৎ-দর্শনযোগ্যতা প্রকাশ পাবে, তখন সে-ই হবে উত্তম ভক্ত। নারদ, ব্যাস, শুক প্রভৃতি এই উত্তম ভক্তের উদাহরণ।

এইবার শ্রীযোগীন্দ্র কনিষ্ঠ ভক্ত বা প্রাকৃত ভক্ত সম্বন্ধে লক্ষণ করছেন। ভক্তের স্তরবিচারে উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ অথবা প্রাকৃত—কারণ ভক্ত কখনও অধম হয় না। গৌরগোবিন্দ পদাশ্রিত ব্যক্তি কখনও অধম হতে পারে না—হরিবিমুখাঃ অধমাঃ। কনিষ্ঠ ভক্ত প্রতিমাতে হরি অর্চনা করেন, কিন্তু ভক্ত বা তদ্ ভক্তের আরাধনা করেন না। প্রকৃতি=প্রারম্ভ অর্থাৎ অধুনা প্রারম্ভ ভক্তি। এই প্রাকৃতভক্তই শীঘ্র উত্তম ভক্ত

হবে। কনিষ্ঠ ভক্তের প্রতিমাতেই শ্রদ্ধা, অন্যত্র শ্রদ্ধা নেই। অন্যত্র শ্রদ্ধা—এ-কথার অর্থ কি? শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য আছে ঃ

ব্রাহ্মণ আচণ্ডাল কুক্কুরান্ত করি
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি।
এই সে বৈষ্ণব ধর্ম সবারে প্রণতি
সেই যে ধর্মধ্বজী যার ইথে নাহি মতি॥

আরও বলেছেন, 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান'। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রাকৃত ভক্ত সেটি করে না কেন? শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ বলেছেন—ভগবৎপ্রেমাভাবাৎ ভক্তমাহাত্ম্য-জ্ঞানা-ভাবাচ্চ। তাদের এখনও ভগবানে প্রেমসম্পত্তি লাভ হয় নি। ভগবানে প্রেম হলে তবে ভক্তমহিমা জানা যায় কনিষ্ঠ ভক্তের ভগবানে প্রেম হয় নি। তাই ভক্তমহিমাও জানেন না। দুর্বাসা ঋষি সুদর্শন চক্রের তাপে তপ্ত হয়ে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে কোথাও স্থান পেলেন না। পরে বৈকুণ্ঠনাথের কাছে কৃপা পেয়ে যখন মহারাজ অম্বরীষের কাছে ফিরে এলেন, তখনই ভক্ত অম্বরীষের মহিমা জানতে পারলেন। ঋষি বলছেন ঃ

অহো অনন্তদাসানাং মহত্ত্বং দৃষ্টমদ্য মে।
কৃতাগসোঽপি যদ্ রাজন্ মঙ্গলানি সমীহসে॥ ভা. ৯।৫।১৪

আহা আজই আমার অনন্তদাসের মহিমা দৃষ্টিগোচর হল··· বৈষ্ণব দেখলেই বৈষ্ণব চেনা যায় না, ভগবৎকৃপা হলে বৈষ্ণব চেনা যায়।

সকলকে আদর করাই ভক্তের গুণ। প্রাকৃত ভক্তের এই

লক্ষণটি এখনও প্রকাশ পায় নি। গোলাপের কুঁড়িতে গোলাপের সৌন্দর্য সুরভি সব প্রকাশ পায় না। উদীয়মান চন্দ্রসূর্যে পূর্ণ প্রকাশমান চন্দ্রসূর্যের দীপ্তি সম্ভব নয়, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তা প্রকাশ পায়। শিববাক্যে আছে ঃ

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্॥

সকল দেবতার আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা বড়। আবার তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ আরাধনা আছে দেবি—সেটি হল তাঁর ভক্তের আরাধনা। ঈশ্বর-আরাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে কি না, তাতে সন্দেহ আছে। কিন্তু ভক্ত-আরাধনায় যে সিদ্ধিলাভ হবেই এটি নিশ্চিত। ঠাকুরের ঠাকুর আমার বৈষ্ণব গোঁসাই। ইন্দ্রদ্যুম্নরাজা বিষ্ণু-আরাধনায় রত ছিলেন। এমন অবস্থায় অগস্ত্য মুনি অতিথি হলেন। রাজা বিচারে ভুল করেছেন, পূজা সেরে তারপর অতিথির সমাদর করতে এসেছেন, তাতে তাঁর অপরাধ হয়েছে। যার ফলে রাজার হস্তি গজেন্দ্র জন্ম হল। শিব জগদ্‌গুরু, তিনিও কৃষ্ণের অভিন্ন তত্ত্ব সঙ্কর্ষণ ভক্ত-তত্ত্ব পূজা করেন, সঙ্কর্ষণ পূজে শিব তাই তো তাঁর অঙ্গে সর্পের ভূষণ। পার্বতী নিত্য অর্বুদ নারী নিয়ে পাতালে যান সঙ্কর্ষণ পূজা করতে। ইষ্ট-বিস্মৃতি যাতে না হয়, তাই সর্পধারণ, ইষ্ট-বিস্মৃতিই মৃত্যু। ইষ্ট যেন কখনও বিস্মরণ না হয়। এরই নাম বুদ্ধিমত্তা।

ভক্তদেহে ভগবানের গুণ সঞ্চারিত হয়। কনিষ্ঠ ভক্তের ভক্তি সবে মাত্র আরম্ভ হয়েছে। তাই এখনও তার সকল

গুণ আরম্ভ হয় নি। শ্রদ্ধাপূর্বক হরি অর্চনা করেন কনিষ্ঠ ভক্ত। এ শ্রদ্ধা শাস্ত্রার্থাবগতির ফলে নয়। তা যদি হত তাহলে এই কনিষ্ঠ ভক্তে অর্চা শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তে আদর লক্ষণটি প্রকাশ পেত। কনিষ্ঠ ভক্ত তাহলে এ শ্রদ্ধা কোথায় পেল? এ শ্রদ্ধা লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত। যে ব্যক্তির ভগবানে প্রেম জন্মায় নি, অথচ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন তাঁকে মুখ্য কনিষ্ঠ ভক্ত বলা হবে। আর যাঁর শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা নয়, কেবল মাত্র লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধা তিনি হলেন কনিষ্ঠের কনিষ্ঠ ভক্ত। ভক্ত আদর করা ছাড়া ভক্তিরসের আস্বাদন হয় না।

ভক্তের তিনটি স্তর বিচারের পর দ্বিতীয় যোগীন্দ্র উত্তম ভক্তের আরও কয়েকটি লক্ষণ বলেছেন। জগতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধ—এই পাঁচটি বিষয় আছে। তার আবার বিভিন্ন প্রকার। আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় এই পাঁচটি বিষয়কে নিরন্তর গ্রহণ করছে। কর্মফল যার যেমন সে তেমনি বিষয় ভোগ পায়। পিপাসা কিন্তু কারও মেটে না। বিষয় না পেলেও মনে মনে বিষয় ভোগ হয়—উত্তম ভক্ত প্রায়শঃ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করে না। যদি কেউ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ না করে মায়ার রাজ্য থেকে সরে যেতে চায়, তখন মায়া তার কাম ক্রোধাদি শত্রুকে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়। মায়ার রাজ্য যাতে অটুট থাকে সে ব্যবস্থা করবার জন্য মায়ার রাজ্যে রূপাদি পঞ্চক ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। উত্তম ভক্তের চিত্ত শ্রীবাসুদেবে আবিষ্ট তাই তারা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগ করে না। মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যোগ হলে তবে বিষয় ভোগ হয়।

উত্তম ভক্তের মন বাসুদেবে লেগে আছে। অমৃতসাগরে মন ডুবে গেলে সে মন যেমন সেখান থেকে তুলে প্রাকৃত মরুর তপ্ত বালুকায় দেওয়া যায় না, তেমনি শ্রীবাসুদেবাবিষ্ট চিত্তও উত্তম ভক্ত তুলে নিয়ে বিষয়ভোগে লাগাতে পারে না। তাহলে এইটিই সাব্যস্ত হল যে, উত্তম ভক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগ করে না। আর যদি বা কখনও করতে দেখা যায় তাহলে সেখানে বিষয় গ্রহণের যে স্বাভাবিকতা তার খণ্ডন করা হচ্ছে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করলে হয় দ্বেষ, না হয় তোষ, দুটির একটি হবেই। বাসনা পূরণ না হলে দ্বেষ এবং পূরণ হলে তোষ অর্থাৎ সন্তোষ হবেই। কিন্তু উত্তম ভক্তের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ হলেও তার দ্বেষ বা তোষ হয় না। কিন্তু এটি কেমন করে হয়? আগুনে হাত দিলে হাত তো পুড়বেই। উত্তম ভক্তের যে দ্বেষ বা তোষ হয় না, তার একটিমাত্র কারণ হল— তারা ভালভাবেই জানে যে এই জগতের সবই বিষ্ণুমায়া। তাই জেনে কিছুতেই বস্তুবুদ্ধি করে না। বস্তুবুদ্ধি না হলে দ্বেষ বা তোষ হয় না—মৃদ্‌গজভানবৎ। মৃত্তিকার হাতীতে যেমন অজ্ঞ শিশুই বস্তু জ্ঞান করে প্রলুব্ধ হয়, বিজ্ঞজন কিন্তু তাকে অবস্তু বলে জানে, তেমনি উত্তম ভক্ত জগতের সকল বস্তুকেই ত্যাজ্য বলে জানে। এগুলি যে বস্তু নয়, সে বোধ তার আছে। কাজেই সেটি পেলেও তোষ হয় না, না পেলেও রোষ হয় না। তবে যে সে বিষয় গ্রহণ করে সে কেবলমাত্র জাগতিক লোক ব্যবহার জানবার জন্য। প্রহ্লাদজী দৈত্যবালকদের কাছে বলেছেন:

অসারসংসারবিবর্তনেষু মা যাত তোষং প্রসভং ব্রবীমি।

অসার সংসারে সার বুদ্ধি করাটি পেঁপে গাছে জল ঢেলে তক্তা করবার আশা করার মত। অসারে সার বুদ্ধি করেই স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি কর্তব্য বোধ এসে পড়ে। কর্তব্য পালন করে পরে দেখা যায় সংসার কেবল ফাঁকিই দিয়েছে। এ জগতের সবটাই দুঃখের ছবি, সুখের রঙ দিয়ে কেবল চোখে ধরা হয়। সবই দুঃখের এই মনে করে সবটাই ত্যাগ করতে হবে। উত্তম ভক্তের কোন আসক্তি নেই, আসক্তিই তোষ বা রোষের কারণ। তাই তাদের তোষ বা রোষ কোনটাই হয় না। গুণময়ী বহিরঙ্গা মায়ার রঙ্গ হেয়। বহিরঙ্গা মায়া-শক্তিতে মজে থাকলে অন্তরঙ্গা শক্তির আস্বাদ হয় না। উত্তম ভক্ত এই বহিরঙ্গা মায়াশক্তির আসক্তি ত্যাগ করেছে। তাই অন্তরঙ্গা শক্তির আস্বাদে সে বিভোর হয়ে আছে। এই কারণেই তাকে উত্তম ভক্ত বলা হয়।

সংসার ধর্মের দ্বারা এ জগতে সকলেই মোহগ্রস্ত হন। কিন্তু যিনি হন না, তিনিই ভাগবতপ্রধান। তাদের চিত্ত শ্রীহরির স্মরণ দ্বারা আবিষ্ট। তাই তাঁরা মুগ্ধ হন না। যেমন মন্ত্রের দ্বারা গা বাঁধা থাকলে সাপের কাছে গেলেও সাপে ছোবল মারতে পারে না, তেমনি শ্রীহরিস্মরণে গা বাঁধা থাকলে সংসারধর্মরূপ সর্প দংশন করতে পারবে না। ফলে তার মোহও হবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সংসারধর্ম কাকে বলে? সংসার ধর্ম হল রোগের উপসর্গের। উপসর্গ কৃষ্ণবিমুখতা অনাদিকালের। এটি হল আদি রোগ। তার ফলে মায়ার আক্রমণ, কৃষ্ণপাদপদ্ম অর্চনা

ছাড়া মায়া ছাড়ে না। সংসারধর্ম বলতে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার নিয়ে গৃহে বাস করা। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, বুদ্ধি এদের কাজের নামই সংসারধর্ম। দেহের কাজ জন্ম এবং মৃত্যু, প্রাণের কাজ ক্ষুধা পিপাসা, মনের কাজ ভয়, বুদ্ধির কাজ তৃষ্ণা। আর ইন্দ্রিয়ের কাজ শুধু পরিশ্রম করা। ইন্দ্রিয় তো নিজে ভোগ করতে জানে না, মন ভোগ করে, ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ করে পরিশ্রম করে মাত্র। এরই নাম সংসারধর্ম। এর কোনটির দ্বারা যে ব্যক্তি মুহ্যমান হন না তিনিই উত্তম ভক্ত। উত্তম ভাগবত মনে করেন—সুখ দুঃখ, শুভ অশুভ দুইই ভগবানের দান। হিতৈষী পিতা যেমন সময়ে পুত্রকে নিমপাতার রস খাওয়ান, আবার সময়ে যেমন ক্ষীরের বাটি মুখে ধরেন, তেমনি বিশ্বপিতা ভগবান জীব-সন্তানকে কখনও দণ্ড দেন আবার কখনও পুরস্কার দেন। এ জগতে পুরস্কার আমার পাওনা নয়, যদি কখনও পুরস্কার পাওয়া যায়, সেটি করুণার দান।

ভক্তের জন্মমৃত্যু গতাগতি কৃষ্ণ ইচ্ছায়। জন্মমৃত্যুর ক্লেশ ভগবদ্দাসকে সহ্য করতে হয় না। মহাজন প্রেমানন্দ দাস বলেছেন ঃ

প্রেমানন্দ কহে এই মরিলে না মরে সেই
কৃষ্ণ কৃষ্ণ সদা যাঁর মুখে।
কোথা তার কর্মবন্ধ প্রেমে মত্ত সদানন্দ
গতায়াত মাত্র নিজ সুখে॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় উদাহরণ দিয়েছেন, বিড়ালীদন্তস্পর্শেন অর্ভকানামিব, বিড়ালী তার শাবকদের দাঁত দিয়ে

ধরে নিয়ে যায়, তাতে শাবক ব্যথা তো পায়ই না, বরং সুখ অনুভব করে। আবার সেই বিড়ালী যখন তার ঐ একই দাঁত দিয়ে ইঁদুর ধরে, তখন ইঁদুর বুঝে তার দাঁতে কত ধার, ইঁদুরের দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়, তেমনি অভক্ত জন্মমৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করে। ভক্ত তার এক বিন্দুও ভোগ করে না। বলা আছে—'ন কর্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাং বিদ্যতে'। বিষ্ণুভক্তিতে রত ব্যক্তির সংসার ক্রমে ক্রমে লয় পায়। এই ক্রম শুনে হতাশ হবার কিছু নেই। এটি পদ্মপত্রশতভেদন্যায়ে এত দ্রুত হয় যে নিমেষমাত্রে সংসার লয় পায়। ভক্তের জন্মমৃত্যুতে যদি ক্লেশ থাকত তাহলে ভক্ত জন্মমৃত্যু নিরোধ প্রার্থনা করতেন। কিন্তু তা তো করেন নি। বরং জন্ম প্রার্থনা করেছেন :

আসিব যাইব চরণ সেবিব।

ভক্ত চান : তুমি আর নিত্যানন্দ বিহরিবে যথা।

এই কর জন্মে জন্মে ভৃত্য হই তথা॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুও ভক্ত আবেশে বলেছেন :

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাৎ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।

—শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্

ভক্তের জন্মমৃত্যু কর্মফলের পাওনা নয়, এটি ঘটে ভগবদিচ্ছায়। উত্তম ভক্ত প্রভুর স্মরণে আবিষ্ট, তাই তাদের মনে ভয় থাকে না। হরি-সিংহ যার হৃদয়গুহায় সর্বদা বর্তমান —তার তো কামাদি হস্তীর ভয় থাকতে পারে না। ভক্তের প্রাকৃত বিষয়ে তৃষ্ণা নেই। তাই তৃষ্ণাতে সে মুগ্ধ নয়। এ জগতের ইন্দ্রিয় শুধু খেটেই যায়, কিছু পায় না, তারা ভোক্তা

নয়—মনই ভোক্তা—কিন্তু ভক্তের সচ্চিদানন্দ তনুতে সব ইন্দ্রিয়ই ভোক্তা। তারা প্রত্যেকেই সচেতন। তাই তারা শ্রীগোবিন্দের রূপরসাদি যা কিছু গ্রহণ করে তাকেই ভোগ করে। তাদের মায়িকতা ত্যাগ করে চিন্ময়তা লাভ করে। প্রতি ইন্দ্রিয়ই তাদের গোবিন্দবিষয় ভোগ করে। তাই তাদের ক্লেশ নেই। এইভাবে দেখা যায়, সংসারধর্ম ভক্তেরও আছে, কিন্তু হরির স্মরণে তাঁদের মোহ হয় না। তাই দ্বিতীয় যোগীন্দ্র বললেন— যিনি ভাগবত-প্রধান অর্থাৎ উত্তম ভাগবত তিনি সংসারধর্মের দ্বারা বিমুগ্ধ হন না। দেহে অহংবুদ্ধি এবং দৈহিক বস্তুতে যাদের মমতাবুদ্ধি জাগে না তারাই উত্তম ভাগবত। জন্মের দ্বারা, কর্মের দ্বারা, বর্ণ, আশ্রম জাতির দ্বারা দেহে অহংকার আসে। বর্ণ হল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র : আশ্রম হল ব্রহ্মচারী, গৃহস্থী, বানপ্রস্থী, সন্ন্যাসী, জাতি অম্বষ্ঠ প্রভৃতি—এ সব অহংকার দেহে আসে—এ অহংকার থেকে যিনি মুক্ত তিনিই উত্তম ভাগবত।

ভক্তমাত্রই ভগবানের প্রিয়, বিশেষ করে উত্তম ভাগবত। ভগবানের ভক্তপক্ষপাতিত্ব শাস্ত্র স্পষ্টত দেখিয়েছেন। কিন্তু এ পক্ষপাতিত্বটি দোষ তো হবেই না, বরং পরম গুণ হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এ দোষটি তাঁর অঙ্গের ভূষণ করেছেন। যেমন রাধারাণী গুরুগঞ্জনা কৃষ্ণকলঙ্ককে নিজ অঙ্গের ভূষণ করেছেন। ভাগবতোত্তম সম্বন্ধে আরও বেশী কথা হল যার চিত্তে কাম, কর্ম, বীজ জন্মায় না—অহংকার তার দেহে লাগেই না। শ্রীজীবপাদ বলেছেন, এতাভির্যস্য অস্মিন্ দেহে অহংভাবো ন সজ্জতে কিন্তু ভগবৎসেবোপয়িকে সাধ্যে দেহে এব সজ্জতে।' এই প্রাকৃত

দেহে অহংভাব লাগে না বটে, কিন্তু সাধকের ধ্যানে যে চিন্ময় দেহ আছে তাতে এই অহংকারটি লেগে থাকে যে, এই সিদ্ধ দেহটি আমার দেহ, এই দেহ দিয়ে ভগবৎসেবা করব···ইত্যাদি। প্রাকৃত দেহে জন্মকর্মাদির দ্বারা যে অহংকার লিপ্ত হয়, তা নিত্য নয়, কারণ দেহান্তে সে অহংকার আর থাকে না। কিন্তু সেবার উপযোগী যে সাধ্য চিন্ময় দেহ তাতে যে অহংভাব তা নিত্য। সে দেহের বিনাশ হয় না। এখন প্রশ্ন হতে পারে, সাধ্য দেহ তো চিন্ময়, জীবাত্মা অণুচৈতন্য, কিন্তু সাধ্য দেহ তৈরী করতে যে পরিমাণ চিৎ প্রয়োজন, অণুচৈতন্য জীবাত্মা সে চিৎ কোথায় পাবে? যাঁর কাছে চিতের ভাণ্ডার তিনি যদি দান করেন, তাহলে জীব এ চিৎ পেতে পারে। চিৎ-এর ভাণ্ডারী হলেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনিই কৃষ্ণনাম গৌরনাম দান করেন— এইটিই চিৎসম্পর্ক। নাম এবং স্বরূপ অভিন্ন, তাই নামের সম্পর্কেই চিৎ ভগবৎস্বরূপের সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে যায়। এইভাবে যতবার কৃষ্ণনাম, গৌরনাম উচ্চারণ করা যায়, ততই চিৎ জমা হয়। যত বেশী এই নাম করা যাবে ততই চিৎ সংগ্রহ হবে। সাধক এই প্রাকৃত দেহে থেকে নাম উচ্চারণের দ্বারা এই দেহের ভিতরে ভিতরে একটি ভগবৎসেবোপযোগী সাধ্য চিন্ময় দেহ তৈরী করে নেন সকলের অলক্ষ্যে। মা যেমন সকলের অলক্ষ্যে সন্তানের দেহটি নিজের রসরক্ত দিয়ে ধীরে ধীরে পুষ্ট করে তোলেন। লোকের দৃষ্টির আড়ালে এই কাজটি হতে থাকে, পাছে লোকের দৃষ্টি পড়লে তাতে অনিষ্ট হয়। এইভাবে মাতৃগর্ভে শিশুর দেহ যখন সম্পূর্ণ পুষ্ট হয়ে যায়, তখন মায়ের

দেহ থেকে সেটি পৃথক হয়ে পড়ে। মায়ের দেহ এবং শিশুর দেহ, দুটি আলাদা হয়ে যায়, তেমনি সাধকের এই প্রাকৃত দেহের মধ্যে যখন চিন্ময় দেহ সম্পূর্ণ পুষ্টিলাভ করে তখন এই প্রাকৃত দেহের আবরণ ভেঙে সে বেরিয়ে পড়ে। প্রাকৃত দেহ ভাঙা অর্থাৎ দেহের প্রাকৃতত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ হয়ে সম্পূর্ণ চিন্ময়ত্ব লাভ করা। সাধকের এই চিন্ময় দেহের গঠনও সকলের অলক্ষ্যে ঘটে। অন্যের দৃষ্টিতে তার ব্যাঘাত হতে পারে। সাধক যখন সাধনপথে অগ্রসর হয় তখন কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পরেই তাতে রঙ ধরে, যেমন কাঁচা আমে সবুজ রং থাকে, তাতে যখন জ্যৈষ্ঠ মাসের তাপে রং ধরে, তখন তাকে আর কাঁচা বলা যায় না-- সে পাকাই অবশ্য সম্পূর্ণ পাকা না হলেও পাকবার পথে। একদিন সে সম্পূর্ণ পেকে যাবে, সাধকের অবস্থাও ঠিক একই রকম। দুই প্রকারের সাধক আছেন, অসিদ্ধ ও সিদ্ধ। সিদ্ধ দেহলাভ করে যাঁরা এই প্রাকৃত দেহ ত্যাগ করেন তাঁরা আবার পরে যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন চিন্ময় দেহেই জন্মগ্রহণ করেন। আর যাঁদের অসিদ্ধ অবস্থাতেই দেহত্যাগ হয়, তাঁরা যখন আবার জন্মগ্রহণ করেন, তখন পূর্বজন্মে যতটা সিদ্ধ হয়েছেন তার পর থেকে অগ্রসর হন। পূর্বজন্মের সাধন তাঁর বিফল হয় না। এই দেহেই মানুষের মধ্যে চলে ফিরে বেড়ান বটে, কিন্তু তাঁরা এ জগতের মানুষের মত নন। প্রাকৃত দেহে থাকার সময় সাধকের সিদ্ধদেহের ভাবনা নিরন্তর থাকে এবং সেই সিদ্ধদেহেই ভগবৎসেবা-যোগ্যতার অহংকার থাকে।

ভক্ত সম্বন্ধেই হরির প্রিয়তা বিধান করা হয়েছে। কোন

ধাতুকে ঢালাই করতে গেলে আগে একটা মাটির ছাঁচ তৈরী করতে হয়। ধাতু গলিয়ে সেই মাটির ছাঁচে ঢেলে দেওয়া হয় এবং যতক্ষণ সেই ধাতুপাত্রটি শক্ত না হয়, ততক্ষণ তাকে তোলা হয় না। যখন শক্ত হয়ে যায়, তখন বাইরে থেকে মাটির ছাঁচকে ভেঙে ফেলা হয় এবং ধাতুপাত্রকে বার করে নেওয়া হয়। সাধনের ব্যাপারেও তেমনি শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-বন্দনের দ্বারা যে চিন্ময়তা লাভ—এটি এখনও তরল আছে, অর্থাৎ অপক্ক অবস্থা মাটির ছাঁচরূপ এই প্রাকৃত দেহে ঢেলে দেয় সাধক। যতক্ষণ সে চিন্ময়তা ঘন বা জমাট না হয়, ততক্ষণ এই প্রাকৃত দেহ যায় না। যখন ভেতরে সেই চিন্ময় দেহ জ'ম জমাট হয়ে যায়, তখন বাইরের আবরণ এই প্রাকৃত দেহের বিনাশ ঘটে। অর্থাৎ তখন সাধকের প্রাকৃতত্ব একেবারে চলে যায়। তখন তার দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার সব চিন্ময় হয়ে যায়। এই চিন্ময় দেহের অহংকার নিত্য।

যে ব্যক্তির সম্পদে অথবা দেহে আপন পর ভেদ নেই, সম্পদ—'ইদং মম নেদং তব—অর্থাৎ আপন বিত্তে পর বুদ্ধি কিন্তু পরবিত্তে আত্মবুদ্ধি নয়, আর পরের শরীরেও নিজের শরীরের মত প্রীতি। উত্তমভক্তের সর্বভূতে সম দৃষ্টি। প্রহ্লাদজী বলেছেন, জগতে হাতি, ঘোড়া রাজা, প্রজা এ পৃথক্ দৃষ্টি তো থাকবেই; তাহলে তারা সমান হবে কেমন করে? উত্তম ভাগবত সর্বজীবে আপন অঙ্গবৎ বুদ্ধি করে তাই তাদের পরবুদ্ধি একেবারেই নেই। সকল জীবে তাঁর নিজের অঙ্গের মতই আদর। উত্তম ভাগবত শান্ত অর্থাৎ যার ছোটাছুটি বন্ধ হয়েছে।

বাসনায় তাড়িত হয়ে যে ব্যক্তি স্বর্গাদির লোভে লুব্ধ হয় না, এইরকম লক্ষণ যাঁর প্রকাশ পেয়েছে তিনিই উত্তম ভাগবত।

ভগবৎপাদপদ্মযুগল থেকে যাঁর চিত্ত অর্ধনিমেষকালও সরে আসে না, শাস্ত্র বললেন, তিনি উত্তম ভাগবত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে চিত্ত সরে আসবে কেন ? ত্রিভুবনের বৈভব যদি তাদের দান করা যায়, তাহলে তাদের চিত্ত বিচলিত হয় না। ত্রিভুবন বলতে ঊর্ধ্ব, মধ্য এবং অধোলোক অথবা স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেছেন, 'ত্রিভুবনবিভবায় কিমুত তদ্ধেতবে' ইত্যর্থঃ। ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য অথবা তার হেতু যদি আসে, তাতেও উত্তম ভক্তের ভগবৎস্মৃতি কুণ্ঠিত হয় না। জাগতিক সুখদুঃখে আমাদের কৃষ্ণধ্যান কুণ্ঠিত হয়। ধ্যান কোনও রকমে একটু লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে পাতলা হয়ে যায়। আর উত্তম ভক্তের কাছে ত্রিভুবনের ঐশ্বর্যও যদি 'আমায় গ্রহণ কর' বলে প্রার্থী হয়ে দাঁড়ায়, তাহলেও তাঁর চিত্ত ভগবৎপদারবিন্দ থেকে মুহূর্ত-কালেব জন্যও বিচলিত হয় না। কারণ উত্তম ভক্ত বিচারে স্থির করেছেন যে ভগবৎপদারবিন্দ ছাড়া এ জগতে অন্য কোন সার বস্তু নেই। হীরের বস্তা পেলে তাম্র খণ্ডের লোভে যেমন কেউ ছোটে না, এও তেমনি। কৃষ্ণপাদপদ্ম জগতে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু। তার কাছে জগতের যে কোন বস্তু তুচ্ছ। এই বোধই প্রকৃষ্ট বোধ। ভগবান উদ্ধবজীকে বলেছেন,—'এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ'। এ জগতে মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি হচ্ছে কেমন করে সবচেয়ে বড়লোক হব। তা সে যেমন করেই হোক, ঠকিয়ে হোক। বঞ্চনা করে হোক। ভগবান মানুষের এ

বৃত্তিটির প্রশংসা করেন। সবচেয়ে বড়লোক কেমন করে হওয়া যায়, এ বৃত্তিটি ভাল। তবে সবচেয়ে উত্তম সম্পদটি কি, এটি জানবার জন্য আমাদের নৈমিষারণ্যে যেতে হবে। ষাট হাজার ঋষির সামনে সেখানে বলা হয়েছে, কৃষ্ণপাদপদ্মই একমাত্র সবচেয়ে উত্তম বস্তু। এটি যদি কেউ লাভ করতে পারে তাহলে তার মত বড়লোক আর কেউ হবে না। এখানে কাকে ঠকিয়ে বড়লোক হবে! মায়াকে ঠকিয়ে কৃষ্ণপাদপদ্ম অধিকার করে সবচেয়ে বড়লোক হতে হবে। এতদিন মায়া ঠকিয়েছে, এখন মায়াকে ঠকাতে হবে। কল্পতরুর কাছে গিয়ে কেউ যদি সোনা দানা চায় তাকে যেমন মূর্খ বলা হয়। গীতাবাক্যে বলা আছে ঃ

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ গীতা ৫।২২

প্রাকৃত যে কোন বিষয় হোক না কেন—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি সবই সান্ত এবং সাদি অর্থাৎ তার উৎপত্তি এবং বিনাশ আছে; কোনটিই অনন্ত এবং আদ্য নয় এবং সবই দুঃখশোকপ্রদ। কাজেই বুধ অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা নিয়ে আনন্দ করেন না। কিন্তু গোবিন্দবিষয়রসভোগ স্বপ্রকাশ, তাতে ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণের দরকার হয় না। তাই সংস্পর্শজ ভোগ নয়। অতএব এতে দুঃখের স্থান নেই এবং এটি অনন্ত। কারণ সূর্য যেমন স্বপ্রকাশ, গোবিন্দবিষয়ভোগ তেমনি স্বপ্রকাশ, সাধনগম্য নয়। সূর্য দেখতে হলে যেমন সূর্যের আলো দিয়েই দেখতে হয়, অন্য আলো দিয়ে দেখা যায় না, তেমনি ভগবৎ

স্বরূপের যে কোন ভোগ ভগবানেরই কৃপা দিয়ে ভোগ করতে হবে। অন্য কোন সাধন দিয়ে তাঁকে দেখা বা পাওয়া যায় না। ভগবানের কাছে চাইতে যদি কিছু হয় তাহলে এমন জিনিষই চাইতে হবে যাতে আঁচল ভরে যায়, আর অন্য দুয়ারে আঁচল পাততে না হয়। মহাজন বলেছেন :

কৃষ্ণ যদি মনে করে ব্রহ্মপদ দিতে পারে
হেন কৃষ্ণ ভূল কি কারণে
দেখ যাঁর শ্রীচরণ ধ্যান করে পঞ্চানন
তথাপি প্রত্যয় নাহি মনে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব মাঝে মাঝে ভক্তচরিত্র বর্ণনা করেছেন। এর অভিপ্রায় কি ? ভক্ত ভগবান উভয়কে নিয়েই ভগবানের ভগবত্তা। ভক্তকে বাদ দিয়ে ভগবানের ভগবত্তা ফোটে না— ভগবান সলীল। লীলা রসাশ্রিত ব্রহ্মই ভগবান। ভগবৎতত্ত্ব ভক্তের মধ্যে অন্তর্গত। তাই ভাগবতে ভক্তকথা বললেন। শ্রীরাসলীলাতেও দেখা যায় ভগবানের (কৃষ্ণের) চেয়ে ভক্তের (গোপীদের) কথাই বেশী বলা হয়েছে। শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত যা কিছু ভক্তচরিত্রেই ফুটে ওঠে। ভক্তমাল গ্রন্থে নরসী ভক্তের উপাখ্যান আছে। নরসী বাবা আশুতোষের কাছে অন্য কোন সম্পদ প্রার্থনা করেন নি। বলেছিলেন— বাবা তোমার বিচারে যেটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ সেইটি আমাকে দাও। ভোলানাথ তাঁকে সকলের চেয়ে উত্তম বস্তু কৃষ্ণভক্তি দান করেছিলেন। উত্তম ভাগবতও তেমনি ঠকে বুঝে শিখেছে যে, ভগবৎ পদারবিন্দের চেয়ে উত্তম বস্তু আর কিছু জগতে নেই।

তাই ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য অথবা সে ঐশ্বর্য লাভের হেতুও যদি এসে উপস্থিত হয়, তাহলেও তার চিত্ত লব নিমিষার্ধকালও ভগবৎ-পদারবিন্দ থেকে চ্যুত হয় না।

উত্তম ভক্তের চিত্ত যে বিচলিত হয় না—তার কারণ কি? বস্তু যখন হাল্কা হয়, তরল হয়, তখনই তা নড়ে। বিষয়বাসনা অগ্নির দ্বারা চিত্ত সন্তপ্ত হলে চিত্ত হাল্কা হয়, তরল হয়, তখন চিত্ত নড়ে। কিন্তু চিত্ত শীতল হয়ে গেলে আর নড়ে না। জল যেমন তরল তপ্ত অবস্থায় চঞ্চল কিন্তু হিমশীতল বরফ অচঞ্চল। উত্তম ভাগবতের চিত্ত অচঞ্চল। এই শীতলতা তারা কোথায় পায়? ভগবানের নখরমণির যে তাপহারিণী দীপ্তি, সেই চন্দ্রিকায় তাদের চিত্ত শীতল হয়ে গেছে, শান্ত হয়েছে, তাই কামনা-অগ্নি সেখানে আর তাপ দেবে কেমন করে? যেমন আকাশে যখন পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে তখন দিনের প্রখর সূর্যের তাপ আর কষ্ট দিতে পাবে না। জগতের বাসনা হল কুহকিনী। এর হাতে যে পড়েছে তার ভরাডুবি। বিষয়ের সন্ধানে জীব নিরন্তর এই বাসনার পেছনে ছুটছে। উত্তম ভাগবতের পক্ষে এই বাসনার তাপ নিবে গেছে। সে নিষ্কাম, ছোটাছুটি তার বন্ধ হয়েছে, কৃষ্ণভক্তের অন্তরে কোন কামনা নেই। ভগবৎ-পাদপদ্মের ধ্যানে তার চিত্ত শান্ত হয়ে গেছে। অন্তকেরও অন্তক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম। কোন ভাগ্যবান যদি ভগবানের চরণের এই শীতলা দীপ্তির স্পর্শ অনুভব করেন, তখন তার আর অন্য বস্তুতে আসক্তি থাকে না। আমাদের সে পাদপদ্মের সঙ্গে পরিচয় নেই। তাই অন্য বস্তুতে বে-জায়গায় হাত পড়ে। ভূতগ্রস্ত

ব্যক্তি যেমন স্বরূপে থাকে না, ফলে অখাদ্য মড়ার কয়লা খাদ্য বলে গ্রহণ করে, আমরাও তেমনি অবিদ্যা-ভূতাবিষ্ট। তাই প্রাকৃত রূপরসাদি অখাদ্য গ্রহণ করি, প্রকৃত খাদ্য যে হরিগুণ-গান, তা গ্রহণ করি না।

উত্তম ভাগবতের শেষ লক্ষণটি যোগীন্দ্র বললেন—ভক্ত কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ত্যাগ করে না। এ তো অনেক দূরের কথা—হরি স্বয়ং যার হৃদয় সাক্ষাৎভাবে কখনও ত্যাগ করেন না, যে হরির নাম অবশে উচ্চারণ করলে অনাদিকালের পাপরাশি সমূলে বিনষ্ট হয়, অন্যমনস্ক হয়েও যদি হরির নাম উচ্চারণ করা যায় তাহলেও সমস্ত পাপ চলে যায়, অন্যমনস্ক হয়ে আগুনে হাত দিলে যেমন হাত পুড়ে যায়—এও তেমনি। মহাজনও বলেছেন, 'সর্ব্বমহা-প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।' স্ত্রী পুত্রের নাম উচ্চারণচ্ছলে, পরিহাসচ্ছলে, গানে আলাপে, হেলায় শ্রদ্ধায় যিনি যেমন করেই ভগবানের নাম উচ্চারণ করুন না কেন, তাতেও সর্বপাপের বিনাশ হবে।

এখন কেউ যদি প্রশ্ন করেন, বহুদিনের বহু সঞ্চিত পাপ একবার মাত্র নাম উচ্চারণে ক্ষালন হবে কি করে? অনেক দিনের জমা অন্ধকার দূর করতে যেমন অনেক দিন ধরে আলো জ্বালতে হয় না, একবার আলো জ্বাললেই বহুদিনের সঞ্চিত অন্ধকার দূর হয়ে যায়, তেমনি বহুদিনের সঞ্চিত পাপ একবার নাম উচ্চারণেই নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু অন্ধকার যাতে আর ঘরে প্রবেশ না করে এজন্য ঘরে আলো জ্বালিয়ে রাখতে হবে। আলো নিবতে দিলে চলবে না। তেমনি পাপ-অন্ধকার

আর যাতে হৃদয়-ঘরে প্রবেশ না করে সেজন্য জিহ্বায় নামের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হবে।

ভগবান হরি যার হৃদয় থেকে সাক্ষাৎ সরে যান না, তিনিই উত্তম ভাগবত। এখানে 'সাক্ষাৎ' কথাটির সার্থকতা হল, ভক্ত সাক্ষাৎ ভাবে সর্বদা চিত্তে ভগবানের স্ফূর্তি উপলব্ধি করবে। ভগবান অসাক্ষাতে তো কারো হৃদয়ই ত্যাগ করেন না। সেটি ভক্ত বা অভক্ত বলে কোন কথা নেই, কিন্তু ভক্তহৃদয়ে ভগবান সাক্ষাৎভাবে স্ফূর্তি পান এবং প্রতিক্ষণে ভক্ত তা উপলব্ধি করেন। ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের লোভ লেগেছে—তাই ভক্ত-হৃদয় ভগবান কখনও ত্যাগ করতে পারেন না। ভগবানই যখন ছাড়তে পারেন না, তখন কল্মষকুঞ্জরাণাং কা বার্তা? কল্মষকুঞ্জর কেমন করে সেখানে স্থান পাবে?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভক্তহৃদয় ত্যাগ করে ভগবান চলে যান না কেন? ভগবান তো যেতে চানই না, তার ওপর ভক্ত তাকে প্রেম রজ্জুতে বেঁধেছে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি আসক্তি, কেউ কাউকে ছাড়তে পারে না। ভক্ত তো ভক্তিমান বটেই, এটি ভক্তের স্বাভাবিক অবস্থা কিন্তু 'ভগবান ভক্তো ভক্তিমান'। ভগবানের এটি নূতন বিশেষণ। এ বিশেষণ ভগবানের একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রই দিয়েছেন, অন্য কেউ দেয় নি। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ বলেছেন, অবশে হরি উচ্চারণেরই এত ফল, আর যারা সরসে হরির নাম উচ্চারণ করে, তাদের না জানি কত ফল! ভগবান জগতের তাবৎ জীবকে মায়ার শৃঙ্খলে বেঁধেছেন। এখন তিনি যেন তাদের বলছেন, তোমরা আমাকে বাঁধ। কি

দিয়ে বাঁধবে—প্রেমশৃঙ্খলে বাঁধ। জীব অণুচৈতন্য—তাই তাকে মায়া-শৃঙ্খলে বাঁধা যায়। কিন্তু ভগবান বিভুচৈতন্য তাই তাঁকে প্রেমশৃঙ্খলে বাঁধতে হয়। মা যশোমতী তাঁব নীলমণি নয়নের মণিকে প্রেমরজ্জু দিয়ে উদুখলের সঙ্গে বেঁধেছিলেন। ভগবান প্রেমের বশ, এই প্রেমরজ্জুতে যিনি ভগবানের চবণপদ্ম বাঁধেন, তিনিই উত্তম ভাগবত। ভক্ত অনুভব করবেন ভগবান নিত্য তাঁর হৃদয়ে স্ফূর্তিমান। এইটিই উত্তম ভক্তের সার লক্ষণ।

তৃতীয় প্রশ্ন

উত্তম ভক্তের লক্ষণপ্রসঙ্গে মহারাজ নিমি যোগীন্দ্রের কাছে শুনেছেন উত্তম ভক্ত বিষয় গ্রহণ করেও অবিক্ষুব্ধ-চিত্ত থাকেন, দ্বেষ বা আনন্দ হয় না, কারণ তাঁরা প্রতিটি বস্তুকেই মায়া অর্থাৎ মিথ্যা বলে জানেন। বিষয় গ্রহণ করলেই তার স্বাভাবিকতা হল হয় দ্বেষ না হয় আনন্দ। এ জগতের এইটিই নিয়ম। কিন্তু উত্তম ভাগবত তা করেন না। কারণ তিনি জানেন যে, এ জগতের কোনটিই বস্তু নয়, সবই অবস্তু। তাঁরা বস্তুতে বস্তু বুদ্ধি করেছেন। কাজেই অবস্তু গ্রহণে দ্বেষ বা রাগ কোনটিই তাঁদের হয় না। সবটাকেই তাঁরা মায়া বলে জানেন। তাই তাতে আসক্ত হন না। জগতের অবস্তুকে আমরা বস্তু বোধ করি। তাই তাতে আসক্ত হই, রাগ দ্বেষ অনুভব করি। মায়া বলে উত্তম ভক্ত মনে করে বা জানে তা নয়, মায়া তারা চোখে দেখে। 'বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্'—ঐন্দ্রজালিকের টাকা দেখে যেমন বুদ্ধিমান ব্যক্তির আনন্দ হয় না, তেমনি এ জগতের সুখের সামগ্রী বা দুঃখের সামগ্রী কোনটিতেই উত্তম ভক্ত আসক্ত হন না। আসক্তি না থাকলে দ্বেষ বা প্রীতি কিছুই হয় না। নিমিরাজের উত্তম ভক্তের এই মায়াদর্শকতার লক্ষণ থেকে জানতে ইচ্ছা হল, এ মায়া কি? তৃতীয় যোগীন্দ্র অন্তরীক্ষ এর জবাব দেবেন। মহারাজের আজ মায়া জানতে লোভ হয়েছে। কারণ উত্তম ভক্তের লক্ষণে রাজা দেখেছেন, তাঁরা

মায়া চেনেন, জানেন। তাই মায়াকে দূরে সরাতে পেরেছেন। আর সরাতে পেরেছেন বলেই তাঁরা উত্তম ভাগবত হয়েছেন। রাজার লোভ কেন? মায়া যদি চিনতে পারি, তাহলে তাকে সরাতে পারলে আমিও উত্তম ভাগবত হতে পারব। মায়া জীবের স্বরূপ-বিচ্যুতি ঘটিয়েছে। মায়াকে জানতে পারলে তো কাজ মিটে গেল। দুধে জলে মেশান থাকলে, জল চিনতে পারলে দুধ থেকে জলকে আলাদা করা যায়। তেমনি চিৎ ও জড় (মায়া) এ জগতে মেশামেশি হয়ে আছে। কাজেই মায়াকে চিনতে পারলে চিৎ থেকে জড়কে বাদ দিয়ে চিৎ (ভগবান) নিতে পারা যাবে। এই মায়া কার?

অন্তরীক্ষ যোগীন্দ্র উত্তর দিলেন ঃ

পরস্য বিষ্ণোরীশস্য মায়িনামপি মোহিনীম্। ভা. ১১।৩।১

শ্রীগোবিন্দও গীতাবাক্যে বলেছেন ঃ

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। গীতা ৭।১৪

মায়া হতে যিনি ভিন্ন তাঁরই মায়া হবে। মায়া মুগ্ধ যে, মায়া তো তার হতে পারে না। ছাতা লাঠি কাপড় গয়না যেমন আমার বলা হয়, অর্থাৎ আমার থেকে ভিন্ন, তেমনি ভগবানের মায়া অর্থাৎ মায়া ভগবানের থেকে ভিন্ন। বিষ্ণু তাই মায়াধীশ। তিনি ঈশ্বর সর্বনিয়ন্তা—জীব চৈতন্যও তো সেই পরমেশ্বরের, ভগবানের অংশ। তাহলে সেও তো মায়ার অতীত। কিন্তু তা নয়, জীব মায়াবশ—মায়াধীশ নয়। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের তৃতীয় স্কন্ধের কপিল ভগবানের বাক্যের টীকায় স্বামিপাদ বলেছেন—পুরুষ দুই প্রকার ঃ জীব ও পরমেশ্বর। প্রকৃতিকে

অধীন করেন যিনি সর্বনিয়ন্তা, তিনি ঈশ্বর। আর প্রকৃতির অধীন হয়ে যে 'সংসরতি', পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যু-কবলিত হয়ে গতাগতি করে, সে হল জীব। এ মায়া যে শুধু জীবকে মুগ্ধ করে তা নয়, মায়ীরও মোহিনী। দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস, অসুর, শিব, ব্রহ্মা—সকলেরই মায়া আছে। তাই সকলেই মায়ী, কিন্তু বিষ্ণুমায়া এদেরও মুগ্ধ করে। ব্রহ্মা শিবকেও বিষ্ণুমায়া মুগ্ধ করে। শিব বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ—এ কথা শিব ঋষি দুর্বাসাকে জানিয়েছেন—'বিদাম ন বয়ং সর্বে যন্মায়াং মায়য়াঽবৃতাঃ। বিষ্ণুমায়া বিভিন্ন প্রকার—যে বিষ্ণুমায়া শিব ব্রহ্মাকে মুগ্ধ করে সে মায়া জীবকে মুগ্ধ করবার জন্য দরকার হয় না। যার যেমন দাম তাকে সেই রকম দিতে হয়। কেউ হয় ত চার পয়সা পেলে খুশি হয়, কাউকে আবার সাম্রাজ্য দিয়েও তুষ্ট করা যায় না। কৃষ্ণমায়া কৃষ্ণতত্ত্ব বলদেবকেও মুগ্ধ করে। বিষ্ণুমায়া দুই প্রকার—যোগমায়া এবং গুণময়ী মায়া। কৃষ্ণবিমুখ জীবকে মুগ্ধ করা মহামায়া বা গুণময়ী মায়ার কাজ। আর কৃষ্ণ-উন্মুখকে মুগ্ধ করা যোগমায়ার কাজ। যে যেমন অধিকারের জীব তাকে বশীভূত করতে সেই প্রকার মায়া প্রয়োজন। শিবকেও বিষ্ণুমায়া মুগ্ধ করে। আর সামান্য জীবকেও মায়া মুগ্ধ করে। তাই জীব আর শিব এক—এ কথা বলা চলবে না। কারণ মায়ার তারতম্য আছে, এই মায়াকে জেনে নিতে পারলে তবে জীবের নিষ্কৃতি।

যোগীন্দ্রের শ্রীমুখ থেকে হরি কথারূপ অমৃত সেবা করছেন মহারাজ নিমি। তাঁরা হরিকথা ছাড়া অন্য কোন কথা বলেন

না। সেই স্বভাবে মহারাজের যে প্রশ্ন, 'মায়া কি', এর উত্তরেও যোগীন্দ্র যা বলবেন, তাতেও হরিকথামৃতই মিশ্রিত থাকবে।

তৃতীয় যোগীন্দ্র শ্রীঅন্তরীক্ষ মায়া কাকে বলে এ প্রশ্নের জবাব দেবেন। অন্তরীক্ষ শব্দে আকাশকে বুঝায়, অর্থাৎ যেটি ভূলোক ও দ্যুলোকের মাঝখানে অবস্থিত। অর্থাৎ যারা মায়া-কবলিত নয়, আর যারা নিত্য অথবা সিদ্ধি লাভ করে পার্ষদ-শ্রেণীভুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠাদি ধামে গমন করেছেন, তাঁরাও নন। এঁদের মধ্যে কেউ উপদেশ করতে পারবেন না। ভগবানের নিজের পক্ষেও নিজের কথা উপদেশ করা সম্ভব নয়। মায়া কবলিত যাঁরা তাঁরা মায়ার মধ্যে থাকেন, কাজেই মায়ার কাজ তাঁরা জানেন না। অতএব এই দুই-এর মাঝামাঝি যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের পক্ষে মায়া কাকে বলে এ উপদেশ করা সম্ভব। তাই অন্তরীক্ষ যোগীন্দ্র মায়া কাকে বলে এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। মায়া নিরূপণ কাজটি অসম্ভব। ঘট পট বাস বিছানা যেমন দেখান যায়, মায়াকে সেই ভাবে এইটি মায়া, এই রকম করে দেখান যায় না। কাজেই সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় কাজের দ্বারা বর্ণনা করতে হবে। সৃষ্টি স্থিতি লয় কাজের দ্বারা রজঃ সত্ত্ব এবং তমোগুণকে বুঝা যাবে এবং গুণকে বুঝলে গুণময়ী মায়াকে বুঝা যাবে। এখানে অন্তরীক্ষ যোগীন্দ্র সৃষ্টির গূঢ় কথা বলেছেন :

> এভির্ভূতানি ভূতাত্মা মহাভূতৈর্মহাভুজ।
>
> সসর্জোচ্চাবচান্যাদ্যঃ স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে॥ ভা. ১১।৩।৩

ভূতাত্মা মহাভূতের দ্বারা ভূত সৃষ্টি করলেন, ভূতাত্মা অর্থাৎ সর্বান্তর্যামী তিনি আদ্য। বলা আছে—'জগৃহে পৌরুষং

রূপমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া।' ভগবান প্রথমে লোক সৃষ্টির মানসে পৌরুষরূপ গ্রহণ করলেন। পৌরুষরূপ অর্থাৎ পুরুষের গঠন। 'জগৃহে' পদের দ্বারা সন্দেহ হতে পারে যে ভগবানের পৌরুষরূপ ছিল না—সৃষ্টি কাজের জন্য তিনি সে রূপ গ্রহণ করলেন। তাহলে বেদান্ত যা বলেছেন, সেইটিই সত্য বলে মনে হয়—'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।' সাধকের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ-কল্পনা, এ রূপ মায়িক, কিন্তু সৃষ্টি অনাদি, অর্থাৎ এর গোড়া খুঁজে যাওয়া যায় না। কেবলমাত্র মহাপ্রলয়ের পরে সৃষ্টি বলে আদ্য শব্দ বসান হয়েছে। তা না হলে সৃষ্টি অনাদি। আর ভগবান যে পুরুষরূপ গ্রহণ করলেন, বস্তু যদি না থাকে, তাহলে তার গ্রহণ হয় কেমন করে? অবিদ্যমানস্য বস্তুনঃ গ্রহণাসম্ভবাৎ। কাজেই বুঝতে হবে পুরুষরূপ ছিল, ভগবান লোক সৃষ্টির মানসে সে রূপ গ্রহণ কবলেন। ভগবানই সৃষ্টিকর্তা—মায়া এই সৃষ্টির উপাদান—কর্তা নয়। মায়া উপাদানকারণ, ভগবান নিমিত্তকারণ। নিমিত্ত কারণ সর্বদা চেতন হবে—কার্য পেলে উপাদানকারণকে নিশ্চিত পাওয়া যাবে, কিন্তু নিমিত্তকারণকে পাওয়া যেতেও পারে নাও পারে। তাই মায়ার কার্য জগতের যে কোন জিনিষ পেলে মায়া উপাদান-কারণ পাওয়া যায়, কিন্তু নিমিত্তকারণ ভগবানকে পাওয়া যায় না—বহিরঙ্গা মায়াশক্তিই উপাদানকারণ। ঘট ধরলে যেমন উপাদানকারণ মাটিকে পাওয়া যায়, কিন্তু নিমিত্তকারণ কুম্ভকারকে পাওয়া যায় না। তেমনি জগতের বস্তু পেলে মায়া পাওয়া যায় বটে, কিন্তু নিমিত্তকারণ ভগবানকে পাওয়া যায় না।

এই সৃষ্টিতত্ত্বপ্রসঙ্গে শ্রীতৃতীয়ে বলা হয়েছে—ক্ষুভিত প্রকৃতিতে কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষাবতার সৃষ্টির বীজস্বরূপ ঈক্ষণ নিক্ষেপ করলেন—উচ্চাবচ, দেব, তির্যক্ ইত্যাদি। সৃষ্টি-কাল মহত্তত্ত্বকে বিকৃত করে অহঙ্কারতত্ত্বে পরিণত করল। এই অহঙ্কারতত্ত্ব আবার ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। তামসিক অহঙ্কার থেকে শব্দাদির সৃষ্টি—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। এই পঞ্চমহাভূত ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন। মহারাজ নিমিকে অন্তরীক্ষ যোগীন্দ্র বলছেন—সৃষ্টির তাৎপর্য জীবকে ভগবৎ প্রাপ্তি করান। ভগবানের সৃষ্টিকাজের হেতু দেখান হয়েছে স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে—'স্ব' পদের দ্বারা জীবকে বুঝাচ্ছে। কারণ স্বাংশ, ভগবানের অংশ, হল জীব। মাত্রাপ্রসিদ্ধি এবং আত্মপ্রসিদ্ধি—মাত্রা বলতে বিষয়কে বুঝায়, অর্থাৎ বিষয়-প্রসিদ্ধি, অর্থাৎ বিষয়ভোগ এবং ভগবৎপ্রাপ্তি—এই দুটি কাজের জন্য জীবসৃষ্টি। আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ ব্রহ্মলোক থেকে আরম্ভ করে তৃণ-গুল্ম পর্যন্ত যে কেউ যে কোন বিষয়ভোগ করুক না কেন পঞ্চ বিষয়ের মধ্যে পড়ে। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—এই পাঁচটি তার ভোগ্য বিষয়। এখন কথা হচ্ছে জীব তো চিৎকণ—সে কেমন করে বিষয় ভোগ করবে? জীব তো অণু-চৈতন্য। তার দেহ, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি কিছুই নেই। তার কোন অঙ্গ নেই। কারও সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। তার পক্ষে বিষয় ভোগ তো সম্ভব নয়। ভগবান পরম দয়ালু। তাই করুণা করে জীব সৃষ্টি করে তার দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি দান করলেন বিষয়ভোগের জন্য।

এখন প্রশ্ন হতে পারে জীবের এ বিষয়ভোগের প্রয়োজন কি ? ভগবান তো ইচ্ছা করেন জীব তাঁকে লাভ করুক। বিষয়ভোগ করে বিষয় ত্যাগের জন্য তাগাদা কেন ? একেবারে বিষয়ভোগ না করলে কি ক্ষতি ছিল ? পাঁকে নেমে পা ধোওয়ার কি দরকার ? একেবারে পাঁকে না নামলেই হয়। 'প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরম্'—জীবকে মায়াপঙ্কে নামানোর কি দরকার ছিল ? ঈশ্বর যদি অজ্ঞ এবং অকরুণ হতেন তাহলে না হয় এটি করতে পারতেন। কিন্তু তা তো নয়, ঈশ্বর তো সর্বজ্ঞ। জীবের কি প্রয়োজন তা তিনি খুব ভাল জানেন। আর জীবের প্রতি ভগবান অযাচিত কৃপাকারী। এই সর্বজ্ঞতা এবং কারুণ্য দুটি গুণই ভগবানের আছে বলে তাঁকে ভজনা না করে উপায় নেই। এ জগতে দেখা যায় হাত পা ভেঙে গেলে মিস্ত্রী কাঠের হাত পা তৈরী করে দেয়। কিন্তু মিস্ত্রী খুব সুদক্ষ নয় বলে কাঠের হাত পা শরীরের সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে দিতে পারে না, কাঠের হাত পা বলে বুঝা যায়। কিন্তু তাই দিয়ে কাজ করতে করতে অভ্যাস হয়ে যায় এবং নিজেরই হাত পা বলে মনে হয়। কিন্তু অবিদ্যা মায়ার মিস্ত্রী কাঠের হাত পায়ের মত মহাভূতনির্মিত হাত পা এমন করে চিৎ আত্মার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন যে, আর বুঝবার উপায় নেই যে, ঐগুলি আমার নয়। এমন নিখুঁত করে মেশান যে তাই দিয়ে বিষয়ভোগ করে মনে হয়, আমিই বিষয় ভোগ করছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, জীবের এই বিষয়-ভোগের কি দরকার ? জীবকে বিষয়ভোগ করান যদি দোষের হয়, তাহলে ঈশ্বরকে দোষী বলতে হয়। ঈশ্বর জীবকে মায়ার

মধ্যে ফেলে আবার মায়া থেকে উঠবার তাগাদা দিয়েছেন কেন? ভগবানের উপদেশ বাণী :

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। গীতা ১৮।৬৬

আরও বলেছেন :

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। গীতা ৭।১৪

জীবকে মায়ার মধ্যে ডুবিয়ে আবার মায়া হতে উদ্ধারের তাগাদা কেন? ভগবান জীবকে দিয়ে ধীরে ধীরে চুরাশী লক্ষ জন্ম ধরে যে বিষয় ভোগ করিয়েছেন, তার ভিতর একটি গভীর উদ্দেশ্য আছে। সদ্যোজাত শিশুকে যেমন শুধু দুধ খাওয়ান হয়—কারণ দুধের মধ্যে সকল খাদ্যের সার দেওয়া আছে। দুধ খাইয়ে খাইয়ে ছ'মাস বয়স পর্যন্ত তাকে অন্যান্য খাদ্য গ্রহণের উপযোগী পাকস্থলী তৈরী করিয়ে নেওয়া হয়। ছ'মাস বয়সের আগে তার কাছে সব খাদ্যই গুরুপাক। তখন তার পাকস্থলী কোন খাদ্যই নিতে পারে না। আস্তে আস্তে দুধ খেতে খেতে সমস্ত খাদ্যের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তারপর অন্নপ্রাশনের দিন তাকে অন্ন দেওয়া হয়, কিন্তু সেদিনও থালা ভরে তাকে অন্ন দেওয়া হয় না। তেমনি জীবাত্মার পক্ষে অন্ন হল হরিগুণকীর্তন। ভগবানের আস্বাদ যদি জীবকে প্রথমেই দেওয়া যায়, তাহলে জীব তা গ্রহণ করতে পারবে না; জীব সদ্যোজাত শিশুর মত। তার পাকস্থলীর পক্ষে ভগবানের আস্বাদ চিদানন্দ আস্বাদ বড় গুরুপাক। তাই দুধের মত পঞ্চবিষয় তাকে চুরাশী লক্ষ জন্ম ধরে ভগবান গ্রহণ করিয়ে করিয়ে তাকে বিষয় গ্রহণের বোধ করিয়ে দিয়েছেন। এগুলি মায়ার বিষয় বটে, কিন্তু জীবাত্মা তো নিত্য

শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাব—তার তো কোন বিষয়গ্রহণের বোধ ছিল না, বিষয়ের আস্বাদ সে জানত না। বিষয়-আস্বাদ যদি না জানে তাহলে গোবিন্দবিষয় কেমন করে গ্রহণ করবে? রসের বোধ করাবার জন্য ভগবান যে জীবকে মায়ার বিষয় দান করেছেন, এটিও জীবের প্রতি মহান উপকারই করা হয়েছে। মায়ার বিষয় ভোগ করে করে জীবের রসবোধ হচ্ছে—এর পরে সে রসময়কে ভজবে। চুরাশী লক্ষ জন্মের পরে যে মনুষ্য জন্ম, এইটি অন্নপ্রাশনের দিন। যে ব্যক্তির ক্ষুধা হয় নি, সে যেমন অন্নকে ভজে না, তেমনি রসবোধ না হওয়া পর্যন্ত জীব রসময়কে ভজবে না। সেই রসবোধকে জাগানোর জন্যই ভগবানের মায়ার বিষয় দান।

মহাপ্রলয়কালে কারণার্ণবশায়ী ভগবানের অঙ্গে অসংখ্য জীবচৈতন্য অস্ফুট অবস্থায় থাকে, তারা তখন মূর্ছিত অবস্থায় থাকে, তাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। বাতাস-জল দিয়ে কে তার মূর্ছা ভাঙবে? ঈশ্বর-করুণাই তার মূর্ছা ভাঙ্গাবে। স্থাবর জঙ্গমাদি ভ্রমণ করান হল বাতাস-জল দেওয়া। অন্য সব দেহে একটু একটু রসানুভব পেয়ে যখন জীব মানুষ হয়েছে তখন জঙ্গম অবস্থায় সে স্ফুটচৈতন্য। অস্ফুটচৈতন্য থেকে স্ফুটচৈতন্যে আনা বড় দয়ার কাজ। রসবোধের চৈতন্য ফুটিয়ে তুলবার জন্য চুরাশী লক্ষ যোনি জীবকে ঘোরান হয়েছে। সরকারী চাকরিতে যেমন আগে চারিদিকে মফস্বলে ঘুরিয়ে শেষে রাজধানীতে এনে রাখা হয়, এও তেমনি চুরাশী লক্ষ দেহ ঘুরিয়ে শেষ পর্যন্ত মনুষ্য-

দেহরূপ রাজধানীতে রাখা হয়েছে শ্রুতিস্তুতির পূর্বে শ্রীশুকদেব বলেছেন ঃ

বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃ প্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ।
মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেঽকল্পনায় চ॥ ভা. ১০।৮৭।২

ঈশ্বর যে জীবকে এই বুদ্ধি,ইন্দ্রিয় মন প্রাণ দিয়েছেন,এই মায়িক সৃষ্টিও কত উপকারে লেগেছে। অস্ফুটচৈতন্যের স্বরূপ মায়ার দ্বারা আবৃত, তাকে জাগাতে হবে। কি জন্য ? (১) মাত্রার্থম্, অর্থাৎ বিষয়ভোগের জন্য। (২) ভবার্থঞ্চ, ভব মানে জন্ম অর্থাৎ জন্মের জন্য। এর লক্ষ্য হল কর্ম, অর্থাৎ বেদবিহিত কর্মের জন্য। (৩) আত্মনে, অর্থাৎ সুখভোগের জন্য। (৪) অকল্পনায়, অর্থাৎ কল্পনা-নিবৃত্তির জন্য। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু শেষের কারণটিই আসল কারণ যার জন্য জীব সৃষ্টি হয়েছে। জীবের যে আত্মবুদ্ধি হারিয়ে গেছে তা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সৃষ্টি। কল্পনা-নিবৃত্তি, অর্থাৎ মুক্তি লাভ, অর্থাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্যই যদি জীবের সৃষ্টি হয় তাহলে পূর্বের ৪টি কারণ বলা হল কেন ? কারণার্ণবশায়ী ভগবানের দেহে জীব লীন আছে বটে, কিন্তু সে ভগবানকে পায় না, যেমন আমাদের দেহে অসংখ্য কৃমি কীট আছে কিন্তু তারা আমাদের রসের খবর রাখে না, এও ঠিক তেমনি। মহাপ্রলয়ে স্রোতের টানে অসংখ্য জীব ভগবানের (কারণার্ণবশায়ী) দেহে আশ্রয় নিয়েছে বটে, কিন্তু ভগবানের তত্ত্ব-রস সম্বন্ধে তাদের জানা সম্ভব হয় নি, কারণ ভজন না করলে মায়া নিবৃত্তি হয় না। ভজন করলে তবে মায়া নিবৃত্তি হয়। ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরে কোটি কোটি জীব থেকেও মুক্ত হয় না। ভজনেই ভগবানের প্রতি

ভালবাসা হয়। ভজন করে ভগবানকে ভালবাসলে তবে জীবের মুক্তি। নিজেকে জানাবার জন্যই ভগবানের জীবকে নিজ অঙ্গ থেকে পৃথক করতে হল; মায়ার সাগরে তাদের ফেলতে হল। ভজন করলে তবে কল্পনা নিবৃত্তি হয়। ভগবান ভিন্ন যে কোন জাগতিক বস্তু—যেমন আয়ু, গৃহ, ধন, বিদ্যা, স্ত্রী, পুত্র—সবই হল ভগবানকে বাদ দিয়ে সুখের কল্পনা। আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত এই যে সুখকল্পনা এটি যখন নিবৃত্ত হবে তখনই মুক্তি। সুখ নামে যে বস্তুটি সেটি ভগবানের পাদপদ্ম ছাড়া আর কোথাও থাকবে না বলে চুক্তি করেছে। তাই ভগবানকে বাদ দিয়ে আমরা যে কোন বস্তুকে সুখ বলে ধরতে যাই না কেন, সুখ পাই না। 'বাসুদেবঃ সর্বম্'—এই বোধ যখন হবে তখনই আসল মুক্তি। মায়িক বস্তুতে যখন মায়াবুদ্ধি হবে তখনই মুক্তি।

জীব নিজেকে বড় বুদ্ধিমান মনে করে, কিন্তু সে বুদ্ধিমান তো নয়ই বরং বড় মূর্খ। কারণ যদি প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধিমান হত তাহলে সবচেয়ে ভয়ের বস্তু যে মৃত্যু তাকে নিবারণের চেষ্টা করত। মৃত্যুকে নিবারণ না করা পর্যন্ত নিস্তার নেই। ক্ষণ-ভঙ্গুর বস্তু দিয়ে কখনও সুখভোগ হয় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কল্পনার নিবৃত্তিই সৃষ্টির তাৎপর্য। মৃত্যু-নিবারণ না হলে সুখ হয় না। হিরণ্যকশিপু তাই মৃত্যুর পথ বন্ধ করতে গিয়েছিলেন। এখন কথা হচ্ছে মৃত্যু নিবারণের উপায় কি? যার মৃত্যু নেই, তার আশ্রয় নিতে হবে। মৃত্যু একমাত্র গোবিন্দ হতেই ভয় পায়, গোবিন্দান্ মৃত্যুর্বিভেতি। এ জগতের কোনটিই সুখ ভোগ নয়। মিছরির সরবতে কাঁচের টুকরো মেশান থাকলে

যেমন সেটি দুঃখেরই কারণ হয়, তেমনি এ জগতের যে কোন সুখ ভোগে (যাকে আমরা সুখ বলে মনে করি) মৃত্যুর কণ্টক মেশান আছে। তাই সেটি সুখের না হয়ে দুঃখেরই কারণ হয়। ধন, পুত্র, মান, মর্যাদা কোনটিই সুখের হয় না, কারণ তাতে মৃত্যুর কাঁটা মেশান আছে। এ জগৎ সুখের কল্পনা দিয়ে তৈরী, সুখ দিয়ে তৈরী নয়। তাহলে চারিদিকে এই যে মায়ার বিষয় ভোগের মধ্যে ভগবান জীবকে রেখেছেন—তাহলে জীবকে কি তিনি ঠকিয়েছেন? জীব এ জগতে সুখের কল্পনার পেছনে ছোটে। জীব সুখ খোঁজে, পুত্রকে সুখ বলে ভাবে কিন্তু পুত্রকে পায় না—পুত্রের কল্পনাকে পায়। পুত্রের কল্পনা যদি না থাকত তাহলে পুত্রগত সুখলিপ্সা হত না। পুত্রের মধ্যে সুখ খুঁজে খুঁজে যখন জীব সেখানে সুখ তো পায়ই না বরং আঘাত পায়, তখন আঘাত খেয়ে খেয়ে সে যশোদার পুত্রকে ভালবাসতে যায়। জগতের মায়িক সুখের কল্পনা, সত্যকার রূপ-রসাদি যা মৃত্যুকবলিত নয়, তার সন্ধানে উৎসুক করবে। জগতে সুখের কল্পনার আস্বাদ না থাকলে নিত্য শাশ্বত সুখের অনুসন্ধান হত না। ভগবানকে পুত্র, সখা, প্রাণপতি, সুহৃৎ, ভ্রাতা—সকল সম্বন্ধই করা যায়।

জীব তো অসঙ্গ—তার তো পতিপুত্র কোনও সম্বন্ধের বোধ নেই। ভগবান তাই এই সম্বন্ধের বোধ জাগাবার জন্য জগতে মাতা-পিতা, পতি-পুত্র দিয়েছেন। জগতের পতি-পুত্রের ভাল-বাসায় আবদ্ধ হবার জন্য পতি-পুত্রের সৃষ্টি নয়। কিন্তু তাদের ভালবাসা বুঝে নিয়ে সেই ভালবাসা ভগবানে দেবার জন্যই

ভগবানের এই বিভিন্ন সম্বন্ধের সৃষ্টি। গহনার catalogue-এ হার চুড়ি বালার ছবির নমুনা আঁকা থাকে। তার নীচে ঠিকানা লেখা থাকে, কোথায় সেই গহনা পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই আঁকা-গহনার নমুনা অঙ্গে পরা তো যাবেই না, পরতে গেলে ছিড়ে যাবে, উপরন্তু ঠিকানা পর্যন্ত ছিড়ে যাবে। প্রকৃত হার পেতে হলে আঁকা-হারটি নিয়ে ঠিক ঠিকানায় যেতে হবে তবে পাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু গহনা কিনতে হলে তো মূল্য চাই। এখানে মূল্য কি? মহাজন বলেছেন, লৌল্যমেব মূল্যমেকলম্। জগতের সুখে কোথাও তৃপ্তি নেই। যিনি জগৎ তৈরী করেছেন, তিনি কি তাকে নিত্য শাশ্বত করে তৈরী করতে পারতেন না? পুত্রকে কি চিরজীবী করে রাখতে পারতেন না? নিষ্কণ্টক পুত্রসুখ রাজ্যসুখ ভোগ করাতে পারতেন না? পারতেন, কিন্তু করেন নি। ভগবান মহামায়াকে আদেশ দিয়ে রেখেছেন, জগতের প্রত্যেকটি সুখভোগের সামগ্রীতে কাঁটা ফুটিয়ে রাখবে। কারণ জগতের সুখ যদি নিষ্কণ্টক হত তাহলে ভগবানের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত না। জগতের কোনটিই সুখ নয়, সুখের আভাস অর্থাৎ সুখ বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে সুখ নয়। সুখাভাস কখনও নিখুঁত হয় না। এখানকার সুখ নিখুঁত হলে তাতেই চিত্ত লুব্ধ হয়ে যাবে, তখন আর ভগবৎপাদপদ্ম কেউ ভজবে না। জীবের হৃদয়ে ভগবানকে মনে পড়াবার জন্য ভগবান জগতের সুখকে নিখুঁত করেন নি। কৃষ্ণ-আস্বাদনের সুখ তো কখনও ফুরাবে না। 'সুখময় কৃষ্ণ করেন সুখ আস্বাদন।' শ্রীবৃন্দাবন সুখধাম কৃষ্ণের নিত্য বসতিভূমি। কোথাও না

কোথাও রূপের জ্ঞান না হলে কৃষ্ণরূপ বা গৌররূপ শুনবার জন্য মন লুব্ধ হবে না। মাত্রার্থ অর্থাৎ বিষয়ভোগটি পরবর্তী ভবার্থ অর্থাৎ বেদবিহিত কর্মের হেতু। বিষয়ভোগজাত সুখ অত্যন্ত ক্ষণিক বোধ হয়েছে তাই সে বিষয়ভোগে তৃপ্ত হয় নি। সেই ভোগজনিত আনন্দকে দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্য জীবের বেদবিহিত কর্মে প্রবৃত্তি। বেদবিহিত কর্ম করে, বহু পুণ্য অর্জন করে, স্বর্গে গিয়েও তৃপ্তি হল না। পুণ্যক্ষয়মাত্রে আবার তার পতন হল। সুখ লাভ আর হল না, দুঃখই পেল। স্বর্গাদি সুখ ভোগও স্থায়ী নয়—সেখান থেকেও তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু ভগবৎ পাদপদ্ম কখনও কাউকে তাড়িয়ে দেয় না। ভগবান নিজেই তাঁর ধামের নিত্যত্বের পরিচয় দিয়েছেন ঃ

যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। গীতা ১৫।৬

ভগবান কাউকে তো কখনও তাড়ান না, বরং সর্বদা ইচ্ছা করেন কে তাঁর কাছে কখন আসবে। তাহলে দেখা গেল জগতের কল্পনা নিবৃত্তি অর্থাৎ অবস্তুতে, মায়িক বস্তুতে মায়িক বুদ্ধি হলেই তারই নাম কল্পনানিবৃত্তি। ভগবানের জীব সৃষ্টির এইটিই মুখ্য তাৎপর্য যে জীবকে মায়িক বস্তুতে মায়িক জ্ঞান করিয়ে ভগবৎ পাদপদ্ম ভজনা করান।

মায়াসৃষ্ট দেহে মায়া-রোগগ্রস্ত জীব রয়েছে। সৃষ্টিতে জীবের এই দেহধারণে দুটি ফল আছে—একদিকে ভগবৎ-বিস্মৃতির দণ্ড, অপর দিকে ভগবৎপাদপদ্ম লাভের জন্য ঈশ্বরানুগ্রহ। জীবের দেহ, ইন্দ্রিয়, দণ্ড, ভোগ্য সবই মায়ার, কিন্তু মায়ার এই দণ্ড জীব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে—একটি সুন্দর পুরস্কার

পাবার আশায়। সেটি হল ভগবৎপাদপদ্মলাভ। অন্যান্য দেহে জীব কত কদর্য ভক্ষণ করে, এটি মায়ার দণ্ড, কিন্তু অপরদিকে ভগবৎ অনুভূতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—রসানুভূতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। স্থাবর দেহ থেকে জঙ্গম দেহে যাওয়া অর্থাৎ অস্ফুট থেকে ক্রমশঃ স্ফুট হওয়া। এইটি অনুগ্রহ। একজন লোককে যদি বলা যায় একশত টাকা বেতন দেওয়া হবে, কিন্তু তাকে সেজন্য প্রহার করা হবে। বেতন পাবার আশায় সে যেমন প্রহার সহ্য করতে রাজী হয়, মায়ার দেহেও তেমনি নানাবিধ তিরস্কার প্রহার আছে। এগুলি হল রোগ, শোক, ক্ষুধা, পিপাসা, ভয়, শোক, মোহ প্রভৃতি। দোষ থাক আর না থাক জীবকে এ মায়ার তিরস্কার সহ্য করতেই হয়। এতে বেতন পাওয়া যাবে, সেইটিই লাভ—বেতন হল গৌর গোবিন্দ বলা।

এই দেহেতে সাধন করে যাঁরা ভগবানের পাদপদ্ম লাভ করেন সেটিও শ্রীগোবিন্দের দান আর অসাধনে যাঁরা লাভ করেন সেটিও কৃষ্ণের দান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সাধন করেই যদি পেতে হয়, তাহলে তাকে কৃপা কি করে বলা যাবে? শ্রীদেবর্ষিপাদ নারদ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—কোন অতিথিশালায় অতিথি এসেছেন। দাতা তাঁকে হাঁড়ি, কাঠ, চাল, ডাল, তেল, নুন সব দিয়ে রান্না করে খেতে বললেন। এসব উপকরণই দাতার দান। আর এক জন এসেছেন—অতি ক্ষীণ, দুর্বল, নিজে রান্না করে খেতে পারবেন না। দাতা করুণাপরবশ হয়ে তাঁকে নিজের ভোগ্য যে তৈরী অন্ন তাই দান

করলেন। তিনি খেয়ে পরমানন্দ লাভ করলেন। তিনি আশ্রিত হয়ে দাতার দুয়ারে পড়েছিলেন, ব্যাকুলভাবে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করেছিলেন, তাতেই দাতার দয়া হল। তেমনি এই দেহ হল অতিথিশালা। এখানে সাধন করবার সামর্থ্যও ভগবানেরই করুণার দান, রান্নার উপকরণ দানের মত। আর যাঁরা সাধন করবার মত সমর্থ নন শুধু ব্যাকুলভাবে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করে তাঁর দুয়ারে পড়ে থাকেন, তাঁকে তিনি নিজের ভোগ্যবস্তু. প্রেমামৃত দান করেন। তিনি তা পান করে পরমানন্দ লাভ করেন। শ্রীগুরু পাদপদ্মরূপে ভজন অনুকূলতা সব তাঁর দেওয়া। সাধনে পাওয়া কি রকম? জিহ্বাতে নাম হাঁড়ি বসাতে হবে, গদগদ ভাষ নয়নজলে অন্ন সিদ্ধ হলে, সেই সিদ্ধ অন্ন ভোজন করতে হবে। আর অতি রুগ্ন ক্ষীণ যে, নিজে রাঁধতে পারে না -হা গোবিন্দ যা কর—এবার আমি তোমার হলাম— 'হা গৌর হে যা কর' বলে দাতার দরজায় পড়ে থেকে কাতর হয়ে প্রার্থনা জানালে দাতা নিজের আস্বাদ দান করেন। বাবু যিনি হবেন তিনি দেখবেন খেতে বসবার আগে দরজায় কেউ অতিথি আছে কি না। দরজা বন্ধ করে খেতে বসা বাবুর পরিচয় নয়। দুটিই দান, কিন্তু এ দানের ভঙ্গি মাত্র—যেমন দুই ভিখারী হাত পেতেছে। কাউকে চার পয়সা, কাউকে বা এক টাকা দাতা দিলেন—এটি দাতার খেয়াল। সৃষ্টির মধ্যেও তেমনি দুটি খেলা —এ সৃষ্টি কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রাপ্তি। কারণ সৃষ্টির প্রতি আর কোন প্রয়োজন নেই। পাদপদ্মপ্রাপ্তিই উদ্দেশ্য। জীবের দেহ হল তার উপায় মানুষ ছাড়া অন্য কোন দেহ

শাস্ত্র-উপদেশ শুনবে না। আর মানুষের মধ্যেই বা কজন শোনে? ভগবানের নিজের পক্ষেও এই জীব-উদ্ধার কাজটি বড় কঠিন। একটু একটু করে অনুগ্রহ দিয়ে দিয়ে চুরাশী লক্ষ দেহ সৃষ্টি করেছেন। ভগবানের পাদপদ্ম জীব একেবারে ভুলে গেছে। তাকে মনে করতে হবে। জগতেও দেখা যায় স্মৃতি ফিরিয়ে আনা কঠিন। সাধু, শাস্ত্র, গুরু, অনুকূল অবস্থা—সব দিয়ে জীবকে নিজের পাদপদ্ম ভজাবার জন্যই ভগবানের এই সৃষ্টি কাজ।

যে গরু দুধ দেয় তার লাথি যেমন সহ্য করা যায়, তেমনি এই দেহে গৌরগোবিন্দ বলা যায় তাই কাম ক্রোধাদির লাথিও সহ্য করতে হয়।

মানুষকে শাস্ত্র দেখান হল। পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মের অভ্যাস মনুষ্যদেহে আছে। এত জন্মে কর্মের অভ্যাস, মনুষ্যদেহে কর্মের সংস্কারের মার্জন। কর্মহীন অবস্থায় কেউ থাকতে পারে না। নিদ্রিত অবস্থাতেও কর্ম চলে। মনুষ্যদেহে কর্মসংস্কারের মার্জন হচ্ছে। এতে বিমুখতা দোষ নষ্ট হচ্ছে। যত আলো জ্বলবে তত অন্ধকার দূর হবে। মনুষ্যদেহেই সাক্ষাৎ পাদপদ্ম ভজনের সংস্কার। সৃষ্টি কাজটিও ভগবানের লীলার মধ্যে পড়ে। আচার্য বেদব্যাস সূত্র করেছেন—'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্'। সৃষ্টি কাজের কোন হেতু নেই। আনন্দে যে কাজ করা যায় তার নাম লীলা; এটি স্বৈর আনন্দের বিলাস। মহারাজের কন্দুক ক্রীড়ার মত। আচার্য মধ্ব বললেন মত্তজনবৎ। দ্রষ্টা শ্রোতা-বিহীন অবস্থায় মত্তজন যেমন নাচে, গান করে, ভগবানের লীলাও

তেমনি—কারণবিহীন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিচার করেছেন, মত্তজন যে কাজ করে তা মস্তিষ্কবিকৃতির পরিচয়। কিন্তু ভগবানের কোন মস্তিষ্কবিকৃতি নেই। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। বলদেব তাই বললেন—ভগবানের এ সৃষ্টিলীলা সুখোন্মত্তজনবৎ। আনন্দঘন বিগ্রহ আপনি নাচেন, আপনি গান। মহাজন বলেছেন—'নিতাই আমার আগে নাচে আগে গায়।' ভগবানের নিজের বিলাসই হল প্রধান। আনুসঙ্গে জীব উদ্ধার কাজ হয়ে যায়। যেমন পরশমণি তার নিজের কাজে পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে, পায়ের তলে লোহা পড়ে গেলে পরশমণির স্পর্শে তা সোনা হয়ে যায়, তেমনি জীব উদ্ধার করা ভগবানের সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়। আনুসঙ্গে জীব উদ্ধার হয়ে যায়। উদ্দেশ্য তাঁর নিজ বিলাস আস্বাদন। এর মাঝে যদি জীব উদ্ধার হয় তো হয়ে যাবে। ভক্তকে আনন্দ দেবার জন্য তাঁর সৃষ্টি। ভক্তকে আনন্দ দিলে নিজে আনন্দ পান। আনন্দ কখনও একা ভোগ করা চলে না। আনন্দ ভোগ করতে গেলে দিয়ে ভোগ করতে হয়। প্রাকৃত আনন্দও দেখা যায়, না দিলে আস্বাদন হয় না। যেমন কেউ যদি গান গেয়ে আনন্দ পেতে চায়, তাহলে সে গান শুনে শুধু নিজে আনন্দ পাবে না, আর পাঁচজনে শুনে আনন্দ পাবে। তখন তার নিজেরও আনন্দ পাওয়া হয়ে যাবে। শ্রীজীবপাদ বলেছেন, পূর্বকল্পে যে সকল ভক্তের ভজন সিদ্ধ হয় নি, সেই সব অসিদ্ধ ভক্তদের উদ্ধারের জন্য এই সৃষ্টির ব্যবস্থা। অন্য জীবের দেহপ্রাপ্তি আনুসঙ্গে হয়ে যায়। চিত্ত হতে কামাদি সন্তাপ যত সরে যাবে, ততই ভগবানের লোভ জাগবে, সেখানে

থাকবার জন্য। ভক্তিধূপে সুরভিত গৃহে থাকতে তাঁর বড় ভাল লাগে। ভক্তের জন্যই ভগবানের সৃষ্টি, এইটিই সত্য কথা। লোভ ছাড়া কাজ হয় না। ভক্ত নাম করছে, নয়নে অশ্রু ঝরছে —এতে ভগবানের ভারী লোভ। ভারী আনন্দ। সূর্য কারো ঘরে নিমন্ত্রিত হলে আনুসঙ্গে যেমন অন্য লোকও সূর্যকিরণ পেয়ে যায় তেমনি ভক্তের জন্য সৃষ্টি হলেও অভক্তও পেয়ে যায়।

জীব সৃষ্ট দেহ পেয়ে প্রাকৃত সম্পদ ভোগ করে। ভোগ করে করে জীবের সুখের নেশা হয়। নেশা যার বেশী হয় সে পাকা নেশাড়ীর কাছে পরামর্শ নেয়, কেমন করে এই নেশাকে স্থায়ী করা যায়। সাধু-গুরু-বৈষ্ণব পাকা নেশাখোর। তাঁরা বললেন, গৌরগোবিন্দপাদপদ্মমধু নিরন্তর পান কর, তাহলে সুখ আর কখনও তোমাকে ছাড়বে না। ভগবানের পাদপদ্মই সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট বস্তু। ভগবান বলেছেন—'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়'। বিষয়ভোগ কৃষ্ণপ্রাপ্তি করায় না বটে, কিন্তু বিষয়ভোগ রসবোধের লালসা জাগিয়ে দেয়। তাই সাক্ষাৎ না হোক পরম্পরা সম্পর্কে বিষয়ভোগের কৃষ্ণপ্রাপ্তিবিষয়ে হেতুতা রয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রাকৃত জগতের সুখের নেশাও উপকার করেছে। তাই শ্রীযোগীন্দ্র জীবসৃষ্টির হেতু দেখাতে গিয়ে বললেন, 'স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে'।

সৃষ্টির পরে সৃষ্ট জগতে ভগবান প্রবেশ করছেন—'তৎ সৃষ্ট্বা তদনুপ্রাবিশৎ'। তাই অসৎ জগৎকেও সৎ-এর মত দেখায়। ভগবান সৎমাত্ররূপে এ জগতে প্রবেশ করেছেন ; কিন্তু মুরলী-ধারীরূপে প্রবেশ করেন নি। ভগবান জগতে প্রবেশ না

করলে জগৎ বাঁচে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেমন দুধ থেকে মাখন তুলে নেয়, ভূমি থেকে শস্য উৎপন্ন করে, তেমনি করে মনীষী যাঁরা তারাও এ জগৎরূপ দুগ্ধ থেকে ভজনমন্থনের দ্বারা হরি-পাদপদ্মরূপ নবনীত আহরণ করেন। মানুষকে অন্নদান করলে সে কিসে করে খাবে? তার জন্য যেমন থালা বা পাতা দেওয়া হয়, তেমনি ভগবান জীবকে ভোগ করবার জন্য বিষয় দিলেন; কিন্তু ভোগ করবার পাত্র তো চাই। এখানে পাতা বা থালা হল মন এবং দশটি ইন্দ্রিয়। মন-ইন্দ্রিয় যদি তিনিই নিজে হয়ে থাকেন তাহলে তাদের আবার প্রকৃতির সৃষ্ট বলা হবে কেমন করে? ভগবান তাঁর চিচ্ছক্তির আভা মন-ইন্দ্রিয়তে দিয়েছেন। এইটিই মনের কর্তৃত্ব। মন এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভোগ করবার শক্তি পরমাত্মা দিয়েছেন। এই তাৎপর্যে বলা হল, পরমাত্মা নিজে দশটি এবং একটি বিষয় ভোগ করেন। পরমাত্মার চিৎ সত্তারূপ সংযোগে অচেতন মন-ইন্দ্রিয়ও চেতনের মত কাজ করে। সুইচ (switch) টিপলে যেমন আলো জ্বলে, পাখা ঘোরে, switch off করলে অচেতন পাখা আর ঘুরবে না, আলো আর জ্বলবে না, তেমনি এই দেহ হতে:

পরমাত্মা ভগবান যবে হবেন অন্তর্ধান
ভস্ম কীট কৃমি অবশেষ।

হরিকে বাদ দিয়ে শুধু দেহ নিয়ে যে আনন্দ, হরিপাদপদ্ম বিস্মৃত হয়ে দেহভোগ, তার ফলে পুনঃপুনঃ গতাগতি। এ জগতে সুখ হয় না। তাই দুঃখকে সুখের গুঁড়ি মাখিয়ে জীবের কাছে সুখ বলে ধরা হয়েছে—sugar-coated quinine-এর মত।

জীব বাসনাযুক্ত কর্ম করতে করতে মায়ার রাজ্যে ভ্রমণ করছে। তাই সংসার বেঁচে আছে। জীবকে এইভাবে বহু অমঙ্গলবাহী জন্মকে গ্রহণ করতে করতে মহাপ্রলয় পর্যন্ত থাকতে হয়। জন্ম-মৃত্যুকে অবশ হয়ে গ্রহণ করতে হয়।

প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ তমঃ- এই ত্রিবিধ গুণ থেকে যে ত্রিবিধ কর্ম, শুক্ল লোহিত এবং কৃষ্ণ—মনে রাখতে হবে এ সবই প্রাকৃত। তবে তমঃ বা রজঃ অপেক্ষা সত্ত্ব ভাল। কিন্তু প্রাকৃত সত্ত্বও ভগবানের কাছে যাবে না, একেও ত্যাগ করতে হবে। তাই যোগ-মার্গে প্রাকৃত সত্ত্ব শুদ্ধি করার বিধান দেওয়া হয়েছে। এর পরে হবে ধ্রুবা স্মৃতি। তমোগুণে তির্য্যক যোনি, রজোগুণে উত্তম কর্মী, সত্ত্বগুণে দেবদেহ, আব যদি কেউ দেবদেহ বরণ করতে না চান, তাহলে তিনি সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন। 'সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্।' ব্যবহারিক জগতে সবটা সাত্ত্বিক হয় না, প্রতি জীবের মধ্যেই তিনটি গুণ আছে। তবে যার মধ্যে যে গুণটি বেশী থাকে, তাকে সেই গুণপ্রধান বলা হয়। খাদ্য, চিন্তা, সঙ্গ, আলাপ- এ সকলের দ্বারা সত্ত্বগুণ বাড়ে। উপবাসের দ্বারা বৃদ্ধি হয়। সত্ত্বগুণ পালন-কাজ করে, স্থিতি-কাজ সত্ত্বগুণের দ্বারা সাধিত হয়। এই সত্ত্বগুণই জগৎকে বাঁচিয়ে রাখার উপায়। জগতে সকলেই চায় যেন বেশীদিন বাঁচতে পারি। সত্ত্বগুণের দ্বারা পরমায়ু বাড়ে। তাই মানুষ যদি শুধু বেঁচে থাকতে চায়, তাহলেও এই সত্ত্বগুণ বাড়াতে হবে। কর্মফল নদীতে বহু অমঙ্গল বয়। বৈতরণী নদী যেমন রক্তপূর্ণ, পার হওয়া কষ্টকর, এও তেমনি—বহু অমঙ্গলপ্রবাহ কর্মগতি।

দেবযোনিও অমঙ্গলপ্রবাহ। দেবদেহও মঙ্গল নয়, কারণ মঙ্গল হল একমাত্র ভগবৎ-উন্মুখতা। আর ভগবদ্বিমুখতাই হল অমঙ্গল। কৃমিদেহ এবং দেবদেহ দুইই সমান হবে, যদি তাতে ভগবদ্বি-মুখতাই থাকে। মৃত্যুকালে জীবের কর্মানুগ চিত্তবৃত্তির কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে না। এরই নাম অবশ অবস্থা। মৃত্যু অথবা রোগের যন্ত্রণায় ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে পারছি না, তা নয়। পেরে উঠছি না, ইচ্ছা আছে, মনে মনে এ আক্ষেপও তখন থাকে না, তখন কর্ম অনুযায়ী বিপরীত বুদ্ধি হয় যে নাম উচ্চারণের প্রয়োজন নেই। চিত্তকে ভজনকর্মের বশীভূত করতে হবে। তাই মহাজন বলেছেন—'হরে কৃষ্ণ রাম নাম এই বেলা রসনায় রট'। চিত্ত তখন এরই বশীভূত হবে। ভক্তির সংস্কার চিত্তে হয়ে গেলে তখন সেই ভক্তিবশে চিত্ত কাজ করবে। রাজার জিহ্বা সাবাটি জীবন সুস্বাদু খাদ্যগ্রহণেই অভ্যস্ত। তাই অন্তকালে তাকে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে বললে সে তা পারে না; কারণ জিহ্বা ভক্তিকর্মের বশীভূত নয়। যা খাওয়া যায় তারই উদ্গার ওঠে। অন্তকালে সারাজীবনের খাদ্যগ্রহণের উদ্গার উঠবে। এইভাবে যোগীন্দ্র স্থিতির ব্যবস্থা করলেন। এর পরে মহাপ্রলয়ের কথা বলেছেন।

বেদান্তদর্শন বলেছেন—এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেঃ জলম্ ···। এতেও সৃষ্টির ক্রম ভাল বুঝা গেল না। শ্রীমদ্ভাগবতে সৃষ্টির ক্রম ভাল করে বলা হয়েছে। প্রকৃতি হতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব থেকে ত্রিবিধ অহঙ্কার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক অহঙ্কার

থেকে মন, দেবতাবর্গ, রাজসিক অহঙ্কার থেকে বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, তামসিক অহঙ্কার থেকে শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চ মহাভূত আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী। কালকে অনাদি-নিধন বলা হয়েছে। অব্যক্ত প্রকৃতি ব্যক্ত জগতের আশ্রয়, বিকৃতির ওপরে আকৃতি তৈরী হয়। তাই অনেকে সন্দেহ করেন, ভগবানের যখন আকৃতি আছে তখন তাও প্রকৃতির বিকৃতি। অতএব ভগবানের দেহ প্রাকৃত।

মহাপ্রলয়ে জগৎকে প্রকৃতির দিকে আকর্ষণ করছে। কালশক্তি, কালের চেষ্টা, এ ভগবানেরই চেষ্টা। দ্রব্য এবং গুণ অর্থাৎ শুক্ল, লোহিত, কৃষ্ণ সবই অব্যক্তে অর্থাৎ প্রকৃতিতে আকৃষ্ট হচ্ছে। কূর্ম যেমন করে নিজের অঙ্গ গুটিয়ে নেয়, তেমনি প্রকৃতি তাঁর নিজের মধ্যে সকলকে প্রতিলোমে আকর্ষণ করেন। প্রকৃতি একাকী এ কাজ করতে সমর্থ নন। প্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ড প্রসবের সময়ও কারণার্ণবশায়ী ভগবানের ঈক্ষণকে অপেক্ষা করেন। আবার সংগোপন করবার সময়ও কালকে অপেক্ষা করেন।

এখন মহাপ্রলয়ের ক্রম দেখান হচ্ছে। পৃথিবীতে শতবৎসর উল্বণা অনাবৃষ্টি হবে। বর্ধিত সূর্য জগৎকে উত্তপ্ত করবে। তার ফলে জগৎ নীরস হয়ে যাবে। এর পরে পাতাল থেকে সঙ্কর্ষণ মুখ হতে অনল নির্গত হবে। মহারুদ্র লেলিহান জিহ্বায় সব দগ্ধ করবে। বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হয়ে সেই অনল চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করবে। এরপরে প্রলয়কালীন সম্বর্তক মেঘ হস্তীর শুঁড়ের পরিমাণ ধারা বর্ষণ করবে। এই মেঘকে ইন্দ্র ডেকেছিলেন যখন

তিনি ব্রজবাসীর গোবর্ধনপূজায় কুপিত হন। তখন বিরাট অর্থাৎ এই সমগ্র জগৎ সলিলে লয় পাবে। এই জগৎ হল বিরাট এবং জগতের সমষ্টি বৈরাজ পুরুষ। যেমন দেহ হল বিরাট, জীবাত্মাকে বৈরাজ বলা হয়। বিরাজ না থাকলে বৈরাজ থাকে না। মহাপ্রলয়ে ব্যষ্টি জীবের অবস্থা কি? সমষ্টি জীব ব্রহ্মা। ব্যষ্টি জীব, প্রথমেই সমষ্টি জীবে ব্রহ্মাতে লয় হয়ে যায়। এখন ব্রহ্মা কোথায় যাবেন? অগ্নিতে যতক্ষণ কাঠ দেওয়া যায় ততক্ষণ অগ্নিকে দেখা যায়; কিন্তু যখন কাঠ আর দেওয়া হচ্ছে না তখন অগ্নি কোথায় যায়? চোখের সামনে অগ্নিকে আর দেখা যায় না। কাঠ এখানে উপাধি। বৈরাজ পুরুষ, ব্রহ্মাও তেমনি নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায় অব্যক্তে, সূক্ষ্ম পদার্থে লীন হয়। কিন্তু এখানে একটি কথা আছে। অব্যক্ত মানে যদি প্রকৃতি হয় তাহলে ব্রহ্মা প্রকৃতিতে লীন হন বললে শ্রুতিবাক্যের সঙ্গে বিরোধ হন। ব্রহ্মা, শিব এঁদের অবস্থান হল যাবৎ অধিকারম্, তাই এঁদের আধিকারিক দেবতা বলা হয়। সংহার হয়ে গেলে শিব আর থাকেন না, চলে যান। যেমন যাত্রা হলে দল চলে যায়, তেমনি শিব ব্রহ্মা এঁদের কাজ হয়ে গেলে সকলে মুক্তিধামে চলে যান। শাস্ত্রে বলা আছে 'ব্রহ্মার সঙ্গে মুক্তপুরুষগণ হরিপাদপদ্মে যায়।' শ্রীচক্রবর্তিপাদ ও শ্রীস্বামিপাদ এখানে অব্যক্ত শব্দের অর্থ করেছেন—মুক্তিধাম, নিরাকার ব্রহ্ম অথবা বৈকুণ্ঠ। ব্যক্ত করা যায় না যা তাই অব্যক্ত। কর্মী, জ্ঞানী, ভক্ত ভেদে ব্রহ্মা তিন প্রকার। নিজের ধর্ম যদি একশত বৎসর সুষ্ঠুভাবে

কোন জীব পালন করে, তাহলে সে ব্রহ্মার পদ পেতে পারে. তাকে কর্মী ব্রহ্মা বলা হয়। এইরকম জ্ঞানী ব্রহ্মা হতে পারে, ভক্তও ব্রহ্মা হতে পারে, যেমন গোপকুমার হয়েছিলেন। যে কল্পে ব্রহ্মা হবার মত যোগ্য জীব পাওয়া যায় না, তখন কৃষ্ণ নিজ অংশে ব্রহ্মা হন। স্বাংশ ব্রহ্মা। কর্মী ব্রহ্মা হলে তিনি প্রকৃতিতে লীন হন। তাঁর পুনরাবৃত্তি হয়। জ্ঞানী ব্রহ্মা হলে নিরাকার ব্রহ্মে লীন হন, আর ভক্ত ব্রহ্মা হলে প্রেমলক্ষণা বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ্‌গতি প্রাপ্ত হন। কর্মীর ফল পুনরাবৃত্তি, জ্ঞানীর ফল মুক্তি, আর ভক্তের ফল পার্ষদ্‌গতি। কর্মী ব্রহ্মার পুনরাবৃত্তিকে লক্ষ্য করেই ভগবান বলেছেন :

আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরাবর্তিনোঽর্জুন। গীতা ৮।১৬

এই ব্রহ্মা আবার ফিরে আসেন। পঞ্চভূত ত পড়ে আছে। সব গুটিয়ে প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায়। শ্রীবলদেব বলেছেন, বনলীনবিহঙ্গবৎ। বনের পশুপাখী যেমন রাত্রিকালে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, তাদের দেখা যায় না, সকাল হলে আবার তারা কোলাহলমুখর হয়ে ওঠে, এও সেই রকম। দোকানদার যেমন রাত্রিতে জিনিষপত্র গুটিয়ে রাখে আবার সকালে দোকান সাজিয়ে দেয়। সৃষ্টিও তাই মহাপ্রলয়ে সব গুটিয়ে নেয়, আবার সৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়। এর পরে যোগীন্দ্র বললেন ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ মরুৎ ব্যোম ব্যুৎক্রমে প্রকৃতিতে লীন হয়। প্রথমে পৃথিবী সম্বর্তক বায়ুর দ্বারা হৃতগন্ধ হয়ে জলে বিলীন হয় এবং জল হৃতরস হয়ে জ্যোতিরূপে কল্পিত হয়। আবার অন্ধকারে হৃতরূপ হয়ে জ্যোতিঃ বায়ুতে লীন হয় এবং আকাশের দ্বারা হৃতস্পর্শ

হয়ে বায়ু আকাশে প্রবেশ করে। পরে কালের দ্বারা হৃতগুণ (শব্দ) আকাশও তামস অহঙ্কাররূপ আত্মাতে লীন হবে। এর পরে সকল ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি—এরা বৈকারিকগুণের সঙ্গে সাত্ত্বিক অহংকার ও মহত্তত্ত্বে বিলীন হবে।

এই হল ভগবানের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকারিণী ত্রিবর্ণা মায়া। এইভাবে মায়ার স্বরূপ যোগীন্দ্র নিরূপণ করলেন।

চতুর্থ প্রশ্ন

মহারাজ নিমির সভায় তৃতীয় যোগীন্দ্র শ্রীঅন্তরীক্ষ মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করে প্রশ্ন করলেন—'মহারাজ ! এর পরে আপনি আর কি শুনবার বাসনা করেন ? যোগীন্দ্রের এই প্রশ্ন রাজাকে ছন্দিত করেছে। জীব কৃষ্ণবিমুখ, তাই জগতের স্থিতি। জীব উন্মুখ হলেই জগতের লয়। যাতে জীব এই মায়ার কারাগার থেকে চলে যেতে না পারে, তার ব্যবস্থা স্বভাবতঃ মায়ার। সব কাজেই মায়ার হস্তক্ষেপ। কেবল মায়া যখন বুঝতে পারে এ জীবটি একান্তভাবে ভগবানের পাদপদ্মে শরণাগত, তখন মায়া তাকে ছেড়ে দেয়। ভজনপথে চলতে চলতে মায়া বিঘ্ন ঘটায়। সাধক তখন ভজন থেকে চ্যুত হয়ে পড়ে, কিন্তু এ চ্যুতি প্রকৃতপক্ষে চ্যুতি নয়। মায়া ভক্তিনিষ্ঠাকে ঘুরিয়ে দেয় নিষ্ঠাকে মজবুত করবার জন্য। মায়া খুঁটি নাড়িয়ে দেখে চিত্ত শক্ত হয়েছে কি না। মালিক যেমন বাগানের মালীকে বলে আম পাকলে আমার কাছে নিয়ে এসো। মালীও আম পাকা দেখলে মালিকের কাছে পাঠায়। ভাল করে পাকা না দেখলে পাঠায় না। ত্রিবর্ণা মায়া। মায়ার সত্ত্ব রজঃ তমঃ —এই তিনটি গুণের বর্ণ যথাক্রমে শুক্ল (শুভ্র), লোহিত এবং কৃষ্ণ। রাজা তো একে তৈরীই ছিলেন, এর পরে আবার যোগীন্দ্র নিজে প্রশ্ন করে উৎসাহ দিয়েছেন। রাজা বললেন :

যথৈতামৈশ্বরীং মায়াং দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ।
তরন্ত্যঞ্জঃ স্থূলধিয়ো মহর্ষ ইদমুচ্যতাম্॥ ভা. ১১।৩।১৮

স্থূলধী অকৃতাত্মা, মূর্খ ব্যক্তিও এই দুস্তরা ঐশ্বরী মায়াকে যাতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হতে পারে, তার উপায়টি কৃপা করে বলুন।

এখানে অকৃতাত্মা অর্থে যদি অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ধরা যায়, তাহলে ঠিক হবে না। কারণ তাহলে কি বুঝতে হবে জিতাত্মা অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় যারা তারাই কি অনায়াসে মায়া জয় করতে পারে? জিতেন্দ্রিয়ের চিত্তও তো মায়ামুগ্ধ হতে দেখা যায়। শ্রীশ্রীচণ্ডীবাক্যে বলা আছে :

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥

এ জ্ঞানী বলতে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে বুঝাচ্ছে। কারণ আত্মজ্ঞানের খাতির মায়া রাখে না। অনাদি ভগবৎবিমুখ জীব —এই অপরাধেই মায়া তাকে আক্রমণ করে। মায়া আক্রমণের আগে পর্যন্ত জীবের আত্মজ্ঞান, অর্থাৎ স্বরূপ-স্মৃতিটি থাকে। সে যে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, এ জ্ঞান তার লোপ পায় না। মায়া আক্রমণ করে তার এই আত্মচেতনাকে লোপ করিয়ে দেয়। তখন তার আত্মজ্ঞানও চলে যায়, অর্থাৎ অস্মৃতি হয় এবং তার ফলে বিপর্যয়, অর্থাৎ দেহে 'আমি' এবং দৈহিক বস্তুতে 'আমার' এই বুদ্ধি জাগে। তাহলে দেখা যাচ্ছে জ্ঞানবানকে মায়া জ্ঞান-হীন করেছে। জীবাত্মা তো 'চিৎ'-এর অংশ। তাকে জড়া মায়া কেন আক্রমণ করতে সাহস করে? যেমন অগ্নির কণিকাকেও তো কাঠ ভয় করে। ভস্মীভূত হওয়ার ভয়ে কাছে যেতে চায় না। জীবের চিত্ত বড় দুর্বল। কারণ সে অনাদিকাল থেকে কৃষ্ণপাদপদ্মে বিমুখ। আত্মজ্ঞান থাকতেই

মায়া তাকে আক্রমণ করেছে, তাই আত্মজ্ঞান ফিরে পেলেও কোন কাজ হবে না। জীবের ব্যাধি হল কৃষ্ণবিমুখতা। তাই কৃষ্ণ-উন্মুখতাই হবে চিকিৎসা। আত্মজ্ঞান ফিরে পাওয়াটা চিকিৎসা হবে না। এই মায়ার গুরু হলেন শ্রীশ্রীহরিদাসঠাকুর। মায়া আক্রমণের আগেই যদি আত্মজ্ঞান লোপ হত তাহলে মায়া আক্রমণের ফলে অস্মৃতি হয়েছে এ কথা বলা যেত না। ভগবান বললেন :

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। গীতা ৭।১৪

জিতেন্দ্রিয় হলে মায়া জয় করা যায় না—'প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হলে ভব নাশ পায়।' ভগবানে একান্ত শরণাগতিই মায়া তরণের একমাত্র উপায়। এই মায়াকে পার হওয়া সহজসাধ্য নয়। মদনদেব নরনারায়ণ ঋষিকে বলেছেন, কামনার দুস্তর সাগর পেরিয়ে কেউ কেউ ক্রোধের গোষ্পদে ডুবে মরে। ক্রোধের কোন ফল নেই। কামনাতে তবু কিছুক্ষণ বিষয় ভোগ করতে পারে। ক্রোধে কেবল অনুতাপ। তাদের কষ্ট করে অর্জিত তপস্যা বৃথা নষ্ট করে। না খেয়ে জমান টাকার হাঁড়ি জলে ডুবিয়ে দিতে হলে তা যেমন ভোগে অথবা দানে কিছুতেই লাগে না, তেমনি তপস্যা প্রভৃতি যা কিছু কষ্টার্জিত সঞ্চিত ফল ক্রোধের বশে উচ্চারিত অভিশাপাদি বাক্যে বৃথা নষ্ট হয়। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মায়া জয় করে এ কথা কোথাও বলা হয় নি। মদনদেবের বাক্যটি হল :

ক্ষুত্তৃট্‌ত্রিকালগুণমারুতজৈহ্ব্যশৈশ্ন্যা
নস্মানপারজলধীনতিতীর্য্য কেচিৎ।

ক্রোধস্য যান্তি বিফলস্য বশং পদে গো
র্মজ্জন্তি দুশ্চরতপশ্চ বৃথোৎসৃজন্তি। ভা. ১১।৪।১১

বাক্‌পতি ব্রহ্মার বাক্য আছেঃ

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্ত সর্বাত্মনাশ্রিতপদো
যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ
শ্বশৃগালভক্ষ্যে। ভা. ২।৭।৪২

ভগবৎ পাদপদ্মে একান্ত শরণাগতি—এইটিই মায়া তরণের একমাত্র উপায়। তাঁর শ্রীচরণে অকপটে সব দিয়ে ধরতে পারলে তিনি দয়া করেন। কুকুর শৃগালের ভক্ষ্য যে এই দেহ —তাতে 'আমি' এবং দৈহিক বস্তুতে 'আমার' এই বুদ্ধি যাদের আছে, তাদের মায়া জয় হয় না। ভগবান ঋষভ দেবের বাক্য:

প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ।
—ভা. ৫।৫।৬

মায়ার দেওয়া বস্তু না স্পর্শ করলেও চলবে এই বুদ্ধি যখন আসবে তখনই মায়া জয় হবে। জগতে অনেক কাজে তো বীরত্ব দেখান হয়, কিন্তু এই বীরত্ব দেখাতে হবে যে মায়ার দেওয়া বস্তু স্পর্শ করব না—তা হোক্ না কেন সে ইন্দ্রপদ বা ব্রহ্মার পদ।

'অকৃতাত্মভি' পদের তাই প্রকৃত অর্থটি বলা হচ্ছে। অকৃত অনারাধিত আত্মা হরি যৈঃ তে। যাদের দ্বারা হরি আরাধিত হন নি, তারা, সেই সব স্থূলধী ব্যক্তিও যাতে অনায়াসে দুস্তরা মায়াকে পার হতে পারে তার উপায় বলুন। এই স্থূলধী ব্যক্তি কারা, তাদের পরিচয় দেবর্ষিপাদ দিয়েছেন:

এতদ্ধ্যাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মুহুঃ।
ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্যানুবর্ণনম্॥ ভা. ১।৬।৩৫

দেবর্ষিপাদ নারদ আচার্য বেদব্যাসকে বলছেন—আচার্য, তুমি জীবকে ধর্ম জানাতে এসেছ অর্থাৎ সংসারসাগর পার হবার উপায় বলতে এসেছ,তাহলে নৌকা করে দেবে,এইটাই হবে ধর্ম। ভবসাগর পারের নৌকা কঠিন। কিন্তু সে নৌকা আমি চোখে দেখেছি, আমি শোনা কথা কই না, দেখা কথা কই। যে জীব আতুরচিত্ত—একটু বিষয়ভোগের জন্য কাঙালের মত বসে আছে —শব্দ, স্পর্শ,রূপ, রস গন্ধ—এই পঞ্চ বিষয়ের দ্বারে দ্বারে অত্যন্ত লোলুপ হয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে একটু বিষয়ভোগের লালসায় ঘোরে, তাদের ভবপাবের নৌকা হল শ্রীহরির চর্যা অর্থাৎ লীলা বর্ণনা। বিষয়াসক্ত, কর্মাসক্ত স্থূলধী ব্যক্তির যদি এটি উপায় হয় তাহলে সূক্ষ্মধীর কা কথা।

যোগীন্দ্র মহারাজ নিমিকে প্রশ্ন করলেন—মহারাজ! মায়া তরণের উপায়টি আপনি আবার নূতন করে জানতে চাইছেন কেন? কারণ পূর্বে কবি যোগীন্দ্র তো 'তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরু দেবতাত্মা' এই বাক্যে বলেছেন যে একমাত্র অব্যাভিচারিণী ভক্তির দ্বারা ভগবানের পাদপদ্ম ভজলে মায়া জয় করা যায়, তাহলে পুনরায় এ প্রশ্ন কেন? মদান্ধ ইন্দ্র কুপিত হয়ে ব্রজবাসীকে গাল দিয়েছিলেন; কর্মী যারা তারা বৃথা অভিমানী—কর্মময় নৌকা দৃঢ় হলেও তা নামে নৌকা কাজে নয়, অর্থাৎ কর্মমার্গ আসল সাধন নয়, এর দ্বারা পার হওয়া যায় না, ডুবে যেতে হয়, কারণ কর্মজনিত পাপ অথবা পুণ্য—দুই-ই

ডুবিয়েই দেয়, পার করে না। ইন্দ্র দেবরাজ, তিনি কুপিত হলেন কেন? বিষয় সম্পর্কই ভগবদ্বিমুখতা সৃষ্টি করে। পৃথুরাজার উপাখ্যানে বলা আছে কুকুরের লেজ ধরে সাগর পার হওয়ার চেষ্টার মত হল কর্মমার্গ অবলম্বন করে ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া।

নিমিরাজের সভায় যে সব যাজ্ঞিক কর্মবাদী ব্রাহ্মণগণ ছিলেন তাঁদের দিকে লক্ষ্য রেখে অন্তরীক্ষ যোগীন্দ্র বললেন—অকৃতাত্মভিঃ অর্থাৎ স্থূল অনুষ্ঠানেই যার রুচি সূক্ষ্ম ভক্তিতে তার রুচি নেই। রাজার প্রশ্নটি কটাক্ষমূলক। মানুষ অবশে বিষয়চিন্তা করে, টেনেটুনেও তাকে বিষয় চিন্তা ছাড়িয়ে কৃষ্ণ-চিন্তা করান যায় না। তাই মায়া জয় করা যায় না। এমন যদি হয় শ্রীগুরু-কৃপায় কৃষ্ণচিন্তাই অবশে স্বাভাবিকভাবে হচ্ছে আর বিষয়চিন্তা টেনেটুনে জোর করে করতে হচ্ছে তখনই মায়া জয় করা হয়েছে বুঝতে হবে। বিষয়সেবী ব্যক্তির মায়া জয় কেমন করে হবে তার উত্তর প্রবুদ্ধ যোগীন্দ্র দেবেন। প্রকৃষ্ট বুদ্ধ—তাই তাঁর নাম প্রবুদ্ধ। তিনিই তো মায়া জয়ের কথা বলবেন।

শ্রীপ্রবুদ্ধ যোগীন্দ্র বললেন, শ্রীস্বামিপাদ টীকায় বলেছেন: ভক্তি ব্যতিরেকে মায়া তরণের আর দ্বিতীয় উপায় নেই। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। ভক্তি ছাড়া মায়া তরণ হয় না। জ্ঞানের দ্বারা মায়াতরণের কথা যে জ্ঞানবাদীরা বলেন এ জ্ঞানও ভক্তি। ভক্তি সম্পর্ক ছাড়া জ্ঞান বা যোগ কোন কাজ করে না। কন্যাকে সম্প্রদান করতে হলে যেমন সালঙ্কারা কন্যা দান করতে হয় তেমনি, ভক্তিকেও গ্রহণ করতে হলে সসাধনা ভক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। স্বামিপাদ বললেন—'তত্র প্রথমং বৈরাগ্যদ্বারা

গুরূপসত্তিমাহ।' গুরু পদাশ্রয়ের উপকরণ হল বৈরাগ্য। এখন প্রশ্ন হতে পারে ভক্তিরাজ্যে বৈরাগ্যের প্রয়োজন কি? জ্ঞানাদি সাধনে বৈরাগ্য প্রয়োজন বটে, বৈরাগ্যের প্রয়োজন সর্বত্র আছে। প্রাকৃত বিষয়কে ত্যাগ করার নামই বৈরাগ্য। আমাদের কথা হল কৃষ্ণ পেতে আপত্তি নেই কিন্তু জগতের অর্থ সম্পদ ধন জন স্ত্রী পুত্র গৃহ মান মর্যাদা যা পেয়েছি তাদের ছেড়ে নয়, সে সব থাক, মাঝ থেকে যদি কৃষ্ণ পাওয়া যায়, মন্দ কি? এই হল আমাদের মনোবৃত্তি। আমাদের যেখানে ব্যথা শাস্ত্রকার ঠিক সেইখানটিতে ধরেছেন। ছুরি না বসালে যেমন বিস্ফোটক ভাল হয় না তেমনি তীব্র বৈরাগ্যরূপ ছুরিকাঘাত না করলে অবিদ্যা বিস্ফোটক ভাল হবে না। জ্ঞানাদি সাধনে অধিকারী নির্বাচন আছে। সেই ব্যক্তিকে প্রথমতঃ অখিল বেদের অর্থ আপাততঃ জানতে হবে। কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করতে হবে। নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত উপাসনা (শাণ্ডিল্যসূত্রাদি) এই চতুর্বিধ কর্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করে তাকে নিতান্ত নির্মল হতে হবে এবং সাধন চতুষ্টয় জানতে হবে। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদি সাধন সম্পদ অর্থাৎ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান (সম্যক্ আধান) এবং শ্রদ্ধা আর মুমুক্ষুত্ব আছে এইরূপ ব্যক্তি হবেন প্রমাতা অর্থাৎ জ্ঞান উপদেশ গ্রহণের অধিকারী। জ্ঞানের মত ভক্তির ক্ষেত্রে বৈরাগ্য আগে বলা হয় নি, এখানে কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছে।

শাস্ত্রকার বলেছেন, এ জগতে হরিভক্তি সুদুর্লভা। জ্ঞান

অপেক্ষা ভক্তি যদি সাধনের দিক দিয়ে বেশী সুদুর্লভ হয় তাহলে স্বভাবতঃই এটি বুঝতে হবে যে ভক্তির যিনি অধিকারী তাঁর পক্ষে অধিকার আরও বেশী হওয়া চাই, কিন্তু ভক্তি মহারাণীর এমনই মহিমা যে সেখানে ভক্তকে চেষ্টা করে এ সব অধিকার আয়ত্ত করতে হয় না। ভক্তির কাছে এলে আপনা হতেই ভক্তি ও সব অধিকার তৈরী করে দেন। অন্ধকার যদি কোনও রকমে একবার সূর্যের কাছে পৌঁছাতে পারে তাহলে সে আলো হয়ে যায়, এও তেমনি। জ্ঞানযোগ সাধন অধিকার নির্বাচন করেছেন কিন্তু ভক্তির ক্ষেত্রে কোন অধিকার নির্বাচন করা হয় নি। মানুষ মাত্রেরই ভক্তিতে অধিকার।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যদি মানুষ মাত্রেরই অধিকার থাকে তাহলে আবার বৈরাগ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, এ কথা বলা হল কেন? জ্ঞান অথবা যোগমার্গেব বৈরাগ্য ও ভক্তির বৈরাগ্য এক নয়। জ্ঞানীর বা যোগীর বৈরাগ্য হল সব ত্যাগ করে এলে তবে জ্ঞান অথবা যোগ উপদেশ, কিন্তু ভক্তির বৈরাগ্য তা নয়, ভক্তি এলেই এ বৈরাগ্য আসে—যেমন অন্ন এলে ক্ষুধা চলে যায়। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ বলেছেন—ভক্তি জননী। তাঁর সন্তান হল বৈরাগ্য। বৈরাগ্য জনক ভক্তি সন্তান তা নয়, অর্থাৎ এ বৈরাগ্যের জন্ম ভক্তি থেকে, বৈরাগ্য থেকে ভক্তির জন্ম নয়। প্রাকৃত ক্ষুধা চলে যাওয়ার নামই বৈরাগ্য। ভক্তির ফলে যখন বৈরাগ্য আসে তখন ভক্তের চোখ প্রাকৃত রূপ দেখে না, কান প্রাকৃত শব্দ শোনে না, জিহ্বা প্রাকৃত কথা বলে না; তখন তার এ প্রাকৃত খাদ্যে পেট ভরে না, তখন সে অপ্রাকৃত

খাদ্য খায়। জ্ঞানী উপবাস দিয়ে ক্ষুধা বিনাশ করে, ভক্ত খেয়ে খেয়ে পেট ভরিয়ে ক্ষুধা নাশ করে। ভক্তের বৈরাগ্য অযত্নসিদ্ধ, চেষ্টা করে করতে হয় না—ভক্তের ভক্তির কাছে বিষয়বাসনা স্থান পায় না। যাঁহা রাম তাঁহা নেহি কাম—রবি রজনী নাহি মিলে এক ধাম। জ্ঞান যোগ বলে আগে অন্ধকার দূর কর তারপর আলো জ্বালা হবে। আর ভক্তি বলে অন্ধকার দূর করবার জন্য পরিশ্রম করতে হবে না, ভক্তি আলো জ্বাললে অন্ধকার আপনা থেকেই চলে যাবে। গৌরগোবিন্দে রুচি লাগলেই প্রাকৃত রুচি আপনিই চলে যাবে। মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুকে আবদার করে বলেছিলেন 'তুমি সন্ন্যাস নিলে কেন? প্রিয়াজী, মাতা শচী দেবী, নদীয়ার ভক্তবৃন্দ কেউ তো তোমার কৃষ্ণভজনের বিরোধী ছিল না।' তার উত্তরে মহাপ্রভু বললেন ঃ

শ্যামামৃতস্রোতসি পাতিতং বপু স্তস্যৈব তুঙ্গেন তরঙ্গ রংহসা।
যাং যাং দশামেতি শুভাশুভাহথবা সা চৈব মে প্রেমচরী করোতি।
—চৈতন্যচন্দ্রোদয়

কৃষ্ণভক্তির খরস্রোতে পড়ে গেলে কোথায় বাসনাবসন খসে যাবে আর মনে থাকে না 'বাসো যথা পরিহিতং মদিরামদান্ধঃ।' মদিরা পানে মত্ত হলে যেমন কটিদেশের বসন কখন পড়ে যায় জানতে পারা যায় না এও সেই রকম। জগতে সকলেই গুছিয়ে গুছিয়ে বিষয় ভোগ করে—শ্রীযোগীন্দ্র বললেন—কৃষ্ণভক্তি-সুধা পান করলে বাসনাবসন কোথায় যাবে তার কোন ঠিকানা নেই

—এই কৃষ্ণভক্তি মদ পান করবার ইচ্ছা তো চাই—কোথায় এ মদ পাওয়া যায় ? ঠিকানা জানতে হবে—তাই শ্রীগুরুপদাশ্রয় একান্ত প্রয়োজন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁর প্রমেয়রত্নাবলীগ্রন্থে বলেছেন—'জ্ঞানবৈরাগ্যপূর্বাশা ফলং সদ্যঃ প্রকাশয়েৎ।' ভক্তির ফল অবশ্যই ফলবে। ভক্তি কখনও ব্যর্থ যাবে না—অমোঘা ভগবদ্ভক্তি। ভক্তি-অগ্নি বাসনা-কাঠকে ধ্বংস করবেই কিন্তু কাঠ যদি বাসনা-জলে ভেজান থাকে তাহলে আগুন ধরতে দেরী হবে—বৈরাগ্য-রোদে চিত্ত শুষ্ক হলে তাতে ভক্তি-অগ্নি সংযোগ তাড়াতাড়ি হবে। ভক্তের বৈরাগ্য হল কৃষ্ণেতর বস্তুতে স্পৃহাহীন অবস্থা—আর জ্ঞানীর বৈরাগ্য হল বিষয়মাত্র ত্যাগ। ভক্তের পক্ষে সেইটিই ত্যাজ্য যেটি কৃষ্ণপ্রিয় নয়—দেবদেহও কৃষ্ণপ্রিয় নয় বলে ত্যাজ্য। ভগবৎ সম্পর্কিত না হলে ভক্ত কোন বস্তু গ্রহণ করে না। শ্রুতি বাক্য আছে 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' কৃষ্ণত্যক্ত অর্থাৎ তাঁর অধরামৃত হলে সে বস্তু ভক্তের গ্রাহ্য, অধরামৃত বলে বস্তু গ্রহণ করতে হবে, এতে বস্তু বোধ থাকবে না, কৃষ্ণে নিবেদিত হয় নি এমন বস্তু ভক্ত কখনও গ্রহণ করবে না, এরই নাম ভক্তের পাতিব্রত্য। গান্ধারীর চোখ বাঁধা ছিল, তাঁর পুত্রমুখ দেখবার লালসা ছিল না তা নয়, কিন্তু স্বামী জন্মান্ধ, তাঁর প্রতি নিষ্ঠাবশতঃ তিনি চোখে কাপড় বেঁধেছিলেন। হনুমানের পাতিব্রত্য সুবিখ্যাত, তিনি রামচন্দ্র ছাড়া আর কিছু দেখেন নি। যাতে রাম নেই সে বস্তু তিনি গ্রহণ করেন নি। এ বৈরাগ্য একবারে পাওয়া যায় না। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করতে হয়।

যারা প্রাকৃত বিষয়ে নির্বেদকে লাভ করেছে তাদের জন্য জ্ঞানযোগ আর যারা প্রাকৃত বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করে নি তাদের জন্য কর্মযোগ, আর যে ব্যক্তি অত্যন্ত নির্বেদ প্রাপ্ত নয়, অথচ বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত নয় তাদের জন্য ভক্তিযোগ। শ্রীভগবানের উদ্ধবজীর প্রতি বাক্য :

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

—ভা. ১১।২০।৮

তাহলে ভক্তিকে যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে এ বিচারে তো ভক্তি মধ্যম স্তরে পড়ল। না, তা বলা যাবে না, কারণ দুই পাশে দুই শিশু পুত্র নিয়ে পিতা চলেছেন, তাতে পিতা কি মধ্যম স্তরে পড়েন? এখানে পিতা মধ্যম হয়েও শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান এবং কর্ম শিশু সন্তানের মত, মাঝখানে ভক্তি উভয়োরভ্যর্হিতত্বাৎ। হেতুতেই উত্তমতা ধরা পড়বে। জ্ঞানীর হেতু বৈরাগ্য, কর্মীর হেতু বিষয়াসক্তি, তাহলে মাঝখানের বৈরাগ্যের হেতু কি? জ্ঞানীর বৈরাগ্যের প্রতি হেতু হয়েছে, নিষ্কাম কর্মে চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, তার ফলে বৈরাগ্য। আর বিষয়াসক্তির প্রতি হেতু অনাদি অবিদ্যা। আর ভক্তিপথের অবস্থা হল পালাতে পারে না, মরেও না। এ এক যাতনাময় অবস্থা! বিষয়ভোগ ছাড়তে পারে না অথচ ভোগের প্রতি মুহূর্তেই কাঁটা ফোটে। ব্যাধের বাণের মত বাণে বিদ্ধ পশু এখনও প্রাণ হারায় নি অথচ বাণবিদ্ধ থাকায় যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে, এখানেও সেই একই অবস্থা। এখানে বাণ কি? মহৎ কৃপারূপ বিশেষ বাণ মারা হয়েছে—

এমন ব্যক্তির পক্ষেই ভক্তিযোগ সিদ্ধিদাতা। কেন? কারণ নির্বেদ-প্রাপ্ত ব্যক্তি অহঙ্কারী হয়। ভক্তিধর্ম অর্থাৎ পায়ে ধরা ধর্ম তাদের পোষায় না, আর অত্যন্ত বিষয়াসক্তের বিষয়-নির্মুক্তির কোন প্রয়োজনবোধ নেই। মাঝখানের লোকই ভাগ্যবান। ভক্তিমার্গ অবলম্বীর হেতু হল মহৎকৃপা। এইটিই সাধকের সর্বোত্তম অবস্থা। যখন তার নিজের আর্তি এসেছে তখনই জীব গোবিন্দ-পাদপদ্মে শরণাগত হয়। ভক্তিপথের সাধক ইঙ্গিতে বৈরাগ্য ছুঁয়েছে। তবু যে তার সংসার দেখা যায় সে হল লাউ গাছের শিকড় ইঁদুরে কাটার মত অবস্থা। ইঁদুরে তলায় তলায় মাটির ভিতরে শিকড় কেটে দিয়েছে অথচ কাটবার সঙ্গে সঙ্গেই গাছটি শুকিয়ে যায় না—কিছুক্ষণ টাটকা থাকে, কিন্তু শীঘ্রই শুকিয়ে যাবে। তেমনি মহৎকৃপা ভক্তের সংসার-মূল কেটে দিয়েছে—তারও সংসার করা দেখাচ্ছে বটে—কিন্তু সে আর বেশীদিন থাকবে না, শীঘ্রই শুকিয়ে যাবে। সংসার অসার বুদ্ধি না হলে তো ছাড়া যাবে না—এই বোধ নিয়ে গুরুপাদপদ্মে শরণাগত হলে বড় সুন্দর।

শ্রীপ্রবুদ্ধ যোগীন্দ্র নিমিরাজকে বললেন—'মহারাজ! এ সংসারে মানুষ মিথুনীচারী হয়ে অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হয়ে সংসার করতে আরম্ভ করে সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তির আশায় কিন্তু সংসার করতে করতে দেখে বিপরীত ফল ফলেছে; দুঃখই প্রাপ্তি হয়েছে আর সুখের নিবৃত্তি হয়েছে। কারণ এ জগতের বিত্ত সম্পদ হল নিত্য আর্তিদ, দুর্লভ এবং আত্মমৃত্যুর কারণ, কাজেই গৃহ, অপত্য, পশু—যা যা সাধনে পাওয়া যায়

সবই অস্থির। তাদের দ্বারা কখনও সুখ হতে পারে না। এমন অর্থ রাখতে হবে যাতে কোনও রকমে দিন চলে যায়, যাতে অনায়াসে গোবিন্দ ভজতে পারি। সেই জন্য অর্থের যেটুকু দরকার সেইটুকু রাখতে হবে, অর্থ সুখের কারণ নয়। যা-কিছু সাধন করে পাওয়া যায়—কর্মের দ্বারা যা পাওয়া যায় তা বিনাশ্য। যা উৎপাদ্য তারই বিনাশ আছে। কুম্ভকার ঘট তৈরী করেছে সে ঘট একদিন না একদিন ভাঙবেই, তেমনি জীব কর্মফলে যে অর্থ বিত্ত তৈরী করেছে তার বিনাশ একদিন না একদিন হবেই। এ জগতে যাতে যাতে প্রিয় সম্বন্ধ তাতেই শোকের শেল—পরে তার জন্য কাঁদতে হবে ; তার চেয়ে প্রাকৃত জগতে প্রিয় সম্বন্ধ না করাই ভাল।

ভক্তি আস্বাদক—ভগবান আস্বাদ্য। ভক্তির করুণা হলে ভগবানকে আস্বাদন করা যাবে। কৃষ্ণপিপাসা জাগলে ভক্তি-জলাশয়েই যেতে হবে। বিষয়ভোগ কেউ ছাড়তে পারে না, যখন ছাড়ায় তখন ছাড়ে। অনুরাগ-বাঘ যখন হৃদয়বনে প্রবেশ করে তখনই বিষয় ছাড়ায়। এ জগতেও দেখা যায় লোকে যখন প্রথম মদ খেতে শেখে তখন এদিক ওদিক তাকায়, কেউ দেখছে কি না দেখে, দোকানে পর্দার আড়ালে খায়, আবার বাইরে এসে চারিদিকে তাকায় কেউ দেখছে কি না। কিন্তু যখন মাতাল হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে তখন আর কোনদিকে দৃষ্টি থাকে না। তেমনি যখন কৃষ্ণভক্তিমদিরা একটু একটু পান করতে আরম্ভ করা যায় তখন সাধক চারদিকে চেয়ে দেখে কেউ দেখছে কি না, লুকিয়ে সাধন করে কিন্তু তীব্র অনুরাগে যখন মাতাল হয় তখন আর

কোনদিকে লক্ষ্য থাকে না। কাল শেষ হলে এ জগতের সব বস্তু চলে যাবে, কাজেই তাতে আনন্দ পাওয়ার কোন কারণ নেই, আনন্দ যদি করতে হয় শাশ্বতকে নিয়ে আনন্দ করতে হবেঃ যা কোনওদিন ফুরাবে না। এ জগতের মত স্বর্গাদি লোকের সুখভোগও কর্মনির্মিত বলে নশ্বর। পুণ্যও কর্মনির্মিত তাই নশ্বর। একমাত্র ভক্তি কর্ম নয়, একে নৈষ্কর্ম বলা হয়েছে—অতএব ভক্তির দ্বারা যা পাওয়া যায় তা নশ্বর নয়। শ্রীগোপাল-তাপনী শ্রুতি বলেছেন—ভক্তিরস্য ভজনম্। তৎ ইহামুত্রোপাধি-নৈরাশ্যেন অমুস্মিন্ (গোপালে) মনঃকল্পনম্—এতদেব নৈষ্কর্মম্। চিরশাশ্বত, চিরানন্দস্বরূপ গৌরগোবিন্দকে নিয়ে মনের যা কিছু সঙ্কল্প বিকল্প করতে হবে—এর নাম ভজন। ভক্তিকর্ম—শ্রবণ কীর্তন, স্মরণ, বন্দন প্রভৃতি কর্মের মত দেখতে হলেও এ কর্ম নয়, এ অপ্রাকৃত কর্ম। প্রাকৃত কর্ম বন্ধন ঘটায়, আর ভক্তিকর্ম বন্ধন মুক্ত করে।

এর পর নিমিরাজ বলেছেন—স্বর্গসুখ ভঙ্গুর হয় হোক কিন্তু যতক্ষণ ভোগ করা যাবে ততক্ষণ তো সুখ আছে। তার উত্তরে যোগীন্দ্র বললেন যখন স্বর্গসুখ ভোগ করা হচ্ছে, তখনও নিরঙ্কুশ সুখ নেই, তাতেও জ্বালা আছে।

সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্তিনাম্। ভা. ১১।৩।২০

স্বর্গে সমান সমান সুখভোগ যারা করছে তাদের সঙ্গে স্পর্ধা আছে, ভিতরে জ্বালার অনুভব হয় আর বেশী সুখ যারা ভোগ করছে তাদের প্রতি অসূয়া হয়—আর একজনের পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গ হতে পতন দেখে নিজেরও ভবিষ্যতের ধ্বংস—পতনের আশঙ্কা-

ভীতি থাকেই, তাই স্বর্গেও সুখ নেই, স্বর্গসুখ শুনতে ভাল কিন্তু গ্রহণ করবার মত নয়। আত্মা বোবা তাই কথা কয়ে বলতে পারে না সে কি চায়। বোবা ছেলে যেমন কি চায় বলতে পারে না—কিন্তু মা যদি তার মন বুঝে তার মনের মত জিনিস দিতে পারেন তাহলে সে যেমন আনন্দিত হয় তেমনি আত্মাও প্রকৃতপক্ষে চায় সৎ চিৎ এবং আনন্দ—এই ইন্দ্রিয় সমন্বিত মনুষ্যদেহ মা যদি বোবা আত্মাকে বলতে পারে তুই কি নিবি? গৌরগোবিন্দ পাদপদ্ম নিবি? তখন আর আত্মার উল্লাসের অন্ত থাকে না, সে তো তাই চায়, সে এমন আনন্দ চায় যা সৎ অর্থাৎ চিরকালের সুখ এবং যা চিৎ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ—অর্থাৎ যা আপনি আসবে, কষ্ট করে পেতে হবে না। জীবাত্মা আনন্দ চায়, যে আনন্দ নিত্য এবং স্বপ্রকাশ কিন্তু বোবা বলে বুঝিয়ে বলতে পারে না, তাই খুঁজে বেড়ায় কোথায় সেই আনন্দ আছে। এই চুরাশী লক্ষ জন্ম সে যাতায়াত করছে হারানো সুখ খুঁজছে, মনুষ্যদেহে এখন খোঁজার দায়িত্ব এসেছে। এখন আর তাকে ঠকান উচিত নয়, এইবেলা মনুষ্যদেহ থাকতে থাকতে, আয়ু-রবি অস্ত যেতে না যেতে, হারানো জিনিষ খুঁজে নিতে হবে! জীবাত্মা তুমি কি চাও? কি তোমার কল্যাণ? সেই কল্যাণ খুঁজে নাও। এ জগতের এবং ও জগতের নশ্বরতা যখন বুঝা গেল তখন সে সুখের চেষ্টা নিরর্থক—কারণ তা ভঙ্গুর, ভঙ্গুর সুখে চেষ্টা কেন? সুখের জন্য চেষ্টার দরকার নেই। দুঃখ যেমন স্বয়মাগত হয়, নিষেধ করলেও নিবৃত্ত হয় না, তেমনি দুঃখের মত সুখের চেষ্টা না করলেও সুখ কমবে না। সুখও দুঃখের মত আপনি আসবে।

কালনদীতে জীবের কর্মফল ভাসান হয়েছে, যে ঘাটে যতটুকু পাওনা সে ঘাটে ততটুকু সুখ দুঃখ দিয়ে যাবে।

ভক্তিদ্বারা ভগবানের পাদপদ্ম আরাধনা করলে তবে মায়ার হাত হতে নিষ্কৃতি, এখন ভক্তি পাওয়ার উপায় হল দুটি—কৃষ্ণকৃপয়া তদ্ভক্তকৃপয়া বা। তার মধ্যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণকৃপায় ভক্তি লাভ—এটি প্রায়ই হয় না, কিন্তু ভক্তকৃপায় কৃষ্ণভক্তি লাভের বহু দৃষ্টান্ত আছে। এই ভক্তকৃপাও বিচারে কৃষ্ণকৃপাই বলতে হবে। কারণ বলা আছে :

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীগুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা তত্ত্বের অবধি। শ্রীগুরুপদাশ্রয়ই ভক্তি লাভের একমাত্র উপায়। তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করলে সকল জ্বালার নিবৃত্তি, তাই প্রবুদ্ধ যোগীন্দ্র বললেন :

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

—ভা. ১১।৩।২১

ভক্তিকেই মায়াতরণী বলা হয়েছে। মানুষ যেমন স্ত্রী, পুত্র, গৃহ সম্পদে আসক্ত হয়ে থাকে জীবাত্মা তেমনি এই দেহে পঞ্চকোশে আবদ্ধ হয়ে আছে। তাই জীবাত্মাকে মায়ামুক্ত করতে হলে পঞ্চকোশকে আগে সরাতে হবে। একেবারে সরালে হবে না—বুঝিয়ে বুঝিয়ে সরাতে হবে। কপিল ভগবান বলেছেন :

জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥ ভা. ৩।২৫।৩৩

তত্ত্বজ্ঞানের পর এই পঞ্চকোশ—অন্নময়, মনোময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় ; এদের জীর্ণ করতে ব্যথা লাগবে না। এই সাধনের নামই ভক্তি। অন্যত্র বীজনির্হরণকে যোগ বলা হয়েছে, কিন্তু দেবর্ষিপাদ নারদ ভাগবতধর্মকেই উত্তম উপায় বলেছেন :

তত্রোপায়সহস্রাণাময়ং ভগবতোদিতঃ।
যদীশ্বরে ভগবতি যথা বৈরঞ্জসা রতিঃ ॥

—ভা. ৭।৭।২৯

প্রাকৃত বস্তু সরিয়ে নিলে আত্মা ব্যথা পাবে না, এমন করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে সরাতে হবে। যেমন ভাঙ্গা বোতলকুচি সরিয়ে তার জায়গায় যদি কাউকে টাকা দেওয়া যায় তাহলে যেমন কারো প্রাণে ব্যথা লাগে না তেমনি পঞ্চকোশ জীর্ণ করিয়ে যদি সেই শূন্য জায়গায় শ্রীগৌরগোবিন্দ পাদপদ্ম দিয়ে পূর্ণ করিয়ে দেওয়া যায় তাহলে আর পূর্বের বস্তু হারানোর ব্যথা অনুভব করা যায় না ; আর তত্ত্ব না জানলেও তো মায়ার হাত হতে নিষ্কৃতির অন্য কোন উপায় নেই। শ্রুতি বললেন :

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

—শ্বেতা. উপনিষৎ

এই তত্ত্ব জানার নামও ভক্তি। জানা হল শুধু জানা আর ভক্তি হল বিশেষ জানা। 'কৌরব শব্দবিশেষে পাণ্ডব শব্দবৎ বোধ্যঃ।' পাণ্ডবদেরও কৌরব বলতে পারা যায় কিন্তু তাদের কৌরব না বলে যেমন বিশেষভাবে পাণ্ডবই বলা হয়, তেমনি ভক্তিকেও জ্ঞান বলা যায় কিন্তু শুধু জ্ঞান না বলে বিশেষ

জ্ঞান বুঝাবার জন্য ভক্তি বলা হয়। জ্ঞান হল পতিত্যক্তা পত্নীর মত আর ভক্তি হল অশেষ গুণান্বিত যুবতীরত্নবৎ। জ্ঞানা হল শুধু তত্ত্বজ্ঞান আর ভক্তি হল সাক্ষাৎ পাদপদ্মসেবা লাভ। ভক্তি সংসারতারণী এবং গোবিন্দ-প্রাপণী। ভক্তি পেলে সব পাওয়া যায়। অভিরাম গোপালের একমাত্র পুত্রকে হরণ করে গোপাল তার পুত্র হয়ে বসলেন—অন্তরে ব্যথা লাগতে দিলেন না। গোবিন্দ দুঃখ দূর করে প্রকৃত সুখ দান করেন। কৃষ্ণকৃপার চেহারা তাই—

কৃষ্ণকৃপার হয় এক স্বাভাবিক ধর্ম।
রাজ্য ছাড়ি করায় তারে ভিক্ষুকের কর্ম॥

এক রাজাকে এক সাধু মন্ত্রদীক্ষা দান করে গোপাল বিগ্রহের সেবা দিলেন। গুরুবাক্য লঙ্ঘন না করে রাজা সেবা করতে লাগলেন—ক্রমে ক্রমে রাজার একমাত্র পুত্র, রাণী, রাজ্য এমন কি নিজের স্বাস্থ্য পর্যন্ত গেল—কিন্তু তবু গোপালসেবা ছাড়েন না। গুরুবাক্য পালন করতে করতে তাঁর চিত্তে দৃঢ়তা এসেছে। কৃষ্ণভজন বড় কঠিন। রাজার ঐহিক সর্বনাশ যতই হচ্ছে তত কিন্তু তিনি আনন্দিত—কারণ গুরুবাক্য পালনের আনন্দে তার হৃদয় ভরপুর হয়ে আছে। পরে রাজা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এবং শ্রীগুরুদেবের অপ্রকট কালেও সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করে শ্রীগুরুদেব এবং গোপালের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনধামে চলে গেলেন। সম্পদ যে দুঃখদায়ক এটি বুঝিয়ে বুঝিয়ে ভগবান সম্পদ্ হরণ করেন। জীবকে সম্পদ্ দান এবং হরণ দুই ভগবানের কৃপা বলে বুঝতে হবে। বলিরাজের সম্পদ্ প্রয়োজনে হরণ

করেছিলেন আবার প্রয়োজনে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, মহারাজ অম্বরীষকে রাজ্য দিয়েছিলেন। শ্রীজীবপাদ বলেছেন সাধন দশাতেও ভক্তি সুখ দান করেন, শ্রবণ কীর্তনাদি যখন ভক্তি অঙ্গ যাজন করা যায় তখনও তাতে সুখ—ভক্তিই আমাদের মুখ্য প্রয়োজন, আপাততঃ প্রয়োজন হল সংসার উত্তীর্ণ হওয়া। মায়া-কবলিত জীবের মুক্তি প্রার্থনা কতদিন ? যতদিন ভক্তিসুখ না আসে। মহাজন বলেন—

দেহস্মৃতি নাই যাঁর সংসার কূপ কাঁহা তাঁর।

অর্থাৎ এই মায়ার জগতে বাস করলে দোষ নেই—আসক্তি যদি না থাকে তাহলে কোন বন্ধন হবে না। আসক্তির ওপরে কথা বলা হয়েছে—ভক্তি মন্ত্রে গা বাঁধা থাকলে মহামায়ার রাজ্যে ভয় হয় না, যেমন সাপের মন্ত্রে গা বাঁধা থাকলে বনের মাঝেও সাপের ভয় থাকে না। জগতের বস্তু ত্যাগ এটি খুব বড় কথা নয়, বস্তু যে ত্যাজ্য এইটি বুঝে নেওয়াই হল কাজ। শ্রীএকাদশে ভগবান উদ্ধবজীকে বলেছেন :

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তঃ বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥

—ভা. ১১।১৪।১৮

ভক্ত বিষয় ভোগ করছে কিন্তু বিষয়ভোগ তাকে পরাভূত করতে পারছে না। কৃষ্ণপাদপদ্ম ভজনশীল ব্যক্তি মায়ামুক্ত। ভগবদ্দাস কখনও মায়া-কবলিত নয়। ভক্তি ছাড়া অন্য যে কোন সাধন শুধু মুক্তি পর্যন্ত দেয়, কিন্তু ভক্তি গোবিন্দকে পাইয়ে দিতে পারেন—এবং গোবিন্দকে পেতে গেলে মাঝপথে

মুক্তির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবেই—যেমন নগরীতে যেতে হলে মাঝপথে গ্রাম দেখা হয়েই যায়। গোবিন্দের কাছে যাবার পথে মুক্তি দাঁড়িয়ে আছে। ভক্ত ভজন করছে—তার অর্থ হল ভক্তি তাকে গোবিন্দ পাদপদ্মে নিয়ে যাচ্ছে। ভক্ত কিন্তু নিজে এটি বুঝতে পারে না। কারণ বুঝতে পারলে তার আর ভজন এগুবে না। যেমন ভিক্ষুকের ঘরে যদি হাঁড়িতে চাল ভরা থাকে তাহলে সে আর ভিক্ষায় বেরুবে না। ভক্তও তেমনি নিজের ভক্তি সম্বন্ধে সচেতন হলে আর ভিক্ষুকের মত গোবিন্দ বলে কাঁদবে না। তাই ভক্তের স্বভাবে যত ভক্তিরস আস্বাদন তত দীনতা। যেমন কূপের যত বেশী গর্ত হয় তত বেশী জল জমে। তেমনি দীনতা-গর্ত যত গভীর হবে ততই ভক্তি-বারি বেশী জমবে। ভক্তের যে ভক্তি গভীরতা লাভ করেছে এটি বুঝা যাবে কি করে? প্রাকৃত বস্তুতে রুচি কমে যাবে। এইটিই ভক্তি বৃদ্ধির লক্ষণ। মেয়ে যখন বাপের বাড়ীতে থাকে তখন প্রায় নিরাভরণা রুক্ষ অবস্থায় থাকে, দেখে মনে হয় মা বাপ বুঝি তাকে আদর করে না, কিন্তু বাপ মায়ের যে কত আদর তা বুঝা যায় যখন তাকে বাক্স ভরে সাজিয়ে শ্বশুরবাড়ী পাঠায়; তেমনি ভক্ত যখন এ জগতে আর পাঁচজনের মধ্যে থাকে, তখন তাকে দেখে বুঝা যায় না, সে কাঙালের মত থাকে কিন্তু ভক্ত যখন পতির কাছে শ্রীগৌরগোবিন্দ পাদপদ্মে যাবে তখন ভক্তি-মা তাকে এমন বেশভূষায় সাত্ত্বিক বিকার অলঙ্কারে অনুরাগবসনে সাজিয়ে দেবেন যে তাকে দেখে গৌরগোবিন্দ মুগ্ধ হবেন। এই ভক্তিলাভের একমাত্র স্থান হল শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে সাধকের জিজ্ঞাসা হবে—এ জীবনে উত্তম কল্যাণ কাকে বলে? চতুঃশ্লোকী ভাগবতে ব্রহ্মাকে ভগবান বলেছেন:

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা॥

—ভা. ২।৯।৩৫

ভগবান বলছেন: আমার তত্ত্ব জিজ্ঞাসু যারা তারা এইটিই জিজ্ঞাসা করবে অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা সর্বত্র এবং সর্বদা কোন বস্তুটি থাকে? ভগবান যেটি জিজ্ঞাসা করতে হবে এই কথা মাত্র বললেন, লক্ষণ মাত্র বললেন—বস্তুটি কি তার নাম করে বললেন না। যোগীন্দ্র এখানে সেই শ্রেয়টিকে লক্ষ্য করেছেন। এখানে শ্রেয় বস্তুটি কি এই নিয়ে বাদী-প্রতিবাদীর বিবাদ লেগেছে। জ্ঞানী বলছেন জ্ঞান, যোগী বলছেন যোগ, আর ভক্ত বলছেন ভক্তি।

শ্রীজীবপাদ বললেন,—বিবাদের প্রয়োজন নেই—বিচার কর। যদি শ্রেয় পদের দ্বারা জ্ঞান ধরা যায় তাহলে জ্ঞান সর্বদা অভ্যাস করবে,—এ কথা কোথাও বলা হয় নি। অন্বয়-মুখে জ্ঞান পাওয়া গেল না, ব্যতিরেকমুখেও জ্ঞান পাওয়া যায় না; কারণ জ্ঞান না অভ্যাস করলে প্রত্যবায় হয়, তাও কোথাও বলা হয় নি। জ্ঞানচর্চা সদা সর্বত্র হয়—মাতৃগর্ভ থেকে আরম্ভ করে মুক্তিধামে স্থিতি পর্যন্ত কেউ জ্ঞানচর্চা করেছে এমনটি শোনা যায় নি। বরং মুক্তিতে জ্ঞান ত্যাগ করবে এইটিই বলা হয়েছে।

এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্ ॥
—ভা. ১১।১২।২৪

জ্ঞানচর্চা সর্বত্র সর্বদা হতে পারে না—অধিকারী নির্বাচন আছে। তাহলে যা জিজ্ঞাস্য তার লক্ষণ ভগবান যা করলেন তার সঙ্গে জ্ঞান বা যোগ মিলল না—কারণ যোগাভ্যাস এও সর্বত্র সর্বদা এবং সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। এখন দেখা যাক্ ভক্তি এই লক্ষণে মেলে কিনা, অন্বয়মুখে ভক্তিকে পাওয়া যায়ঃ

'স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ'

বিষ্ণুকেই সর্বদা স্মরণ করা উচিত—স্মরণ ভক্তিরই এক অঙ্গ। ব্যতিরেকমুখেও ভক্তিকে পাওয়া যায়।

'বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ'

বিষ্ণুকে কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। আর তাছাড়া এই ভক্তি যাজনে সকলে অধিকারী। ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পর্যন্ত, ধনী হতে দরিদ্র, রাজা হতে প্রজা, পণ্ডিত থেকে মূর্খ সকলেই ভক্তি যাজন করতে পারে। এখানে কুলের গরব নেই, নৃমাত্রস্য অধিকারিতা বলা হয়েছে। ভক্তি যাজন সর্বত্র অর্থাৎ দেশকাল নিয়ম নেই—সর্বসিদ্ধি হয়। যেখানে বসেই কৃষ্ণ বলা যাক্ না কেন দেশে বিদেশে, ঘরে বাইরে সেখানেই কাজ হবে। ভক্তি যাজন সর্বদা হতে পারে, মাতৃগর্ভ থেকে আরম্ভ করে মুক্তি পর্যন্ত। মাতৃগর্ভে প্রহ্লাদ, বাল্যে ধ্রুব প্রহ্লাদ, যৌবনে মহারাজ অম্বরীষ, বার্ধক্যে যযাতি মহারাজ, মুমূর্ষু অবস্থায় অজামিল ভক্তিযাজন করেছেন। মুমূর্ষ অজামিলের

এ কল্যাণের কথা শুনে আজও কত লোকের কল্যাণ হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। মুক্ত পুরুষের ভক্তিযাজনে প্রয়োজন নেই কিন্তু শ্রীহরির স্বরূপের এমনই মাধুর্য যে মুক্ত পুরুষকেও তাঁর গুণে আকৃষ্ট করে পাদপদ্ম ভজন করিয়ে নেন। এরই নাম অহৈতুকী ভক্তি। মুক্ত পুরুষ মুক্তির আস্বাদ লাভের জন্য, মুমুক্ষু ভবব্যাধি মোচনের জন্য আর বদ্ধজীব কানে ও মনে ভাল লাগে বলে হরিকথা শোনে বা হরিপাদপদ্ম ভজে। এইভাবে দেখা যায় ভক্তিযাজনই একমাত্র সদা এবং সর্বত্র করতে পারা যায়। যে ভক্তি বস্তুটিকে ভগবান চতুঃশ্লোকীতে শুধু লক্ষণের দ্বারা বুঝালেন, সেই ভক্তিই শ্রীযোগীন্দ্র উত্তম শ্রেয় পদের দ্বারা স্পষ্ট করে বললেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে এই ভক্তিই একমাত্র জিজ্ঞাস্য। এই ভক্তি সম্পদই হল একমাত্র উত্তম শ্রেয়। আর অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাম্ শব্দের অর্থ করা হয়েছে ভক্তির অন্বয়ে অর্থাৎ যোগে যোগ বা জ্ঞান ফল দান করে। দেবর্ষিপাদ নারদ বলেছেন—ব্রহ্মজ্ঞান যদি অচ্যুতভাববর্জিত হয় অর্থাৎ ভক্তি-বর্জিত হয় তাহলে তার শোভা হয় না। আবার বাক্‌পতি ব্রহ্মার বাক্যেও পাওয়া যায় ভক্তি ছাড়া যোগ ফল দান করে না।

পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিনস্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে
গতিং পরাম্॥ ভা. ১০।১৪।৫

আর ব্যতিরেকমুখে দেখান যেতে পারে জ্ঞান ও যোগকে বাদ

দিয়ে শুধু ভক্তি ফল দান করে ; তাই বিচারে দেখা গেল শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভক্তিই একমাত্র জিজ্ঞাস্য। ভক্তি পেলে তবে গোবিন্দ মাধুর্য আস্বাদন হয়। যেমন ক্ষুধা থাকলে তবে অন্নের আস্বাদন হয়। ক্ষুধা না থাকলে অন্ন ঘরে থাকলেও তার সঙ্গে সম্পর্ক হয় না। তেমনি গোবিন্দ সামনে উপস্থিত হলেও ভক্তি মহারাণীর কৃপা না হলে গোবিন্দমাধুর্য আস্বাদন হয় না। তাই গোবিন্দ প্রাপ্তি প্রয়োজন নয়। প্রয়োজন হল ভক্তি প্রাপ্তি। অন্ন আস্বাদনের জন্য যেমন ক্ষুধা রোজগার করতে হয়, গোবিন্দ-মাধুর্য আস্বাদন করতে তেমনি ভক্তি রোজগার করতে হবে। ভক্তিই ভগবানের আনন্দ এনে দেয়। মহাভাবের গুণের ব্যষ্টি-রূপ হল ভক্তি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে গুরুপাদপদ্মের কাছে ভক্তি জিজ্ঞাসা করতে হবে সে গুরুস্বরূপ কেমন হবেন ? যাঁর শাস্ত্রজ্ঞান আছে এবং ভগবৎ-তত্ত্বের উপলব্ধি আছে এমন ব্যক্তি গুরু হবেন। কথায়-বার্তায় আলাপ-আলোচনায় সাধক না হয় বুঝতে পারে তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান আছে কিন্তু তত্ত্ববোধ আছে কি না সাধক কেমন করে জানবে ? এটি তো ভিতরের কথা। যোগীন্দ্র বললেন—তিনি উপশমাশ্রয় হবেন—অর্থাৎ কামক্রোধলোভের বশীভূত হবেন না। সচ্চিদানন্দ ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ যাঁর হয়েছে তিনি কাম ক্রোধ লোভাদির দ্বারা বশীভূত হন না। এমন ব্যক্তিকেই গুরুপদে বরণ করতে হবে। গুরুর যদি শাস্ত্রজ্ঞান না থাকে তাহলে শিষ্যের সংশয় শাস্ত্রযুক্তিতে ছেদন করতে পারবেন না, তাতে শিষ্যের গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হবে। আর গুরুর যদি

ভগবৎতত্ত্বের উপলব্ধি না থাকে তাহলে তাঁর কৃপা ফলবতী হবে না। ভগবানের কৃপা গুরুপাদপদ্ম-দ্বারে জীবের কাছে আসে। এ জগতে সকলেই গুরু। প্রথমে জীবের গুরু মাতা পিতা। জাগতিক শিক্ষা দিচ্ছেন, ক্রমশঃ জীবকে উন্নত করা হচ্ছে, তার সংস্কার তৈরী হচ্ছে—এরও পরে শিক্ষকেব কাছে শাস্ত্রীয় সংস্কার তৈরী হচ্ছে, তারপর শ্রীগুরুপাদপদ্ম সম্পর্কে এলে সাক্ষাৎ ভগবৎ সম্বন্ধ হল। জগতের সঙ্গে কেমন করে চলতে হবে তা শেখান মাতাপিতা, শাস্ত্রের সঙ্গে কেমন করে চলতে হবে তা শেখান শিক্ষক আর ভগবানের সঙ্গে কেমন করে চলতে হবে তা শেখান শ্রীগুরুদেব। শাস্ত্রে যে গুরুর লক্ষণ দেওয়া হল তা হয় ত অনেক সময় বুঝা যায় না, কিন্তু শিষ্য যখন অনেক প্রশ্নের সমস্যা নিয়ে যাঁর চরণে সমাগত হয়ে বিনা প্রশ্নেই তাঁর কথাবার্তার মধ্যে প্রশ্নের মীমাংসা পেয়ে যান, সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, তাঁকে অনায়াসে গুরুপদে বরণ করা যায়। আবার ত্রিতাপানলে অহর্নিশ হৃদয় জ্বলে যাচ্ছে—যার কাছে গেলে সেই জ্বালার নিবৃত্তি হয়ে পরম চরম শান্তিতে হৃদয় ভরে ওঠে, তাঁর শ্রীচরণে অকাতরে অনায়াসে বিকিয়ে যেতে পারা যায়, তিনিই শ্রীগুরুস্বরূপ। তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কাছে ভক্তিধর্ম শিক্ষা করতে হবে এবং গুরুস্বরূপকে ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন বুদ্ধি ও প্রিয়তম বুদ্ধি করতে হবে—এই গুরুস্বরূপের অকপটে সেবা করতে পারলে স্বয়ং ভগবানও এত সন্তুষ্ট হন যে তিনি নিজেকে পর্যন্ত সেই গুরুসেবাকারী ব্যক্তির কাছে বিকিয়ে দেন।

প্রথমতঃ সকল বিষয় থেকে মনটিকে সরিয়ে এনে সাধুসঙ্গ করতে হবে এবং ক্রমে ক্রমে দীনহীন লোকের প্রতি দয়া, সমান লোকের সঙ্গে মিত্রতা এবং নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যারা তাঁদের প্রতি সম্মান করতে হবে। এর সঙ্গে দেহের এবং মনের শুচিতা রক্ষা করা প্রয়োজন। মৃত্তিকা দ্বারা মার্জন এবং জল দ্বারা ধৌত করে দেহের শুচিতা রক্ষা আর দম্ভ অভিমান, অহঙ্কার পরিত্যাগ করে অন্তরের শুচিতা রক্ষা করতে হবে। এর পরে স্বধর্মাচরণ, ক্ষমা, মৌন অর্থাৎ প্রাকৃত কথা ত্যাগ, অধিকার অনুযায়ী নিয়মিত বেদাধ্যয়ন, সরলতা, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা এবং শীত উষ্ণ প্রভৃতি সহ্য করা শিক্ষা করতে হবে।

এর পরে ভাগবতধর্ম প্রসঙ্গে আরও কিছু শিক্ষণীয় আছে। সর্বত্র সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মদর্শন—তাঁকে নিয়ন্তারূপে ভাবনা, নির্জন প্রদেশে বাস, গৃহে সম্পদে স্ত্রী পুত্র পরিজনে অনাসক্তি, বল্কলাদি ধারণ—অর্থাৎ অতি সাধারণ পরিধেয় বসন গ্রহণ এবং যথালাভে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

ভগবৎ প্রতিপাদক শাস্ত্রে সুদৃঢ় বিশ্বাস (শ্রদ্ধা) এবং অন্য শাস্ত্রে অনিন্দুক হতে হবে। কায়মনোবাক্যে দণ্ড গ্রহণ করতে হবে, প্রাণায়ামের দ্বারা মনের দণ্ড, মৌনভাবের দ্বারা বাক্যের দণ্ড এবং কর্মত্যাগের দ্বারা শরীরের দণ্ড গ্রহণ করতে হবে, সত্য কথা বলতে হবে, সত্য আচরণ করতে হবে এবং শম অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় মনকে সংযত করতে হবে। আর দম অর্থাৎ বাইরের কর্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক্—এদের সংযত করতে শিক্ষা করতে হবে।

স্বয়ং ভগবান হরির নাম রূপ গুণ লীলা শ্রবণ, কীর্তন এবং ধ্যান করতে হবে এবং যা-কিছু কাজ করা যাবে সব যেন হরি সম্পর্কিত হয়। ইষ্ট, দান, তপস্যা, জপ, সদাচার, নিজের যা কিছু প্রিয়বস্তু স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, প্রাণ সবই পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দে নিবেদন করতে হবে। ইষ্ট শব্দে বিষ্ণু সম্প্রদানক যাগ, দত্ত শব্দে বিষ্ণুবৈষ্ণব সম্প্রদানক দান, তপস্যা শব্দে একাদশী প্রভৃতি ব্রত, জপ শব্দে বিষ্ণুমন্ত্র জপ এবং নিজের প্রিয়বস্তু যা কিছু আছে সকলকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করতে হবে।

এইভাবে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করে তাদের সঙ্গে মৈত্রী করতে হবে এবং স্থাবরে জঙ্গমে পরিচর্যা, বিশেষতঃ মানুষে, তার মধ্যে স্বধর্মাচরণকারী ব্যক্তিতে, তাব মধ্যে আবার সাধু ব্যক্তিতে সেবা করতে হবে। ভক্তসঙ্গ লাভ এ জীবনের পরম সম্পদ, ভক্ত সঙ্গে ভগবৎ-কথা প্রসঙ্গ, পরস্পর প্রীতি, এটি এ জগতের দুঃখ নিবৃত্তির পরম উপায়।

এইভাবে সাধন ভক্তি করতে করতে একদিন সাধক সাধ্যভক্তি অর্থাৎ প্রেমলক্ষণা ভক্তির সন্ধান পাবে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মশাই বলেছেন :

অপক্কে সাধন গতি পাকিলে সে প্রেমভক্তি
ভকতি লক্ষণ তত্ত্ব সার।

সাধন ভক্তি ভক্তির অপক্ক দশা এবং ভক্তির পক্ক দশার নাম প্রেমভক্তি। এ পক্ক বা অপক্ক অবস্থাটি ভক্তির গায়ে লাগে না, এটি সাধকের কাঁচা, পাকা অবস্থা বিচার করে বলা হয়েছে। সাধক যখন প্রথম সাধন করতে আরম্ভ করেছে, ইন্দ্রিয়কে যখন

জোর করে ভক্তি-যাজনে লাগিয়েছে তখনকার অবস্থা হল অপক্ক আর সেই ইন্দ্রিয়ই যখন লোভে পড়ে রুচি করে ভজন করে তখন হল পক্ক অবস্থা। যেমন গায়ক যখন প্রথম গান চর্চা করে তখনকার তার কণ্ঠে যে রাগিণীর অবস্থা তার নাম অপক্ক অবস্থা, আর সেই গায়ক যখন ওস্তাদ হয় তখন তার কণ্ঠের রাগিণীর পক্ক অবস্থা। যখন সাধক প্রেমলক্ষণা ভক্তির অধিকারী হবে, অর্থাৎ প্রেমিক ভক্ত হবে তখন তার প্রেমের আস্বাদনে হৃদয় ভরপূর হয়ে থাকবে। ফলে বাইরেও তার কিছু বিকার প্রকাশ পাবে। অঙ্গে পুলক, নয়নে অবিরত 'হা কৃষ্ণ' বলে আর্তিতে অশ্রু বিসর্জন, কখনও বা ইষ্ট দর্শনে সেই পরমানন্দ অনুভূতিতে হাস্য, কখনও আহ্লাদিত হয়ে গদগদভাষ, অস্ফুট বাক্য উচ্চারণ, কখনও আনন্দে নৃত্য, গীত, কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ আবার কখনও বা স্তব্ধতা—এই বিবিধ সাত্ত্বিক বিকার দেখা যায়।

এইভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভক্তিধর্ম শিক্ষা করে এবং প্রেমভক্তি লাভ করে শ্রীমন্নারায়ণের আরাধনা করতে পারলে শ্রীগোবিন্দে একান্ত শরণাগতির ফলে ভগবানের দুস্তরা মায়ার হাত হতে অনায়াসে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। গীতায় ভগবান এই উপায়টি অর্জুনদেবের কাছে বলেছেন ঃ

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ গীতা ৭।১৪

শ্রীভগবানে প্রকৃষ্ট শরণাগতি ছাড়া মায়াতরণের আর দ্বিতীয় পথ নেই। এই শরণাগতির খাঁটি চেহারাটি ভগবান ঋষভদেব জগতের কাছে ধরে দিয়েছেন ঃ

'প্রীতি র্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ'—শরণাগতি ঘন হলে সেইটিই ভগবানে ভালবাসায় পরিণত হবে। ভগবানে প্রীতি, শ্রীগোবিন্দ প্রেম—এইটিই জগতের আচণ্ডালে বিনামূল্যে বিতরণ করবার জন্য রসরাজ শ্রীগোবিন্দ ব্রজের নিকুঞ্জ ত্যাগ করে নদীয়ার মাটিতে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

পঞ্চম প্রশ্ন

মহারাজ নিমি যোগীন্দ্রের শ্রীমুখে যখন শুনলেন নারায়ণ-পর হলে অনায়াসে মায়া জয় করা যায় তখন সেই নারায়ণের স্বরূপ জানবার জন্য উৎসুক হলেন। ঋষিদের কাছে আকুল আগ্রহে প্রশ্ন তুললেন :

নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।

নিষ্ঠামর্হথ নো বক্তুং যূয়ং হি ব্রহ্মবিত্তমাঃ॥ ভা. ১১।৩।৩৫

হে ঋষিগণ, আপনারা ব্রহ্মবিদ্‌শ্রেষ্ঠ, তাই নারায়ণ বলে যাঁকে উল্লেখ করলেন তাঁর পরমাত্মা পরব্রহ্মের স্বরূপটি কেমন সেটি কৃপা করে উপদেশ করুন। ব্রহ্মকে যাঁরা জেনেছেন তাঁরাই ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলতে পারবেন। এই ভরসা নিয়েই মহারাজ প্রশ্ন করেছেন। এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন পঞ্চম যোগীন্দ্র শ্রীপিপ্পলায়ন। শ্রীদীপিকাদীপনকার বলেছেন---'পিপ্পল' শব্দের অর্থ হল ভগবৎবিভূতি, সেই বিভূতিকে যিনি আশ্রয় করেছেন তাঁরই সে স্বরূপবর্ণনে সামর্থ্য আছে। 'পিপ্পলং ভগবদ্বিভূতিরয়নমাশ্রয়ো যস্য স তথেতি তত্তৎবর্ণনে তস্যৈবৌচিত্যাৎ স এবোবাচ ইত্যুক্তম্।'

পঞ্চম যোগীন্দ্র শ্রীপিপ্পলায়ন বললেন—মহারাজ! একমেব পরং তত্ত্বম্ ত্রিধা আবির্ভূতম্ ইতি অবেহি।' তত্ত্ব বস্তু একটিই—তারই তিনটি প্রকাশ, যেমন অন্তঃকরণ একটিই তার বৃত্তিভেদে চারটি নাম—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার এও তেমনি; যেমন যেমন কার্য তেমনি তেমনি প্রকাশ। ব্রহ্ম হলেন কেবল বিশেষ্য,

পরমাত্মা অন্তর্যামিস্বরূপ, ইনিই মায়ার প্রেরক আর নিজের বিলাস-লীলা বজায় রেখে যিনি স্থিতি প্রভৃতির কারণ হন তাঁকে বলা হয় ভগবান।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন।

অদ্বয়জ্ঞানই তত্ত্ব, একই তত্ত্বের ত্রিবিধ প্রকাশ। উপাসকের উপলব্ধি ভেদে একই তত্ত্ববস্তুর বিভিন্ন নাম ও প্রকাশ হয়েছে। শ্রীজীবপাদ বলেছেন—অনভিব্যক্ত-শক্তিক হলেন ব্রহ্ম। তত্ত্ব যখন তখন সৎ চিৎ আনন্দ শক্তি ত তাঁব সঙ্গেই আছে কিন্তু যে অবস্থায় এই শক্তির প্রকাশ নেই—সেই অবস্থায় ইনি ব্রহ্ম। যেমন একজন গায়ক যখন নিদ্রিত অবস্থায় আছেন তখন তাঁর গীতশক্তির প্রকাশ নেই, গীতশক্তি তখন সুপ্তভাবে আছে। ব্রহ্মের অবস্থাও তাই—শক্তি তাঁর সুপ্তভাবে আছে, প্রকাশ নেই। এই শক্তি যখন কিঞ্চিৎ অভিব্যক্ত তখন তিনি হলেন পরমাত্মা, যেমন গায়ক যখন বন্ধুবান্ধবের মাঝে কথা-প্রসঙ্গে রত তখন তাঁর শক্তির কিছু প্রকাশ থাকলেও গীতশক্তি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হচ্ছে না। আর শক্তি যখন সম্পূর্ণ প্রকাশিত তখন তিনি হলেন ভগবান, যেমন গায়ক যখন আসরে শ্রোতার মাঝে উচ্চগ্রামে তাঁর গীতশক্তির পরিচয় দিচ্ছেন অর্থাৎ গান গাইছেন তখন তাঁর গীতশক্তি সম্পূর্ণ প্রকাশিত। যেমন কুঁড়ি, আধফুটন্ত এবং সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত গোলাপ। আবার ভগবানেরও শক্তি বিকাশের তারতম্য আছে। সম্পূর্ণ শক্তি বিকাশ করেন যিনি তাঁরই জয়। যেমন অর্থ হয় ত অনেকেরই আছে, কিন্তু যিনি সবচেয়ে বেশী দান করেন তাঁরই অর্থের জয় দেওয়া হয়। যে

ভগবান প্রেম দান করে জীবকে নিজ পাদপদ্মে উন্মুখ করেন সেই ভগবানেরই জয় সবচেয়ে বেশী। ভগবান নিজে নিত্য বিলাসময় হয়ে আছেন। অন্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই, আনন্দিনী শক্তির অভাব বলেই দানে অসমর্থ।

রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ

এই আনন্দের মাত্রা যেখানে যত বেশী তাঁর করুণার মাত্রাও তত বেশী, রসিকশেখর কৃষ্ণে আনন্দের প্রাধান্য, তাই করুণারও প্রাচুর্য। নিজের আনন্দ থাকলে তবে পরকে করুণা করতে পারা যায়। নৃত্যরত অবস্থায় নর্তককে দেখতে পারলে যেমন আনন্দ হয় তেমনি বিলাসময় রসময় ভগবানকে বিলাসপরায়ণ অবস্থায় দেখলে তবে আনন্দ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি পাদ বললেনঃ

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম পর-আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥

জ্ঞানসাধনে ব্রহ্ম, যোগসাধনে পরমাত্মা এবং ভক্তিসাধনে ভগবানকে দর্শন করা যায়। উপাসনা শব্দের অর্থ হল তত্ত্বের নিকট যাওয়া। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হতে উপাসনা নিতে হবে। উপাসনা হল তত্ত্ব ধরার ফাঁদ। পাখী ধরতে হলে ফাঁদে যেমন চার দিতে হয়, পাখী কোথায় আছে জানা নেই, চার দিয়ে ফাঁদ পেতে বসে থাকলে পাখী আপনিই আসবে, তেমনি প্রেমের চার দিয়ে শ্রবণ-কীর্তন ফাঁদ পেতে সাধক বসে থাকলে তত্ত্ব আপনিই আসবে। কারণ তত্ত্ব কোথায় আছে জানা তো নেই। নিরক্ষরের কাছে যেমন শাস্ত্র বহুদূরে তেমনি সাধন অভাবে ভগবান আমাদের

কাছ থেকে বহুদূরে। শাস্ত্র বললেন--ভগবান সর্বত্র আছেন। দুধের সর্বত্র যেমন নবনীত আছে, মন্থন করে যেমন সে নবনীত আহরণ করতে হয় তেমনি সর্বত্র ছড়ান ভগবানকে সাধন মন্থনে তুলতে হবে। সাধক থেকে ভগবানের দূরত্ব পথের দূরত্ব নয়, কিন্তু সাধনের দূরত্ব অনুভবের দূরত্ব। এই দূরত্ব খণ্ডন করবার জন্যই উপাসনা। এই উপাসনাপদ্ধতি তিন প্রকার: জ্ঞান, যোগ, ভক্তি। জগতে দেখা যায় সূর্য দূরে থাকলেও তাকে দেখা যায়—শুধু জ্যোতি দেখা যায়, কিন্তু সপ্তাশ্ববাহন সূর্যকে দেখা যায় না। তেমনি জ্ঞানী কেবলমাত্র জ্যোতি দর্শন করেন। যোগী দেখেন তত্ত্বকে সাকার সাবয়ব, আর ভক্ত ভক্তিচক্ষুতে ষড়ৈশ্বর্যশালী লীলাময় শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন। ভক্তি ভক্তকে ভগবানের অন্তঃপুরে নিয়ে যান। এও অনেক কম করে বলা হল। আরও সূক্ষ্ম করে বলতে গেলে বলতে হয়, অন্তঃপুরসহ তত্ত্ব মহাশয়কে ভক্তের ঘরে নিয়ে আসেন ভক্তি মহারাণী। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ সিদ্ধান্ত করেছেন ভগবানই তত্ত্ব, ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা তাঁর মধ্যে ক্রোড়ীকৃত হয়ে আছেন। এ নিয়ে বিবাদ করে লাভ নেই, বিচার করলেই বুঝা যাবে। ব্রহ্ম যদি খাঁটি তত্ত্ব হন তাহলে পরমাত্মা এবং ভগবান তাঁর নাম হবে—যেমন করেই হোক্ একজন মূল অন্য দুটি তাঁর প্রকাশ।

ভক্ত যে ভগবানকে দর্শন করেন—কি রকম করে দর্শন করেন? ভগবান যদি দেহী না হন তাহলে তাঁকে দেখা পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু কৃপা করে দেখা দেন। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে ভগবান কি নিরবয়ব? তিনি নিরবয়ব নন—সাবয়ব। তবে দেহী

নন—দেহীর মত। সাধারণ দেহীর যেমন আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন বলে দেহী বলা হয়। ভগবানের কিন্তু তা নয়, দেহ হতে আত্মা ভিন্ন নয়—দেহ ও আত্মা অভিন্ন। তাই দেহ ধরলে আত্মা পাওয়ার ব্যবস্থা হয় শ্রীগুরুকৃপায়। আচার্য বেদব্যাস সূত্র করলেন ঃ

অরূপবদেব তৎ প্রধানত্বাৎ। ব্র. সূ.

অদ্বৈতবেদান্তীর গুরু আচার্য শঙ্কর ভাষ্য করলেন তিনি অরূপ, কারণ রূপ আমরা যা কিছু দেখি সবই প্রাকৃত বস্তুতে। কিন্তু ব্রহ্মে রূপ থাকতে পারে না—ব্রহ্মের বিগ্রহ আত্মার সঙ্গে যুক্ত নয়, বিগ্রহই ব্রহ্ম ব্রহ্মই বিগ্রহ। বিগ্রহ এব আত্মা—আত্মা এব বিগ্রহ। ভগবানের অঙ্গকান্তি ব্রহ্ম, অংশ পরমাত্মা—এইটিই বিচারে দাঁড়াল ; ভগবান গীতায় বললেন ঃ

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ গীতা ১৫।১৭

ব্রহ্ম পরমাত্মা সকলে উত্তম পুরুষ কিন্তু আমি এ'দের থেকেও উত্তম। তাই আমি পুরুষোত্তম, ভগবান বলেছেন—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এই দুই পুরুষ হতে আমি ভিন্ন, তাই বিচারে দেখা গেল ভগবানই তত্ত্ব। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যেমন একটি ইন্দ্রিয়ের একটি বিষয় গ্রহণের সামর্থ্য, একটি অপরের বিষয় গ্রহণ করতে পারে না, কান যেমন দুধের শুভ্রতা গ্রহণ করতে পারে না, চোখই যেমন শুভ্রতা বুঝতে পারে তেমনি জ্ঞান, যোগ ভগবানকে সম্পূর্ণ করে বলতে পারে না—ভক্তিই তাঁকে সম্পূর্ণ করে বলে।

ভগবানই সর্বাংশী, তিনিই পরম তত্ত্ব, এই তৎকে যে জেনেছে তার কোন কিছু থেকে ভয় নেই।

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ ভা. ৬।১৭।২৮

ভক্তিরসে চিত্ত ডুবানো থাকলে সেখানে প্রাকৃত সুখ বা দুঃখ কোনটিই স্পর্শ করে না। প্রাকৃত যত সুখই থাকুক না কেন একটি 'প্রাকৃত' নাম সব তাতে লেগে আছে। সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণের পাকে সব সুখই তৈরী, কাজেই সব সুখই পরিণামে দুঃখ। যেমন ঝুড়ি, ছড়ি, পাখা, পুতুল যাই হোক না কেন সবই চিনির পাক। এই 'অতৎ'-এর গণনা হয় না। শাস্ত্র যদি প্রাকৃত বস্তু করণীয় বলতেন তাহলে তো কোন কথাই ছিল না। একে তো জীব প্রবৃত্তিমার্গে ছুটে চলেছে, এর ওপর শাস্ত্র যদি আবার সেই প্রবৃত্তিমার্গেরই পথ দেখাত তাহলে ত জীব কেবল তাই গ্রহণ করত। তাই অতৎ কর্তব্য—এ কথা বললে চলবে না, তৎ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে—তৎ বস্তুই পরতরম্, এইটিই শ্রীমন্মহা-প্রভুর চরম সিদ্ধান্ত। অদ্বয় জ্ঞান লাভ করতে হবে।

মহারাজ নিমি প্রশ্ন করছেন—কেমন প্রকাশে কোন তত্ত্ব হয় বলুন। যোগীন্দ্র উত্তর দিচ্ছেন—তত্ত্বমাত্রই সচ্চিদানন্দ। দ্রব্য থাকলেই তার শক্তি থাকবে। মাটি বস্তু হাতে পাওয়া যায়। সৎ শক্তিকে মনে পাওয়া যায়। বাহু এবং মন দুইই ইন্দ্রিয়। জগতের সব জ্ঞানই সোপাধিক। নিরুপাধিক জ্ঞান এ জগতে নেই। এখানে জ্ঞান মাত্রই বিশেষণযুক্ত। এ জগতের জ্ঞান বা আনন্দ যাই হোক না কেন সবই সবিশেষ, নির্বিশেষ জ্ঞান

আর আনন্দ খুঁজতে হবে। এইটিই সাধন-জগতের কাঠিন্য। এ জগতে সৎ, চিৎ, আনন্দ সবই মেশান; খাঁটি সৎ, খাঁটি চিৎ খাঁটি আনন্দ নেই, খাঁটি অগ্নি এখানে নেই। দেবলোকে খাঁটি অগ্নি আছেন, তাঁর পত্নী স্বাহা আছেন। গোবিন্দের রাজ্যে খাঁটি সৎ, খাঁটি চিৎ, খাঁটি আনন্দ—সৎ চিৎ আনন্দ তিনটি বিশেষগুণের যথাক্রমে তিনটি শক্তি, সন্ধিনী, সংবিৎ এবং হ্লাদিনী। গুণের শক্তি, এটি বলবার জন্য বলা হয়, তা না হলে সৎ ও সন্ধিনী অর্থাৎ গুণ এবং তার শক্তি অভিন্ন। চাঁদ এবং জোৎস্না, প্রদীপ এবং তার প্রভা, অগ্নি এবং তার দাহিকা শক্তি যেমন বস্তুতঃ অভিন্ন। অভিন্ন হলেও দূরে দেখা যায়। চন্দ্রিমা দেখে তারপর আমরা চাঁদ দেখি, শক্তি দেখেই গুণ বুঝা যায়। তেমনি সৎ চিৎ আনন্দ নিজের কক্ষায় থেকেও আনন্দিনী শক্তিকে জগতের কাছে ছড়িয়ে দেয়, সাধকের কাছে এসে আনন্দ দেয়। এইটিই করুণা, এইটিই সাধনের সিদ্ধি। আনন্দিনী রাধাকৃষ্ণ সঙ্গে অভিন্ন থেকেও ভিন্নরূপে প্রতীয়-মানা—এটি লীলাশক্তির প্রকাশ। সৎ চিৎ আনন্দ ভগবানের স্বরূপশক্তি। স্বরূপ যা স্বরূপশক্তিও তাই, তাই শক্তিকেও তত্ত্ব বলা হয়েছে। রাধারাণী কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বলে তিনিও তত্ত্ব হয়েছেন। তাই শ্রীরাধাঠাকুরাণী উপাস্যা। রাধারাণী অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি বলেই উপাস্যা হয়েছেন, তা না হলে শুধু গোবিন্দই উপাস্য হতেন। বহিরঙ্গা শক্তি কখনও উপাস্য হতে পারেন না।

এই পরম তত্ত্ব জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের হেতু।

ইনিই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিকালে ও সমাধিতে বর্তমান, আর দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি এরই দ্বারা চালিত হয়ে ক্রিয়াশীল হয়। এই তত্ত্ববস্তুকে জানার জন্য যোগীন্দ্র নির্দেশ দিলেন, বললেন—'তদ্‌বেহি পরং নরেন্দ্র।' অবেহি অর্থাৎ জানা ক্রিয়া হলেই তার বিষয় থাকবে। কিন্তু ব্রহ্ম তো নির্বিষয়, তার সঙ্গে তো কোন ক্রিয়ার যোগ হতে পারে না, ব্রহ্মের বিষয়তাকে তো নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে 'অবেহি' কথাটি কেমন করে লাগবে ; যোগীন্দ্র বললেন ঃ—

নৈতন্মনো বিশতি বাগুত চক্ষুরাত্মা প্রাণেন্দ্রিয়াণি চ
যথানলমর্চিষঃ স্বাঃ।
শব্দোঽপি বোধকনিষেধতয়াত্মমূলমর্থোক্তমাহ
যদৃতে ন নিষেধসিদ্ধিঃ॥ ভা. ১১।৩।৩৭

শব্দ দিয়ে যদি ব্রহ্মকে বুঝা যায় তাহলে ব্রহ্ম তো শব্দবিষয় হয়ে যায়। কারণ বস্তুবোধক একমাত্র শব্দই। শ্রুতি বললেন, ব্রহ্ম তো শব্দপ্রতিপাদ্য ঃ

তং তু ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি।

ব্রহ্মের নিঃশ্বাস হল বেদাদি শাস্ত্র। কার্য কারণকে প্রকাশ করে, এটি এ জগতে দেখা যায় ; শ্রুতিও ব্রহ্মকে প্রকাশ করে। শব্দ বা শ্রুতি যে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করছে তা বোধকনিষেধতয়া প্রকাশয়তি। মন, ইন্দ্রির এরা বস্তুকে বুঝায় কিন্তু শ্রুতি বললেন— মন তাকে বুঝতে পারে না অথচ মন যার প্রেরণায় মনন করে ; বাক্য তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। অথচ বাক্য যাঁর দ্বারা প্রকাশিত হয় ; চক্ষু তাঁকে দর্শন

করতে পারে না, অথচ চক্ষু যাঁর দ্বারা দৃষ্টি শক্তি পায়। এই ভাবে কোন ইন্দ্রিয়ই তাকে জানতে পারে না। এখন কথা হচ্ছে ব্রহ্ম চিৎ, আর মন ইন্দ্রিয় সবই তো জড়, জড় কেমন করে চিৎকে প্রকাশ করবে? কোন বস্তুকে জানবার উপায় তো মন, ইন্দ্রিয়—তাই দিয়েই যদি ব্রহ্মকে জানা না যায় তাহলে ব্রহ্মকে জানবার উপায় কি? অথচ ব্রহ্মকে তো জানতেই হবে। শ্রুতি বললেন—'যস্য কিমপি বোধকং নাস্তি নদ্ব্রহ্ম।' ব্রহ্মকে শব্দ দিয়ে—'এইটি ব্রহ্ম' এই রকম করে যখন বলা গেল না তখন অর্থাৎ উক্তম্, অর্থতঃ উক্তম্ যথা স্যাৎ তথা। মনে করা যাক কারো যদি 'কলসী' শব্দটি জানা না থাকে অথচ তাকে বুঝাতে হবে তখন উপায় কি? গলাসরু পেটমোটা যাতে জল আনা যায়, মাটির বা ধাতুর পাত্র, এইভাবে অর্থ দিয়ে বলে বুঝাতে হবে। তেমনি ব্রহ্মকে শব্দ দিয়ে, বলে, বুঝান যায় না বটে কিন্তু অর্থ দিয়ে বলতে হবে। আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় ও পাঁচটি বিষয়কে গ্রহণ করে কিন্তু সেই রকম কোন ইন্দ্রিয় বা মন বলতে পারে না 'ইদং তৎ', অর্থাৎ 'এই সেই ব্রহ্ম', তাই শ্রুতি ব্রহ্মকে অর্থত প্রকাশ করলেন। শ্রুতি বলেছেন 'তদ্বিদ্ধি' এবং যোগীন্দ্র বললেন 'অবেহি' এই দুইএর মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। শ্রীবৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বললেন ঃ

আত্মা বা অরে মৈত্রেয়ি দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো
মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

আত্মাকে দেখতে হবে, শুনতে হবে, মনন করতে হবে—দেখা শোনা এবং মনন-এর দ্বারাই বস্তু বুঝা যায়। কিন্তু পঞ্চ-ইন্দ্রিয়

অথবা মন কেউই তো তাঁকে দেখতে শুনতে বা মনন করতে পারে না। পারতে হবে অথচ যারা পারবার উপায়রূপে আছে তারা পারছে না, তবে পারবে কে? যোগীন্দ্র 'অবেহি' বললেন—অথচ শ্রুতি উপায়ের নিষেধ করলেন, এইখানেই অসঙ্গতি। তাহলে বিচারে এইটিই দাঁড়াল যে, ব্রহ্মকে জানবার জন্য আমাদের মন বা ইন্দ্রিয় যখন কাজে লাগল না, অসমর্থ হল তখন জানবার জন্য নূতন লোক চাই। শ্রুতিরও এইটাই অভিপ্রায়। বিজাতীয় বস্তু বিজাতীয় গ্রহণ করে না, তাই শ্রুতি বলেছেন—'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ। প্রকৃতি জড়া আর ব্রহ্ম চিৎ—কাজেই একটি অপরটিকে কেমন করে গ্রহণ করবে? শিশুর যখন হাতে খড়ি হয় তখন শিশু নিজে লিখতে জানে না, গুরুমশাই যেমন তার হাত দিয়ে লেখান তেমনি জীব যখন গোবিন্দ বলে তখন সে নিজে বলে না, শ্রীগুরুদেবই তার মুখ দিয়ে বলেন, কান দিয়ে শোনেন, মন দিয়ে চিন্তা করেন। তাহলেই যোগীন্দ্রের 'অবেহি' পদটি সঙ্গত হবে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ প্রশ্ন তুলছেন, এ তো শ্রুতির বলা হল না—শ্রুতি ব্রহ্মকে বলেন নি—এই কথাই বল, তাহলে অর্থ দিয়ে বললেন—এটি কেন বললেন? তা বলা যাবে না—কারণ ব্রহ্ম যদি না থাকেন তাহলে নিষেধগুলি সিদ্ধ হয় না; ব্রহ্মকে বাদ দিলে নিষেধগুলি দাঁড়াতে পারে না; মনো ন মনুতে, চক্ষু ন পশ্যতি ইত্যাদি নিষেধ বাঁচে না, যদি শ্রুতি ব্রহ্মবস্তুকে লক্ষ্য না করেন। চালে-ডালে অথবা খইএ-ধানে মিশিয়ে শাশুড়ীমা যেমন বউমাকে বাছতে বলেন,

একটিকে চেনা থাকলে অপরটি থেকে সেটিকে আলাদা করা যায়, তেমনি প্রকৃতি শাশুড়ি এ জগতে চিৎ আর জড়কে মিশিয়ে দিয়েছেন। শ্রুতি 'তৎ ন'-কে বলে কিন্তু 'তৎ' বলতে পারে না; কারণ তৎ বস্তু অত্যন্ত বৃহৎ। ব্রহ্মকে লক্ষ্য না করলে, ব্রহ্ম চেনা না থাকলে নিষেধ সিদ্ধি হয় না। রামকে চেনা থাকলে তবে রাম ভিন্ন অন্য বালক দেখলে বলা যাবে এ রাম নয়। শ্রুতি বললেন—'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'—বলা যায় না তা নয়, সাকল্যে বলা যায় না। এই অর্থে বলা হচ্ছে যে বলা যায় না। যার যত অনুভব সে তত বলে আমার কিছু হল না। এ কথাটি বাস্তবিক সত্য। সান্নি-পাতিক বিকারী রোগীর পিপাসার মত, কলসী কলসী জল খেয়েও মনে করে জল কখনও খাই নি। রাধারাণীর কৃষ্ণতৃষ্ণা এই রকম। নিরন্তর কৃষ্ণ-মিলিত তবু মনে হয় কৃষ্ণ চেনেন না। যার যত অধিকার তার তত অভাববোধ। সমুদ্র পার হবার জন্য কেউ সাঁতার দিতে নেমেছে, তীরের লোকেরা দেখছে সে সাঁতরে অনেক দূর গিয়েছে কিন্তু যে সাঁতার দিচ্ছে সে ভাবছে, আমার কিছুই সাঁতার দেওয়া হল না, সামনে অনন্ত জলরাশি। শ্রুতি ব্রহ্ম নিরূপণ করে নি, এ কথা বললে শ্রুত্যর্থের ব্যভিচার হয়। তবে শ্রুতি যে সাকল্যে বলতে পারেন নি, অর্থাৎ সমগ্রভাবে বলতে পারেন নি, একথা সত্য। ব্রহ্ম সম্বন্ধে জেনে সব শেষ করেছি, আর কিছু নেই, এ কথা বলতে পারা যায় না। ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে কথা গৌরগোবিন্দ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। জগতের সকল জিনিষই উচ্ছিষ্ট হয় এবং উচ্ছিষ্ট হলে ক্রমশ সে

বস্তুর স্বাদ কমে যায়; কিন্তু ব্রহ্মকে গৌরগোবিন্দকে আজ পর্যন্ত কত লোকেই তো আস্বাদন করলেন কিন্তু তাঁরা কখনও উচ্ছিষ্ট হন না বা তাঁদের আস্বাদও কখনও কমে না, বরং উচ্ছিষ্ট হলে বেশী আস্বাদ। যেমন শ্রীশুকমুখোচ্ছিষ্ট শ্রীমদ্ভাগবতে রসের আস্বাদ বেশী হয়েছে। তেমনি শ্রীগুরুদেবের উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ আস্বাদিত গৌরগোবিন্দ নামের আস্বাদ বেশী। তামার মুদ্রা এবং সোনার গিনি মিশে গেছে। সোনা চেনা থাকলে তামা ফেলে সোনা নেওয়া যাবে—তেমনি জগতে চিৎ জড় মিশে গেছে—চিৎ চেনা থাকলে জড় ফেলে চিৎ নেওয়া যাবে। জগৎ তো 'তন্নতে' ভরে আছে। এই 'তৎ ন' বাদ দিলে কি অবশিষ্ট থাকে, গীতা বললেন ঃ

ইন্দ্রিয়ানি পরান্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ গীতা ৩।৪২

স্থূলদেহ হতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় হতে মন, এবং মন হতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। যিনি দেহাদিবুদ্ধ্যন্ত সকলের অভ্যন্তরে তিনিই বুদ্ধির দ্রষ্টা পরমাত্মস্বরূপ।

'তন্ন' বাদ দিলে যা থাকে তা হল আত্মা, শ্রুতি এই কথাই অর্থত বলেছেন। যা স্থূল নয়, সূক্ষ্ম নয়, যা দীর্ঘ নয়, হ্রস্ব নয়, যা নাম নয়, রূপ নয়, রস নয়, গন্ধ নয়, শব্দ নয়, স্পর্শ নয়, ……তিনিই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকে বুঝাবার মত কেউ বোদ্ধা নেই, অথচ বুঝতে হবে। এই শূন্য ফাঁক পূরণ করতে হবে। শ্রুতি বললেন ঃ

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

তাঁকে জানা ছাড়া মায়াতরণের অর্থাৎ মুক্তিলাভের আর দ্বিতীয় পথ নেই। তাই মাঝখানে কোন লোক আসা দরকার—ইনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

এখন প্রশ্ন হতে পারে শ্রুতি যদি ব্রহ্মকে নাই বলতে পারেন, ব্রহ্ম অবাঙ্‌মনসোগোচর, ব্রহ্মকে বাক্য ও মনের দ্বারা বিষয় করা যায় না, তাহলে শ্রুতি বলেছেন কেন? ব্রহ্ম প্রতিপাদন করতে না পারলে তো শ্রুতির ব্যর্থতা হয়। তাই যোগীন্দ্র বললেন, শ্রুতি ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ বলতে পারেন নি—বোধকনিষেধতয়া। বলেছেন—অর্থাৎ ব্রহ্ম না থাকলে নিষেধ অনর্থক হয়ে যায়। অভিধা দিয়ে ব্রহ্ম নিরূপণ করতে পারেন নি বটে, কিন্তু তাৎপর্যে নিরূপণ করেছেন। ব্রহ্ম যদি শ্রীগোবিন্দের অঙ্গজ্যোতি হয় তাহলে ব্রহ্ম মনের বিষয়ীভূত হন না কেন? সূর্যের কিরণ কান্তি কি আমরা দেখি না? ভগবানের অঙ্গজ্যোতি যে ব্রহ্ম এ জ্যোতি মায়িক তেজ (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ), এ তৃতীয় মহাভূত নয়। কিন্তু মায়াতীত সচ্চিদানন্দরূপ। আমাদের বাক্য, মন সবই প্রকৃতিজাত, তাই তা কেমন করে ব্রহ্মকে বিষয় করবে? ব্রহ্মকে যদি মনের বিষয় করা না যায়, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয় করা না যায়, তাহলে ঘনীভূত ব্রহ্ম যে ভগবৎবিগ্রহ তাকেই বা কেমন করে মন বা ইন্দ্রিয়ের বিষয় করা যাবে? আর যদি বিষয়ই করতে না পারে, তাহলে সাধক ভজে কোন ভরসায়? ভগবৎবিগ্রহ তো ব্রহ্মের চেয়েও কঠিন, ঘনীভূত ব্রহ্ম। ব্রহ্মই যদি হজম না হয়, তাহলে ব্রহ্মঘন তো হজম হওয়া কঠিন। ব্রহ্ম উপাসকের চেয়ে ভগবানের উপাসক এ জগতে বেশী। ব্রহ্ম

উপাসক তো তবু ব্রহ্মকে মন দিয়ে উপলব্ধি করে তৃপ্ত, ভগবানের উপাসকের আবদার আবার আরও বেশী। ভক্ত শুধু মন দিয়ে বুঝে তৃপ্ত হয় না, চোখে দেখতে চায়, হাত দিয়ে চরণ সেবা করতে চায়, সেবা করবে কাছে থাকবে। তাহলে কি সাধকের এই মনে করতে হবে যে ভগবানকে পাবার আশা নেই? শ্রীচক্রবর্তিপাদ বলেছেন—ভগবদ্বিগ্রহ যদিও সচ্চিদানন্দ তবু সুবিধা আছে। ভগবানের কৃপাশক্তি দ্বারা ভগবানের বিগ্রহও প্রাকৃত লোকের নয়নগোচর হয়। শ্রীগোবিন্দের অঙ্গকান্তির উপমা দেওয়া হল, নীলোৎপলদলশ্যাম, অথবা নবনীরদনিন্দিত কান্তিধর—এ নীলোৎপল বা নীরদ এ জগতের বস্তু নয়, সেটি অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত বস্তুর সঙ্গে তো আমাদের পরিচয় নেই, তাই প্রাকৃত বস্তুর রং এর সঙ্গে আমরা তুলনা করি। কিন্তু সে যে নীলোৎপল, সে চিন্ময় সরোবরে চিৎজলে চিৎকমল। সাধকের ধ্যান প্রাকৃত বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে হয়, আর ভগবান অপ্রাকৃত চিন্ময়। তাই ধ্যান ভগবানকে স্পর্শ করে না, কারণ দুটি বিজাতীয় বস্তু। ধ্যান যদি ভগবানকে স্পর্শই না করে তাহলে ভগবৎ প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? আর প্রাপ্তিই যদি না হয়, তাহলে ধ্যান করেই বা লাভ কি? পাবার তো আশা নেই। সাধকের ধ্যানের কথা ভগবানকে জানিয়ে দেন এমন লোক আছেন, এঁরা ভগবানের নিজ জন। ভগবানের কৃপাশক্তি সাধকের পক্ষপাতিনী। এক কৃপাশক্তি ছাড়া ভগবানের অন্যান্য শক্তি সব ভগবানের পক্ষপাতিনী। এই কৃপাশক্তি গোলোক বৃন্দাবনে বন্ধ্যা, কৃপাশক্তি হলেন শক্তিসম্রাজ্ঞী। তাঁর কাজ হল

পতিতে করুণা করা। কৃপাশক্তি তাই সাধকের পক্ষপাতিনী হয়ে ভগবানকে বলে, 'প্রভু, তোমাকে পতিতের জগতে যেতে হবে, আমাকে সক্রিয় করতে হবে। পতিত জীব, তারা তো তোমাকে দেখে নি, তোমারই অভিন্ন প্রকাশ শ্রীগুরুদেব সাধককে তোমার সম্বন্ধে উপদেশ করেছে। সাধক যদি তোমার দর্শন না পায় তাহলে গুরুবাক্য ব্যভিচারী হবে। তাতে তোমারই অপমান।' তাই ভক্তের ধ্যানে ভগবান কৃপাশক্তির প্রেরণায় সাড়া দেন। শ্রীগুরুদেবের উপদেশ রক্ষার জন্য অতর্কয়া করুণয়া আবির্ভবতি। ব্রহ্ম উপাসকের সাধনের পরিপাক দশায় ভগবানের অনুগ্রহ, ব্রহ্মাকার হৃদয়ে ব্রহ্ম অনুভূতি। শ্রুতির মধ্যে পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্য পাওয়া যাচ্ছে— 'মনো ন মনুতে' আবার 'দৃশ্যতে ত্বগ্রয়াবুদ্ধ্যা'। অনুগ্রহই এটি সমাধান করেন। চিত্ত ভাবনার বস্তুর আকারে পরিণত হয়। মূলে সাধকেরই চেষ্টা থাকে, তাই দেখে ভগবানের অনুগ্রহ হয়। শ্রীবালগোপালের দামবন্ধনলীলাতে দুই আঙ্গুল রজ্জু কম হয়েছিল। এর তাৎপর্য হল সাধকের ভজনের পরিশ্রম ও তাই দেখে ভগবানের অনুগ্রহ। মাকে উপলক্ষ্য করে সমগ্র সাধক জগৎকে ভগবান শিক্ষা দিয়েছেন, সাধনই যদি করিস তাহলে দু' আঙ্গুল কম করে করিস না। ভগবানকে বাঁধবার ইচ্ছা থাকলে নিষ্ঠাপূর্বক ভজনের পরিশ্রম করতে হবে, তাই দেখে ভগবানের অনুগ্রহ হবে। চোখ দিয়ে তাঁকে দেখা বা মন দিয়ে তাঁকে ভাবা, এতে চোখের বা মনের কোন দাম নেই, ভগবানের করুণারই দাম। ভগবানের করুণা দিয়েই ভগবানকে দেখা যায়

এইটিই চরম সিদ্ধান্ত, চোখ বা মন দিয়ে তাঁকে দেখা বা জানা যায় না—গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত। সূর্য বা চন্দ্র দেখতে হলে যেমন তাদের কিরণ দিয়েই তাদের দেখা যায়, অন্য প্রদীপ জ্বেলে দেখতে হয় না, তেমনি ভগবানকে দেখতে হলে ভগবানেরই করুণা দিয়ে তাঁকে দেখতে হয়, এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। সার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন গোপীনাথাচার্যকে প্রশ্ন করেছিলেন, মহাপ্রভু যে ভগবান তার প্রমাণ কি? গোপীনাথ জবাব দিয়েছিলেন—প্রমাণ দিয়ে ঈশ্বর বুঝা যায় না, কৃপা হলে বুঝা যায়। অগ্নিকণা যেমন অগ্নিপুঞ্জকে প্রকাশ বা অতিক্রম করতে পারে না, পুত্র যেমন পিতাকে অতিক্রম করতে পারে না, তেমনি পরমেশ্বর থেকে এসেছে যে মন ইন্দ্রিয় তা দিয়ে তাঁকে জানা যায় না। প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য প্রমাণগুলি ব্রহ্ম সম্বন্ধে খণ্ডিত হয়েছে, যোগীন্দ্র শব্দ প্রমাণকেও প্রায় খণ্ডন করেছেন, বেদশাস্ত্রও এই নিষেধ মুখে ব্রহ্ম প্রতিপাদন করেছেন।

মহারাজ নিমি প্রশ্ন করেছেন—ব্রহ্মকে যদি কেউ বলতেই না পারে, তাহলে তিনি যে অস্তি এ কথা কে বলবে? আনন্দ আছে, দুঃখ আছে—এ কথা মন বলে। বায়ু আছে এ কথা ত্বগিন্দ্রিয় বলে; কিন্তু ব্রহ্ম আছে এ কথা কে বলবে? যদি শ্রুতিও এ জবাব দিতে না পারেন, তাহলে ব্রহ্ম তো নাস্তি হয়ে যায়। তাই ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রতিপাদক বাক্য যোগীন্দ্র বললেন:

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ সূত্রং
মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্।

জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি ব্রহ্মৈব
ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ ॥ ভা. ১১।৩।৩৭

সমগ্র বৈষ্ণবদর্শন অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করেছেন শ্রীজীব এই শ্লোকে। এই শ্রীজীব টীকাটি বুদ্ধিতে ধরে রাখতে পারলে সমগ্র বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে আর কোন অস্পষ্টতা থাকবে না। যোগীন্দ্র যেন মহারাজকে বলছেন, ব্রহ্ম বিষয়ে প্রমাণ পাচ্ছেন না মহারাজ, না? জগতের দৃশ্য, অদৃশ্য যা কিছু আছে সবই ব্রহ্মেরই প্রকাশ। তাহলে সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে কি কোন প্রমাণের অভাব আছে? মাটির বাসনের দোকানে যেখানে সব জিনিষই মাটি দিয়ে গড়া, সেখানে গিয়ে যদি কেউ বলে মাটি পাওয়া যায় না—এ কথা যেমন অসম্ভব, এও তেমনি। ব্রহ্মের আবার প্রমাণ কি? জগতের সবই তো ব্রহ্মের প্রকাশ। প্রমাণ যা প্রমাকে প্রমাণ করে। কাজেই প্রমাণ এবং প্রমা ভিন্ন হওয়া চাই। প্রমা হল কর্ম আর প্রমাণ হল কর্তা। ব্রহ্ম প্রমা কর্ম আর প্রমাণ কর্তা। ব্রহ্মকে কর্ম করতে পারে, এমন যদি কেউ থাকে, তাহলে তাকে ব্রহ্মের প্রমাণ অর্থাৎ কর্তা বলা যাবে; কিন্তু মজা এমনই যে ব্রহ্মকে কর্ম করতে পারে এমন কোন কর্তা নেই। কাজেই ব্রহ্মের কোন প্রমাণ নেই। স্বামি-টীকার সিদ্ধান্ত ব্রহ্ম কোন প্রমাণকে অপেক্ষা করে না। গোস্বামি-পাদগণ যে কাজ করে গেছেন, তা হল আমাদের রুচি সৃষ্টি করবার জন্য। অর্থাৎ কেউ যদি ভজন করতে চায় তার সিঁড়ি গেঁথে দিয়েছেন। ব্রহ্ম জগতে প্রতিটি বস্তুরূপে বিরাজিত। স্বামিপাদ বলেছেন, সৎ অর্থাৎ স্থূল কার্য, অসৎ সূক্ষ্ম অর্থাৎ

কারণ—সবই ব্রহ্ম। এ সম্বন্ধে প্রমাণ কি? কার্য-কারণের অতীত অবস্থায় তিনিই ছিলেন, তখন আর কেউ ছিল না—তিনিই সৎ তিনিই অসৎ। মহারাজ নিমির পক্ষ থেকে স্বামিপাদ যেন প্রশ্ন করছেন—এক ব্রহ্ম বহুর কারণ হয় কি করে? 'নন্থ' কথমেকং বহুবিধস্য কারণম্? জগতে তো দেখা যায় প্রত্যেক কার্যের কারণ ভিন্ন ভিন্ন। যেমন মাটি ধাতুর কারণ হতে পারে না—তার উত্তরে যোগীন্দ্র বললেন, ব্রহ্ম উরুশক্তি। অনেক শক্তিমান বলে তিনি এক হলেও জগতের বহু কার্যের কারণ। ভগবানের শক্তি বহুরূপী—ত্রিগুণাত্মিকা মায়া ব্রহ্মের শক্তি। আদিতে যে ব্রহ্ম এক ছিলেন—একমেবাদ্বিতীয়ম্—সেই ব্রহ্ম সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিবৃৎ হলেন (ইনিই প্রধান বা প্রকৃতি)। প্রত্যেকের মধ্যে কার্যকারিতা শক্তি হল সূত্র এবং জ্ঞানশক্তির দ্বারা মহৎ তত্ত্ব, অহমিতি অহঙ্কারের দ্বারা উপাধি জীব, সব সেই এক ব্রহ্ম। তারপর জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়া, জ্ঞানশব্দের দ্বারা দেবতা, ক্রিয়া ইন্দ্রিয় এবং অর্থ পঞ্চবিষয়, ফল সুখ দুঃখ—এ সব রূপে ব্রহ্মই বিরাজিত। স্বামিপাদ যোগীন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করে বলছেন, যে ব্রহ্ম সকলরূপে দৃশ্যাদৃশ্যরূপে স্বতঃ ভাসমান, সেই ব্রহ্মের সিদ্ধির জন্য অন্য কোনও প্রমাণের অপেক্ষা নেই।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেছেন, তস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ স্বাভাবিক-রূপম্, ব্রহ্মের শক্তি আগন্তুক বা ঔপাধিক নয়—অদ্বৈতবাদীর যুক্তি দিয়েই বেদান্তদর্শন ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। অদ্বৈতবেদান্তীর মতে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময়—নির্গুণ, নিরাকার, নিঃশক্তিক।

তাঁদের মতে ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করলেই এই শক্তিটি হবে ঔপাধিক। ব্রহ্ম যখন ধনুর্ধারণ করে রাম অবতার হয়েছেন, তখন ব্রহ্ম উপাধিগ্রস্ত হয়েছেন ঔপাধিক শক্তিকে স্বীকার করে, ব্রহ্ম কৃষ্ণ হয়ে গিরিধারণ করেছেন। তাঁরা বলেন ব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিক নয় ঔপাধিক। তাঁদের যুক্তি হল, ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করলে বিকার আসে। বিগ্রহ থাকতে পারে, তাই সেই ভয়ে অদ্বৈতবাদ ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন নি। কোন আকারও ব্রহ্মের তাঁরা স্বীকার করেন না ; কারণ কোন আকার স্বীকার করলেই বিকারকে স্বীকার করা হল। যেমন সুবর্ণ থেকে কুণ্ডল, অন্যথারূপের নামই বিকার। বিকার না করলে আকার হয় না, আর বিকার হলে তো খাঁটি হয় না। ব্রহ্ম বিকৃত বস্তু নয়, ব্রহ্মের যদি শক্তি স্বীকার করা হয়, তাহলেই এই বিকার আসে। তাই অদ্বৈতবেদান্তী ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন নি। প্রবাদ আছে, আচার্য শঙ্কর একসময় বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনা করছিলেন। তাতে ব্রহ্মের নিঃশক্তিক অবস্থা প্রতিপাদন করেছেন। এমন সময় দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করতে গিয়ে পড়ে যান, উঠবার ক্ষমতা থাকে না। তখন স্বয়ং শক্তি একটি বালিকার রূপ ধারণ করে এসে বললেন—'আচার্য ওঠ'। আচার্য বললেন আমার উঠবার শক্তি নেই। বালিকা বললেন —'কেন আচার্য, তোমার তো শক্তির প্রয়োজন নেই। তবেই বুঝতে পারছ, শক্তি না থাকলে কোন কাজই হয় না। অতএব ব্রহ্মের যে শক্তি আছে এটি তুমি মনে প্রাণে অন্ততঃ স্বীকার কর। বাইরের জগৎকে ভুলাবার জন্য যাই প্রচার কর না কেন

মনে প্রাণে কিন্তু বিশ্বাস কর যে ব্রহ্মের শক্তি আছে এবং সে শক্তি স্বাভাবিক।' অদ্বৈতবেদান্তী ব্রহ্মের কোন ক্রিয়া স্বীকার করেন না। গুণ স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, গুণ যা কিছু তা প্রকৃতির। শ্রীজীবপাদ ঐ জায়গায় দৃষ্টি দিয়ে বলেছেন —ব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিক। ব্রহ্মকে যখনই সচ্চিদানন্দ বলা হল অর্থাৎ ব্রহ্মকে যখন সৎ, চিৎ, আনন্দ বলে স্বীকার করা হল, তখন তার শক্তি আছে স্বীকার করা হল। কারণ একটি বস্তু কখনও তিনটি হতে পারে না। সৎ, চিৎ, আনন্দ তিনটি পৃথক বস্তু। প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি থেকে পৃথক। ঘট যে পট থেকে ভিন্ন বুঝা যায় কেমন করে? ঘটের ঘটত্বই ঘটকে পট থেকে পৃথক করে রেখেছে। তেমনি সৎ এর সত্তা, চিৎ এবং আনন্দ থেকে পৃথক করে রেখেছে। তাই তার নাম হয়েছে সৎ। চিৎ এর ভাবও তেমনি সৎ এবং আনন্দ থেকে পৃথক করে রেখেছে বলে তার নাম চিৎ। আবার আনন্দের ভাব সৎ এবং চিৎ থেকে পৃথক করেছে বলে তার নাম আনন্দ। বস্তুর তদ্‌গত ভাব তার সংজ্ঞা দান করে। এর ভেদ তিন প্রকার—সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত। যেমন মনুষ্যত্ব ভাব মানুষকে অন্য থেকে পৃথক করে। সৎ-এর সত্তাই তাকে অসৎ থেকে পৃথক করে রেখেছে। সৎ-এর ভাবকেই সত্তা বলে। এই ভাবেরই অপর নাম শক্তি। সৎ-এর শক্তি সৎ-এ, চিৎ-এর শক্তি চিৎ-এ, আনন্দের শক্তি আনন্দে আছে। সৎ ও সত্তা, চিৎ ও তার ভাব, আনন্দ ও তার ভাব পরস্পর অভিন্ন এবং তৎ তৎ গুণে নিহিত। যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নি থেকে অভিন্ন এবং অগ্নিতে নিহিত।

অগ্নির শক্তি স্বাহা। সৎ-এর শক্তি সন্ধিনী, চিৎ-এর শক্তি সংবিৎ এবং আনন্দের শক্তি হ্লাদিনী বা আনন্দিনী। এ শক্তি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের আগন্তুক নয়। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বললেন—'ওহে অদ্বৈতবাদী, তোমরা তোমাদের ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলছ—যে সৎ সেই চিৎ এবং সেই আনন্দ, অর্থাৎ একই বস্তু তিনটি—সৎ-ও যা চিৎ-ও তাই এবং আনন্দ-ও তাই। এ কথা বললে শ্রুতি অভিধান হয়ে পড়ে, পর্যায়তাপত্তি এসে যায়। তাই তিনটি এক বস্তু বললে চলবে না। তিনটি পৃথক বিশেষণ স্বীকার করতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ বললে তবে ব্রহ্মের গায়ে এ বিশেষণ দেওয়া যাবে। যেমন লাল ফুল আন বললে সাদা ও কাল থেকে তাকে পৃথক করা যায়, তেমনি সৎ, চিৎ, আনন্দও পৃথক পৃথক, তাই নির্বিশেষ বলা যাবে না, সবিশেষ বলতে হবে। অদ্বৈতবাদীরা এই শক্তিত্রয়কে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন এবং ব্রহ্মে এই শক্তি নিহিত এ কথা স্বীকার করেন না ভয়ে। পাছে শক্তি স্বীকার করলে ব্রহ্মে বিকার এসে যায়। আচার্য শঙ্করের জন্ম শিব অংশে—শক্তি এবং বিগ্রহ থাকলেও যে ব্রহ্ম অবিকৃত হতে পারেন, এটি আচার্য প্রকাশ করেন নি। কারণ তাঁর প্রয়োজন নেই। কিন্তু গোস্বামিপাদ তা করলেন। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে শ্রীদশমে দেবতারা স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন :

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতং চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥

—ভা. ১০।২।২৬

স্বামিপাদ টীকায় বললেন ত্রিসত্যম্, অর্থাৎ ত্রিষু কালেষু, অব্যভি-

চারিত্বেন বর্তমানম্—ব্রহ্মের এই শক্তি অচিন্ত্য। শ্রীজীবপাদ বললেন, শক্তি ব্রহ্মের স্বাভাবিক রূপ। যেবস্তু নেইতার নাম হয় না এ কথা যে বলা হল, তা তো হয় দেখা যায়, যেমন আকাশকুসুম। আকাশকুসুম শব্দে আকাশ শব্দ সত্য, আবার কুসুম শব্দও সত্য, কিন্তু দুটি শব্দের মিলন অসত্য। ব্রহ্ম যে সৎ চিৎ আনন্দ বলা হয়েছে, সৎ চিৎ আনন্দ আছে বলেই শব্দ প্রয়োগ হয়েছে। তিনটি শব্দ তিনটি শক্তিকে লক্ষ্য করেই হয়েছে। এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপকে বুঝাচ্ছে। ব্রহ্মের সত্তা স্বীকার করে তাকে সৎ বললে তা চিৎ এবং আনন্দ থেকে পৃথক বুঝা গেল। এই রকম চিৎ বললে সৎ এবং আনন্দ থেকে পৃথক আবার তাঁকে আনন্দ বললে সৎ এবং চিৎ থেকে পৃথক। সৎ-এর ভাবই সৎ শক্তি, চিৎ-এর ভাবই চিৎ শক্তি, আনন্দের ভাবই আনন্দ-শক্তি। ব্রহ্ম উরুশক্তি, ব্রহ্মই প্রতিভাত হচ্ছেন। এটি কল্পিত নয়। এ সবই ব্রহ্মের শক্তি। ব্রহ্মণ এব সা শক্তি ন তু কল্পিতা। এর পক্ষে প্রমাণ কি? যেহেতু ব্রহ্মই সৎ অর্থাৎ কার্য, স্থূল পৃথিব্যাদিরূপ। কারণ অসৎ সূক্ষ্ম প্রকৃত্যাদিরূপ, অর্থাৎ কার্যকারণরূপ। এর নাম বহিরঙ্গবৈভব। এর পরে তয়োঃ পরম্—সেটি কি? এটি বলতে হবে স্বরূপবৈভব, অর্থাৎ বহিরঙ্গবৈভবের পরে যা তা হল স্বরূপবৈভব। শ্রীবৈকুণ্ঠধাম প্রভৃতি বৈভব—সচ্চিদানন্দশক্তি এবং শুদ্ধ জীবরূপ তটস্থ বৈভব।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এগুলি যে ব্রহ্মেরই তা কেমন করে প্রমাণ হবে? এগুলিকে যদি ব্রহ্মের বলে স্বীকার করা না যায় তাহলে

তাদের সিদ্ধি হয় না, কারণ এদের আগে তো ব্রহ্ম ছাড়া আর কেউ ছিল না—'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ'। মহদাদিলক্ষণ জ্ঞানশক্তি, সূত্রাদিলক্ষণ ক্রিয়াশক্তি, তন্মাত্র প্রকৃতি, এ সবই তাঁর সদসৎরূপ, এর পরে যেটি সেটি ফলরূপ, অর্থাৎ এইটিই স্বরূপ-বৈভব। আচ্ছা, এখন ব্রহ্মের শক্তিই যদি বৈকুণ্ঠ (স্বরূপবৈভব) এবং জগৎ (বহিরঙ্গবৈভব) হয় তাহলে তাদের প্রকাশ তো এক নয়, ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ দেখা যায়,—শক্তির ভিন্নতায় প্রকাশ ভিন্ন। তটস্থ শক্তি হল শুদ্ধ জীব—তটস্থ বলা হল কেন? জীব (শুদ্ধ) বস্তুতঃ চিৎ কিন্তু ব্রহ্মের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গার মাঝখানে তার অবস্থিতি বলে তাকে তটস্থ বলা হয়েছে। শিশুকে মাঝখানে রেখে যেমন একদিকে মা অন্যদিকে বাবা থাকেন। একদিকে পরমপিতা পরমেশ্বর চিৎ,অন্য দিকে বহিরঙ্গা মায়াশক্তি প্রকৃতি মা। জীব ইচ্ছা করলে পরমপিতার অন্তরঙ্গা শক্তির দিকে দৃষ্টি দিতে পারে কিন্তু অনাদি কাল থেকে তার যে অবস্থান হয়ে আছে তাই আছে,বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দিকে দৃষ্টি দিয়েই মায়াকে সামনে করেই সে দাঁড়িয়েছে, জীব অনাদি ভগবদ্বি মুখ, ভগবানকে পিছু করে দাঁড়িয়েছে। স্বরূপবৈভবকে পিছনে করে মায়ার দিকে সামনে করে তার অবস্থান। চিৎ পিতা নিজের বিলাসে আনন্দে মেতে আছেন তাঁর জীবকে ডাকবার কোন প্রয়োজন নেই,তাই ডাকেন নি। তিনি নিজে না ডাকলেও সন্তানের জন্য তাঁর চিন্তা তো আছে। তাই তাঁরই অভিন্ন স্বরূপ সাধু-গুরু-বৈষ্ণব তাকে ডাকেন—'ওরে জীব, এদিকে ফিরে তাকা!' কঠোপনিষদ বলেছেন:

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎস্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
—কঠ. ১।২।১

জীবের ইন্দ্রিয় পরাঞ্চি—অর্থাৎ ভগবানকে পেছনে করে আছে। জীব অনাদি কৃষ্ণবিমুখ, যে যেমন লোক তার তেমনি জামা হবে। জীব অনাদি কৃষ্ণবিমুখ, তাই তার যা উপকরণ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি, তাও কৃষ্ণবিমুখতা দিয়ে তৈরী। জীব তাই মায়াকেই দেখছে আত্মাকে দেখছে না। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্ধু যদি জীবকে টেনে আত্মার সামনে দাঁড় করিয়ে দেন তাহলে সে আত্মাকে দেখে নতুবা দেখে না। এই তটস্থা জীবশক্তিও তয়োঃ পরম্-এর মধ্যে পড়ে। শুদ্ধ জীবও তয়োঃ পরম্। মায়া-শক্তির দ্বারা জীব সম্মোহিত হয়। ব্রহ্মের স্বরূপবৈভবকে ফলরূপ বলা হয়েছে। ফল যদি চাওয়া যায়, তাহলে কার্য-কারণের অতীতের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এই ফলটি হল পুরুষার্থ। এই পুরুষার্থ বস্তুটি কি? ধর্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গ প্রকৃতির অন্তর্গত। ত্রিবর্গ বাদ দিয়ে মোক্ষ বা মুক্তিও এই পুরুষার্থফলের মধ্যে পড়তে পারে। এই পুরুষার্থ হল তয়োঃ পরম্ আর তদনুগত শুদ্ধ জীবরূপ চিদ্বস্তুও এই ফলের অন্তর্গত। শুদ্ধজীবও ফলের মধ্যে পড়ে। আত্মারামদের জন্য এই ফল। যারা আত্মাতে রমণ করে তারা কার্যকরণের অতীত শুদ্ধ জীবাত্মা। ভগবানের অনুগত বলে সেও ফলের মধ্যে পড়ল। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস—এ স্বরূপ জেগে উঠবেই, যদি ভগবানের সঙ্গে তার সম্বন্ধ হয়। শুদ্ধ জীবের স্বরূপ হল সেবকস্বরূপ, সেব্যের সঙ্গে সম্বন্ধ হলেই তার সেবকস্বরূপ জেগে যায়, তাই শুদ্ধ

জীব মাত্রই ভগবানের অনুগত। যে ব্রহ্মের শক্তি এত ভাগে বিভক্ত তিনি উরুশক্তি তো বটেই।

ব্রহ্মের শক্তি যে স্বাভাবিক, সেটি শ্রীজীব প্রমাণ সহকারে বুঝিয়েছেন। আদিতে এক ব্রহ্ম ছিলেন, তাঁর থেকেই প্রকৃতি। এ কোন ওস্তাদের কাছ থেকে পাওয়া শক্তি নয়,—কারণ ব্রহ্ম ছাড়া আর কারও অস্তিত্বই তো ছিল না। তাই এ শক্তি ব্রহ্মের উপাধি হতে পারে না। উপাধি হলেই সেটি দ্বিতীয় বস্তু হবে। বৈকুণ্ঠাদি ধাম স্বরূপবৈভব বলে ব্রহ্মের সঙ্গে এ ধামও ছিল, কারণ স্বরূপবৈভব ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মত। যেমন কোন ব্যক্তি থাকলে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গও তার সঙ্গে আছে বুঝে নিতে হবে। সূর্য থাকলেও যেমন তার রশ্মি পরমাণুও তার সঙ্গে নিত্য আছে, তেমনি ব্রহ্মের রশ্মির মত বৈকুণ্ঠবৈভবও নিত্য। কিন্তু সূর্য থাকলেও যেমন রশ্মির সত্তা তেমনি ব্রহ্মের সত্তায় বৈকুণ্ঠাদির সত্তা। সূর্য এবং রশ্মি অভিন্ন হলেও সূর্যকে রশ্মির প্রকাশক বলা হয়। তেমনি ব্রহ্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত বৈকুণ্ঠাদি ব্রহ্মধাম হলেও ব্রহ্মকে বৈকুণ্ঠের প্রকাশক বলা হয়।

ব্রহ্মের শক্তি যে স্বাভাবিক ও অচিন্ত্য, তা বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে—মণি, মন্ত্র, মহৌষধির কাজ যেমন অচিন্ত্য, এও তেমনি। ব্রহ্ম সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তা কি করে বলা যায়? বিষ্ণুপুরাণে বাক্য আছে:

নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।

এই বাক্যের ওপরে মৈত্রেয় ঋষি শঙ্কা তুলেছেন—ব্রহ্ম যদি নির্গুণ হন তাহলে তাঁর পক্ষে জগতকর্তৃত্ব কেমন করে সম্ভব হয়?

নির্গুণ হওয়ার জন্য ব্রহ্মে কর্তৃত্বের বাধকতা আছে, কারণ গুণ থেকেই সৃষ্ট্যাদি কাজ দেখা যায়। শ্রীপরাশর এই শঙ্কার উত্তর দিয়েছেন—হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয়, অগ্নির যেমন উষ্ণতা শক্তি আছে ব্রহ্মের তেমনি সমস্ত শক্তিই আছে, এইজন্য ব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব বলা হয়েছে। স্বামিপাদ টীকায় বলেছেন— সত্ত্বাদিগুণরহিত, অপ্রমেয়, দেশকালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, শুদ্ধ অর্থাৎ সহকারিশূন্য, রাগাদিশূন্য অর্থাৎ অমলাত্মা এবং ভূতব্রহ্ম কেমন করে সৃষ্ট্যাদির কর্তা হতে পারেন? কুম্ভকারের গুণ আছে তাই সে ঘটের কর্তা হতে পারে। শ্রীপরাশর শঙ্কা পরিহার ক'রে বলেছেন—তথাপি ব্রহ্মের শক্তি অচিন্ত্যজ্ঞান গোচর। অচিন্ত্য কেন? শক্তি বস্তু থেকে ভিন্ন না অভিন্ন, চিন্তা করতে পারা যায় না, তাই অচিন্ত্য বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে বস্তু থেকে শক্তি ভিন্ন অথবা অভিন্ন চিন্তাই যদি না করা যায় তাহলে বুঝা যাবে কেমন করে, যে শক্তি আছে? অর্থাপত্তিতে বুঝতে হবে। পীনঃ দেবদত্তঃ অহ্নি ন ভুঙ্‌ক্তে,—এটি অর্থাপত্তিতে বুঝতে হবে। সে পীন অর্থাৎ স্থূল, অথচ দিনে যখন খায় না, তখন রাত্রিতে খায়। এইভাবে ব্রহ্মেরও যে শক্তি আছে সেটিও ভাবে বুঝতে হবে। ব্রহ্মের যে সৃষ্ট্যাদি শক্তি এটি ভাবশক্তি, অর্থাৎ স্বাভাবিক শক্তি, অর্থাৎ স্বরূপ হতে অভিন্ন। শ্রুতি বলেছেন:

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ॥

এই শ্রুতিবাক্য শুনবার পরও যদি ব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিক

স্বীকার করা না যায় তাহলে আর কি করা যাবে? জেগে যদি কেউ ঘুমায় তাহলে তাকে জাগান যায় না। জগতে দ্রব্যের শক্তি স্বাভাবিক নয়। বাধা পেলে শক্তি যদি ব্যাহত হয় তাহলে তাকে স্বাভাবিক শক্তি বলা যায় না; সে শক্তি আগন্তুক। ব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদি শক্তিকে কেউ ব্যাহত করতে পারে না। তাই ব্রহ্মের এ শক্তি স্বাভাবিক। মণি, মন্ত্র, মহৌষধির শক্তিও ব্যাহত হয়। তাই সে শক্তিকে স্বাভাবিক বলা চলে না, কিন্তু ব্রহ্মের শক্তি কখনও ব্যাহত হয় না। তাহলে সিদ্ধান্ত দাঁড়াল যে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য নিরঙ্কুশ। এতে কোন অযৌক্তিকতা নেই, শ্রুতি পুরাণ সকলেই স্বীকার করলেন ব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিক। তিনিই মহান, সূত্র. তন্মাত্র, প্রকৃতি, জগৎ, জীব, স্বরূপবৈভব—এই বিভিন্ন রূপে প্রকাশমান।

শ্রীজীবপাদ বলছেন, অত্র ইয়ং প্রক্রিয়া। এটি শ্রীজীবের নিজের মত। স্বরূপবৈভব, তটস্থবৈভব এবং বহিরঙ্গাবৈভব তিনটি বৈভবের উৎপত্তিস্থান ব্রহ্মই। প্রথমটি সচ্চিদানন্দ, দ্বিতীয়টি অণুচৈতন্য এবং তৃতীয়টিতে সচ্চিদানন্দময়তা একেবারেই নেই। ভগবান যে নিজমুখে বলেছেন—'মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে'। এইখানেই বৈষ্ণবদর্শন বেঁচে আছে। সবাইকেই মানতে হবে। অদ্বৈত-বাদমতে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। তাদের কোন বালাই নেই। তারা ব্রহ্ম ছাড়া আর সব বস্তুকেই মিথ্যা বলে। তারা বলে ব্রহ্মকে জগৎ বলে জীব ভ্রম করেছে। অবিদ্যাবশে ভ্রম হয়েছিল, আলো এলেই ভ্রান্তি চলে যাবে। বস্তু যা ছিল তাই থাকবে, জ্ঞানালোকে জগৎ দর্শন থাকবে না, ব্রহ্মদর্শনই হবে।

ভ্রমে যে জগৎবোধ হয়েছিল, তা চলে যাবে। শ্রীজীবপাদ এই মতটি খণ্ডন করেছেন। শ্রীজীবপাদ বলছেন, ওহে অদ্বৈত-বাদী, তুমি তো অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে বসেছ, দ্বিতীয় বস্তু মানবে না। তা শুধু দ্বিতীয়বস্তু কেন, তৃতীয় বস্তু পর্যন্ত তো তুমি স্বীকার করেছ। রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হবে—এখানে অন্য একটি বস্তু তো রজ্জু বলে স্বীকার করলে। আবার কার ভ্রম হবে? চেতন যে তারই তো ভ্রম হবে। তাহলে চেতন জীব একজন আছে স্বীকার করা হল। এতে তোমার নিজের মত তো নিজেই খণ্ডন করলে। ব্রহ্ম তো একজন চেতন আছেনই। তা ছাড়া অপর একজন জীবচৈতন্য স্বীকার করা হল। এতে অদ্বৈত-বাদের হানি হল। যদি বল ব্রহ্মই জীবের অবস্থায় পড়ে ভ্রান্ত হয়েছে, যেমন মহাকাশ ঘটের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হওয়ায় ঘটাকাশ হয়ে যায়. তেমনি অবিদ্যা নিমিত্ত ঘটরূপ অন্তঃকরণে ব্রহ্মচৈতন্য প্রবেশ করে জীব হয়েছে। ব্রহ্ম অখণ্ড হলেও ঘটাবরণে খণ্ড হয়েছে, তাহলে অদ্বৈতবাদী, তোমার এই সিদ্ধান্ত দাঁড়ল—ব্রহ্মকে কোন বস্তু দিয়ে আবরণ করা যায়—রজ্জু ব্রহ্ম অভ্রান্ত, জীবব্রহ্ম ভ্রান্ত—তাহলে তো অদ্বৈতবাদ টিকল না। জীবকে আলাদা বলে স্বীকার করতেই হবে। বৈষ্ণবদর্শন মতে জগৎ সত্য। গীতায় সংসারবৃক্ষকে অব্যয় বলা হয়েছে। এই সংসারবৃক্ষ অব্যয় এবং অশ্বত্থ দুইই। অশ্বত্থ মানে যেটি আগামী কাল পর্যন্ত থাকবে না। এ অবস্থা কখন হবে—যদা হি মহাপুরুষপুরুষপ্রসঙ্গঃ। জগৎ চিরকাল থাকবে না, কিন্তু যখন থাকবে তখন সত্য। স্বপ্ন

মিথ্যা, কারণ এর মূলে কোন সত্য নেই। কিন্তু জগৎ যাঁর থেকে হয়েছে তিনি সত্যস্বরূপ।

অদ্বৈতবেদান্তী বলেন—ব্রহ্ম নির্গুণ, মায়াগুণ মিশ্রিত হয়ে সগুণ হয়ে তিনি রামচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্ররূপে অবতার হয়েছেন। খাদ না মিশালে যেমন খাঁটি সোনার আকার হয় না, তেমনি মায়ার গুণ মিশ্রণ ছাড়া দেহধারণও অসম্ভব। তবে ব্রহ্মের দেহধারণের সময় প্রকৃতির রজঃ ও তমঃ গুণকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র সত্ত্ব গুণকে গ্রহণ করা হয়েছে। বৈষ্ণবদর্শন কিন্তু তা বলেন না। তাঁদের মতে নির্গুণ ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দের অঙ্গকান্তি। ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ দ্বারা বিভূষিত হলে তাঁকেই সগুণ ভগবান বলা হয়। এতে মায়াগুণের স্পর্শও থাকে না। ভগবান মায়াতে বিচরণ করেও মায়া স্পর্শ করেন না, যেমন বুদ্ধি আত্মাতে আশ্রিত হলেও আত্মার গুণ তাতে স্পর্শ করে না।

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ ভা. ১।১১।৩৮

এই মতটি মনের মধ্যে দৃঢ় হলে তবে তার পক্ষে কৃষ্ণকথা শুনবার অধিকার জন্মে। আশ্চর্য বলে মনে হয়—জলে নামবে অথচ কাপড় ভিজবে না—এ উদাহরণ জগতে পাওয়া যায় না। অন্বয়মুখে উদাহরণ মেলে না, ব্যতিরেকমুখে উদাহরণ তাও কথঞ্চিৎ। অচিন্ত্য প্রভাবেই ঈশ্বরত্ব। ভগবান প্রকৃতিতে স্থিত হয়েও প্রকৃতিকে স্পর্শ করেন না, উদাহরণ মেলে না, কারণ উদাহরণ যা হবে তা তো লৌকিক বস্তু নিয়ে।

উপরের শ্লোকটি ভগবানের দেহরক্ষীর কাজ করেছে।

ভগবান তো রক্ষিত হয়েই আছেন, তাঁর পক্ষে প্রয়োজন নয়, কিন্তু আমাদের বুদ্ধির কাছে এটি দেহরক্ষীর কাজ করেছে। অর্থাৎ ভগবানের সম্বন্ধে কোন কথা চিন্তা করার আগে মনে রাখতে হবে যে কোনপ্রকার মায়াগুণ তাঁকে স্পর্শ করে না। ব্যতিরেকমুখে উদাহরণ যেমন—বুদ্ধি আত্মাকে আশ্রয় করে আছে।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ গীতা ৩।৪২

বুদ্ধি আত্মাতে স্থিত কিন্তু আত্মার সচ্চিদানন্দময়তা গুণ বুদ্ধিতে স্পর্শ হয় না। ভাগবতদর্শন মতে ব্রহ্মকে মায়া কখনও কোন অবস্থাতে স্পর্শ করে না, যেমন পরশমণি কখনও লোহার থালায় থাকে না। পরশমণি লোহা স্পর্শ করলেই যেমন লোহা সোনা হয়ে যায়, ঈশ্বরও তেমনি প্রকৃতি স্পর্শ করেন না। প্রকৃতিকে স্পর্শ করলেই সেটি অপ্রাকৃত হয়ে যায়। ভক্ত যখন ভগবদ্দর্শন করে তখন ভক্তদেহ চিন্ময় হয়ে যায়। শ্রীগৌর-সুন্দরের স্বরূপ তাই স্বরূপ-জাগান স্বরূপ। ব্যাঘ্রকে স্পর্শ করে তার স্বরূপ জাগিয়ে প্রেমে নাচিয়েছেন। শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজ কীর্তনপ্রসঙ্গে গেয়েছেন :

ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার অভাবের সঙ্গ করে না—
ভাবের অভাব রাখতে পারে না—
স্বভাব জাগায়ে করে সঙ্গ—

ঈশ্বর সর্বদা নির্গুণই আছেন, অর্থাৎ প্রকৃতিগুণস্পর্শহীন। বৈষ্ণব দর্শন মতে ঈশ্বরমাত্রই নির্গুণ প্রাকৃতগুণরহিত এবং যখন লীলাযুক্ত হন তখনই তিনি সগুণ। জলের বুদ্‌বুদ্ বা

তরঙ্গ যেমন জল ছাড়া কিছু নয় এবং অণুজলে তা দেখা যায় না। এটি বিভুজলের বিলাস, তেমনি সচ্চিদানন্দ বিভুর নিত্য-বিলাস লীলাতরঙ্গ। ভগবৎ-ক্রীড়ার নামই লীলা—এই গুণ এবং লীলা বিবিধপ্রকার। বৈষ্ণবদর্শনে ঈশ্বর মাত্রই নির্গুণ অর্থাৎ প্রাকৃতগুণরহিত আর যখন লীলাযুক্ত হন, তখনই তিনি সগুণ। ব্রহ্মকে অরূপ, অনাম বলা হয়েছে। ভাগবতসন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ বিচার করেছেন, ভগবানের রূপ প্রাকৃত রূপ নয় তাই অরূপ, এবং ভগবানের নাম প্রাকৃত নাম নয়। তাই অনাম বলা হল, প্রাকৃত শব্দ ভগবানের নাম নয়। প্রাকৃত শব্দ উচ্চারণ করলে বাচ্য আসে না, যেমন 'বৃক্ষ', 'বৃক্ষ', জপ করলে বৃক্ষ কাছে আসে না। কিন্তু ভগবানের নাম জপ করলে বাচ্য আসে, কারণ নাম এবং নামী অভিন্ন, বরং নামে ভোগ কিছু বেশী। নামে বাচক বাচ্য দুই-ই আছে, কিন্তু নামীতে শুধুই বাচ্য। তাই নামী অপেক্ষা নাম বেশী শক্তিশালী। কৃষ্ণ, গোবিন্দ নাম বললে স্বরূপ পাওয়া যায়। নামীকে নামায় বলেই 'নাম, বলা হয়। নামই তাকে নামায়। প্রাকৃত রূপের নশ্বরতা গোবিন্দে নেই, তাই অরূপ জগতের সব কিছুই ব্রহ্মের প্রকাশ। স্বরূপবৈভব ধাম লীলা পরিকর—এদের ধ্যান করলে কাজ হবে। কিন্তু জীব চিন্তা করে লাভ নেই, কারণ জীব অণু। অণু যে তার অভাব জেগেই আছে। এ জগতেও দেখা যায়, যে বিষয়ে অণু সে সেই বিষয়ে বিভুর কাছে যায়—অণু প্রার্থী, বিভু দাতা, অণু উপাসক; বিভু উপাস্য। তাহলে দেখা গেল, একই তত্ত্ব স্বরূপ, স্বরূপ বৈভব, তটস্থ বৈভব, জীবরূপে এবং বহিরঙ্গা

বৈভব জড় জগৎরূপে এই চতুর্ধা বর্তমান। স্বরূপ এবং স্বরূপ-বৈভব উপাস্য, জীব উপাসক। বহিরঙ্গা জগৎ উপাস্যও নয় উপাসকও নয়। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে, বহিরঙ্গা বৈভব এই জগতের তাহলে প্রয়োজন কি? উপাস্য ও উপাসক হলেই তো কাজ মিটে যায়; কিন্তু তারও প্রয়োজন আছে। মা সন্তান প্রসব করলেও ধাইমার কাজও তো বড় কম নয়। বহিরঙ্গা জগৎ ধাইমার কাজ করেছে। এই মায়ার জগৎ উপাসনার উপকরণ যুগিয়েছে। আসন পাতা, জল দেওয়া, ফুল চন্দন যোগাড় করা—এগুলি মায়াশক্তিরই কাজ। মায়া বলছেন, আমার দেওয়া এই সব উপকরণ দিয়ে হে জীব, তোমরা প্রাণভরে গৌর-গোবিন্দ বল।

ব্রহ্মের স্বরূপ, স্বরূপবৈভব জীব এবং প্রধানরূপে যে প্রকাশ সেটি সূর্য, সূর্যমণ্ডলের তেজ, মণ্ডলের বাইরের তেজ এবং প্রতিচ্ছবির মত। সূর্যের প্রতিবিম্ব চোখ ঝলসিয়ে দেয়। পরমাত্মাকে বাদ দিয়ে যা প্রকাশ পায় তারই নাম মায়া। প্রতিবিম্ব সূর্য নয়, সূর্যের আভাস, অবশ্য সূর্য না থাকলে এই আভাস হয় না। দর্পণে যে প্রতিবিম্ব তা সূর্য নয়, তেমনি ভগবান আছেন বলেই বহিরঙ্গার কাজ আছে। জীব হল দ্রষ্টা, মায়া এই জীবের বুদ্ধিরূপ নেত্রকে ব্যাকুলিত করে, আবৃত করে এবং বর্ণশাবল্য সৃষ্টি করে অর্থাৎ সত্ত্বাদি প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তুলেছে—যার বর্ণ সাদা, লাল এবং কাল। পরে এই প্রধানই নানা আকারে স্ত্রী-পুত্ররূপে প্রকাশ পায়। চোখ বন্ধ থাকলেই বর্ণশাবল্য এবং মিথ্যা নানা আকারে দেখা যায়, কিন্তু চোখ

খুললে আর সে সব দেখা যায় না। তেমনি শ্রীগুরুকৃপায় যখন ভক্তিচক্ষু উন্মীলিত হবে তখন আর নানা আকার দেখতে হবে না—তদনুগতরূপে দেখবে। বৈষ্ণবদর্শনমতে স্বরূপ এবং স্বরূপশক্তি অভিন্ন। অদ্বৈতবেদান্ত স্বরূপ স্বীকার করে কিন্তু স্বরূপশক্তি স্বীকার করে না—এইখানেই উভয় মতে পার্থক্য। স্বরূপ এবং স্বরূপশক্তি যদিও অভিন্ন, তথাপি স্বরূপশক্তি স্বীকারে সৌন্দর্য বেশী হয়। যেমন গোলাপের মাধুর্য্য আগে পাওয়া যায় না, আগে কাঁটার আঘাত লাগে, তেমনি কেবল সৎ, কেবল চিৎ, কেবল আনন্দ, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের উপাসনাতেও তেমনি কাঁটার আঘাতই লাগে। তাই ভগবান বললেন ঃ

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ গীতা ১২।৫

শক্তি বিকশিত না হওয়া পর্যন্ত আনন্দ নেই। বিকশিত শক্তির মধ্যেই ক্রিয়া আছে এবং ক্রিয়াতেই আনন্দ। তখন সান্নিধ্যে গেলেই আনন্দ, শক্তি না থাকলে আনন্দ পেতে পারে না। আচ্ছা, ব্রহ্ম তো সর্বব্যাপক, তাহলে আর সাধক তার দিকে এগিয়ে যাবে কেমন করে? বস্তু সর্বব্যাপক হলে তার দিকে এগিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই, তবে করণীয় কি? শক্তিকে নিজের দিকে উন্মুখ করার চেষ্টাই হল সাধনা। ভগবৎকরুণা না পেলে যদি অচল অবস্থা হয়, তাহলে অনুকূল চেষ্টা করতে হবে। এই অনুকূল চেষ্টাই শ্রবণাদি ভক্তিযাজন। মায়ার বৃত্তি ত্রিবিধা—প্রধান, বিদ্যা, অবিদ্যা। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে :

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

মায়া প্রথমে তার প্রকৃতি উপাদানে গঠিত বস্তু জীবকে দিতে সাহস করে নি। কারণ জীবের স্বরূপ তো মায়া জানে, সে নিত্যকৃষ্ণদাস—সে কেন এই পচা জিনিষ নেবে? আত্মজ্ঞানের বোধ থাকা পর্যন্ত সে মায়ার জিনিস স্পর্শ করবে না। মায়া তো জানে, তাই আত্মজ্ঞান অর্থাৎ জীবের স্বরূপটি ভোলাবার জন্য অবিদ্যাকে জীবের কাছে পাঠাল। অবিদ্যা জীবের আত্ম-স্বরূপ ভুলিয়ে দেবার পর মায়ার দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি জীবকে গছাল। তখনই জীবের 'আমি', 'আমার'—এই বোধ হল। মায়ার তৃতীয়া শক্তি বিদ্যা—এ শক্তি মহামায়া প্রায়ই খরচ করেন না। এই বিদ্যাবৃত্তি লাভের জন্যই মহামায়ার উপাসনা করা হয়। মহামায়ার কাছে শিশুর মত প্রার্থনা করতে হবে, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে। বলতে হবে—'মা, এতদিন তো তোর অবিদ্যাবৃত্তি দিয়ে আমাদের ভুলিয়ে রেখেছিস্, এখন তা সরিয়ে তোর বিদ্যাবৃত্তি আমাদের একটু দান কর। বিদ্যা জ্ঞান দান কর, যাতে অবিদ্যাবন্ধন রজ্জু কেটে যায়। বিদ্যাবৃত্তির কৃপা দান করে অবিদ্যাবন্ধন ছেদন কর।' এর জন্যই মহামায়ার আরাধনা করা দরকার। অজ্ঞানতাই বহিরঙ্গার সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ করিয়েছে। মায়ার দেওয়া বস্তু যে আসলে সৎ নয়, 'সদিব' সেটি জীব যাতে বুঝতে পারে, এর জন্য মায়া চেষ্টা করে। পুত্রকে জীব সৎ ভাবে, মায়া পুত্রকে মেরে ফেলে জীবকে বুঝায়—জীব। পুত্র তোমার সৎ নয়, অর্থকে জীব সৎ ভাবে—

মায়া অর্থ নাশ করে বুঝায় অর্থ সৎ নয়। জীবকে প্রতি পদে পদে বুঝাতে চেষ্টা করছে—মায়ার জগৎ সৎ নয়, 'সদিব'—এটি বুঝে নিয়ে আসল সৎ-এর দিকে ফিরে যাও। জীবকে মহামায়ার এইটিই সুযোগ দেওয়া, গোবিন্দপাদপদ্ম স্মরণ করাবার ইঙ্গিত। কিন্তু আমরা এতই মূর্খ যে তাঁর ইসারা আমরা বুঝি না। স্বরূপ শক্তি সাক্ষাৎ উপাস্য কিন্তু বহিরঙ্গা সাক্ষাৎ উপাস্য নয়। অতিথির মতই জীব মায়ার রাজ্যে এসেছে—থাকার জন্য আসে নি, যাবার জন্যই এসেছে। যাবার মত অবস্থা তৈরী করে যেতে হবে। মহামায়া আমাদের প্রাকৃত দেহ, ইন্দ্রিয় দিয়েছেন এবং তাই দিয়ে আমরা কৃষ্ণপাদপদ্মে যাবার যোগ্যতা অর্জন করে নিতে পারব, এটি মহামায়ার দান—এই ভেবে মহামায়ার আনন্দে বুক ভরে আছে। দোষে গুণে বস্তু—কৃষ্ণপাদপদ্মে যাওয়ার যোগ্যতা যে অংশ থেকে পাওয়া যাবে না, সংসারের সে অংশটি ত্যাজ্য, গৌরগোবিন্দ চিন্তার বিরোধী যা তা ত্যাজ্য। এক ভরি সোনার ডেলা এবং এক ভরি সোনার হার—এই দুই-এর মধ্যে উপভোগ্য বলে যেমন হারটিই গ্রহণীয় তেমনি ব্রহ্মবস্তু সোনার ডেলার মত আর গোবিন্দ হলেন হারস্থানীয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম উপভোগ্যতা নয়; কিন্তু সলীল ভগবান তৎক্ষণাৎ উপভোগ্য। সোনাকে যতটা গঠন করে হার করা যায়, ততটা গোবিন্দের উপভোগ্যতা। আনন্দের গঠন এর চেয়ে বেশী হতে পারে না।

'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে অদ্বৈতবেদান্ত বললেন—তৎই ত্বম্ অথবা ত্বম্ই তৎ, অর্থাৎ জীব এবং ব্রহ্মের অভেদ। তাই যদি হয় তাহলে তৎ পূর্ণানন্দ ত্বম্ পূর্ণদুঃখ কেন? অদ্বৈতবেদান্ত

বললেন—কোন অংশ ত্যাগ করে, কোন অংশ গ্রহণ করে 'তৎ ত্বম্ অসি' এই মহাবাক্য গ্রহণ করতে হবে। তারা জীবকে ব্রহ্ম করবেই। তা না হলে অদ্বৈত থাকে না। স্বপ্নে দেখা বনের বাঘ তাড়া করলে বাঘের তাড়া মিথ্যা হলেও কলেবর যেমন ঘর্মাক্ত হয়, তেমনি সংসার বনে অবিদ্যা বাঘ তাড়া করেছে তাতে জীব ভীত সন্ত্রস্ত। স্বপ্ন ভাঙলে যে তুমি সেই তুমি। জহৎবৃত্তি এবং অজহৎবৃত্তি ধরে যেমন স্থান, কাল, স্থূল, কৃশ, ধনী, দরিদ্র ভেদ সত্ত্বেও 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' বলা হয়। এই মতে উপাধি বাদ দিয়ে শুদ্ধ দেবদত্তপিণ্ডে লক্ষণা, এখানেও তেমনি শুদ্ধ চৈতন্যে লক্ষণা—তদেকান্ত জীব, শ্রীপাদ বললেন। সূর্যমণ্ডলের বাইরের রশ্মিস্থানীয় হল শুদ্ধজীব। একান্ত শব্দের অর্থ চৈতন্যাংশে জীব ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়েও ভিন্ন। ব্রহ্ম না থাকলে জীব থাকে না, কিন্তু জীব না থাকলে ব্রহ্ম থাকে। এই অংশে ভেদ। অণুচৈতন্য জীবের চৈতন্য দেহের সর্বাংশে ব্যাপ্ত। আচার্য বেদব্যাস বললেন—হরিচন্দনবিন্দুবৎ, প্রদীপ-প্রভাবৎ হৃদয়ে চৈতন্য থাকে; কিন্তু চিমটি কাটলে পায়ে লাগে। আলোর মত গৃহের এক জায়গায় থেকেও সর্বত্র আলোকিত করে। মুক্ত দশাতেও, এমন কি ব্রহ্মসাযুজ্য অবস্থাতেও ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের ভেদ বর্তমান। শ্রুতি বললেন—'যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধম্ আসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। তস্য ইব দৃশ্যতে—তাদৃক্।' তাদৃক শব্দটিও সাদৃশ্যবাচক। তাদৃক্ বললেন,—অর্থাৎ তার মত, তৎ বলেন নি। সাদৃশ্য বলতে তাই বুঝায়—'তৎ ভিন্নত্বে সতি

তদ্‌গতভূয়োধর্মবত্ত্বম্।' যেমন চাঁদের মত মুখ, ব্রহ্ম সম ব্রহ্ম হল না। এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাদৃক্ বলছ কেন? তৎই বল। মধ্বাচার্য বললেন—এক পোয়া জলে এক পোয়া জল মিশালে আধসের হয়, ওজন বেড়ে যায়। এক পোয়া আর থাকে না। বাইরে থেকে জল (যেটি মিশান হল), তার পৃথক সত্তা প্রতিভাত হয় না বটে, কিন্তু বিচারে নিজ সত্তার ভেদ বর্তমান। জীবও তেমনি নিজ সত্তা বজায় রাখে। জীব ব্রহ্মের সঙ্গে চিদংশে অভেদ হয়েও নিত্য ভেদ বজায় রাখে। ব্যবহারিক জগতে তো এ ভেদ বর্তমান। রাজা এবং প্রজা উভয়ই মানুষ; কিন্তু তার ভেদ বর্তমান। মানুষ অংশে মাত্র অভিন্ন। ব্রহ্ম সাযুজ্য কেমন করে হয়? বিচারে ভেদ থাকে, তবে চোখে ভেদ দেখা যায় না।

যদি ত্বম্ পদার্থ বুঝা যায়, তাহলে তৎ বস্তু বুঝা যাবে। দর্শন শাস্ত্র মাত্রই 'তৎ'-কে বুঝাবে এবং এই 'তৎ'-কে বুঝাবে বলেই 'ত্বম্‌কে' বুঝাচ্ছে। গীতায় ২য় অধ্যায়ে ভগবান এই 'ত্বম্' পদার্থ জীবাত্মাকেই নিরূপণ করেছেন। 'ত্বম্' না বুঝলে 'তৎ' বুঝা যাবে না। কারণ ত্বম্ অর্থাৎ জীবাত্মাই তত্ত্বের বোদ্ধা। তত্ত্ব বুঝতে জীবাত্মা ছাড়া আর কেউ পারে না। দেহ ইন্দ্রিয়—চতুর্বিংশতি তত্ত্ব কেউ পারে না। মনের চেতনবৃত্তি অণুচৈতন্য। তারা নিজেকে আলোকিত করতে পারে—সকলকে পারে না। সকলকে যিনি আলোকিত করেন, তিনি পরমাত্মারূপে সহস্রারে আছেন। শুদ্ধ ভক্তিমার্গে ত্বম্ খুঁজতে হবে না, 'তৎ' কৃষ্ণপাদ-পদ্ম খুঁজতে হবে। এটি খুঁজতে খুঁজতেই 'ত্বম্' পাওয়া যাবে।

মহাজন বলেছেন,—সোনার মোহর ও লোহার ছুঁচ দুইই হারিয়েছে। মোহর হল কৃষ্ণপাদপদ্ম এবং লোহার ছুঁচ হল আত্ম-জ্ঞান। আলো জ্বালতে হবে মোহর খুঁজবার জন্য, ছুঁচ খুজবার জন্য নয়। মোহর খুঁজবার জন্য আলো জ্বাললে ছুঁচ আপনিই পাওয়া যাবে। আর ছুঁচ যদি নাও পাওয়া যায়, তাতেও যায় আসে না। গোস্বামিপাদ বলেছেন,—ভক্তিপ্রেমের আলো জ্বাললে কৃষ্ণপাদপদ্ম তো পাওয়া যাবেই আত্মজ্ঞান লাভও বাদ যাবে না। কারণ কৃষ্ণপাদপদ্ম জ্ঞানলাভের সঙ্গে আত্মজ্ঞান অনুগতই থাকে। 'স্বতঃসিদ্ধ জীবর নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।' কৃষ্ণপাদপদ্ম যখন পাওয়া যাবে, তখন জীবের জ্ঞান হবে—'কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান'। কৃষ্ণকেই প্রভু মনে হলেই নিজেকে দাস বলে মনে হবে—'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস'—এই জ্ঞানটিই তো জীবের নিজস্ব স্বরূপ। তাহলে কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হলেই আত্মজ্ঞানও তদনুগতভাবে লাভ হয়ে যায়। আমি কেমন ? আমি কৃষ্ণদাস—এইটি খুঁজে পাওয়াই আত্মজ্ঞান লাভ। যেমন পাকের জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত করলে খাদ্য তো প্রস্তুত করেই, তাতে ক্ষুধা নিবারণ হয় আবার শীত নিবারণও করে। যদিও শীত নিবারণের জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয় নি। তেমনি প্রেমখাদ্য রাঁধবার জন্য ভক্তি অগ্নি জ্বাললেও প্রেম রান্না করে গোবিন্দ পাদপদ্ম তো মিলিয়ে দেবেই, উপরন্তু অবিদ্যারূপ শীতাদি জড়তাও নিবারণ করবে। যোগীন্দ্র এইভাবে অণুচৈতন্য জীবত্মাকে বুঝিয়ে বিভুচৈতন্য পরমাত্মাকে বুঝাবেন।

আত্মার জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত কোন ভাববিকারই নেই। জন্মাদি যা কিছু দেহ-ইন্দ্রিয়ের। এই দেহ আবার দুরকম— স্থূল এবং সূক্ষ্ম। যেমন গাছ আছে তাতে প্রতি বছর ফল জন্মায়, ফুল ফোটে। তেমনি মৃত্যুর পর দেহ-ইন্দ্রিয় জন্মাচ্ছে। আত্মা যেমন তেমনি থাকে—তার জন্ম হয় না। দেহের, মনের সুখ-দুঃখ আত্মার গায়ে লাগে না কারণ আত্মা সম্বন্ধে বলা হয়েছে সে হল অবস্থাবতাং দ্রষ্টা। অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি যাদের অবস্থান্তর আছে তাদের সকলকে দর্শন করে, কিন্তু ন হি তদবস্থাং ভবতি। যেমন রোগীর কষ্টের দ্রষ্টা চিকিৎসক, তাই বলে রোগীর কষ্ট তো চিকিৎসক অনুভব করে না। আত্মার নিজের কোন অবস্থা নেই, সে দেহের অবস্থা দেখছে মাত্র। এ আত্মা অবিনাশী, উপলব্ধি মাত্র জ্ঞানৈকরূপম্। আত্মা আত্মাকে বুঝে, অর্থাৎ আত্মা নিজেই কর্তা, নিজেই কর্ম—জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় সবই আত্মা। তখন নিমিরাজার পক্ষ থেকে স্বামিপাদ প্রশ্ন তুলেছেন আত্মা যদি উপলব্ধিমাত্র হয়, তাহলে তো ক্ষণিকপক্ষ এসে যায়। বৌদ্ধের ক্ষণিকবাদ—প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি, তৃতীয় ক্ষণে বিনাশ। উপলব্ধি যে ক্ষণে হচ্ছে সেই ক্ষণেই মাত্র আত্মার বোধ। অন্য সময়ে আর আত্মবোধ নেই। না তা বলা যাবে না। আত্মা সর্বদা সর্বত্র অনপায়ী, আত্মার কখনও বিনাশ হয় না। জ্ঞান ঠিক থাকে উপাধির বিনাশ হয়; যেমন, নীলজ্ঞানম্ জাতম্ পীতজ্ঞানম্ নষ্টম্। মাটির দোকানে যেমন হাঁড়ি-কলসী যাই ভাঙুক, মাটি ভাঙে নি—আকার ভাঙে, মাটি ভাঙে না। তেমনি দেহ-ইন্দ্রিয়াদি

ব্যভিচারী বস্তুর মধ্যে থেকেও আত্মা অব্যভিচারী। এই আত্মাকে উপলব্ধি করতে হবে। ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে লয় করে আত্মাকে জানতে হবে। এখন কথা হচ্ছে এই ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে লয় করবে কে? এই আত্মাকে খুঁজবার সুবিধা করে দেবে দর্শন—এইটিই দর্শনের উপকারিতা। কিন্তু এই আত্মাকে তো আমরা অবিকারী হিসাবে দেখতে পাই না—বিকারী বলেই তো তাকে উপলব্ধি করি; যেমন, অহং পিতা, অহং মাতা, অহং কুলীনঃ অহং পণ্ডিতঃ—এ সবই তো বিকৃত আত্মার পরিচয়। দেহাদির বিকার আত্মাতে লাগবে কেন? আগুন যেমন হাঁড়িতে লাগলেও জল তো গরম হচ্ছে। জীবের তিনটি অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগ্রত অবস্থাতে ইন্দ্রিয় জেগে থাকে, স্বপ্নাবস্থায় মন-অহংকার জেগে থাকে, আর সুষুপ্তিতে অহংকার থাকে না—কুটস্থ আত্মার উপলব্ধি হয়। তখন আত্মার গায়ে জড়ান উপাধি ঘুমিয়ে গেছে। সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা হল উপাধিশূন্য আত্মা, এখানে অহঙ্কার পর্যন্ত লয় হয়ে যায়। তাহলে আত্মা তো শূন্য হয়ে যায় না, অন্য পার্শ্বচর সব মরে গেলেও আত্মা থাকে। এইটিই শুদ্ধ আত্মা। আত্মা যে থাকে সুষুপ্তিকালে তা কেমন করে বুঝা যায়? কারণ সুষুপ্তি ভাঙবার পর অনুস্মৃতি হয়। তখন আর বিশেষ জ্ঞান থাকে না—'সুখমহমস্বাপ্সম্—ন কিঞ্চিদবেদিষম্—'আমি খুব সুখে ঘুমিয়েছি, কিছুই জানতে পারিনি'—এই বোধ হয় মাত্র। সুষুপ্তিকালে সুখময় আত্মা সাক্ষী, তখন এই অনুভব হয়—পরে তারই স্মরণ হয়। অনুভব না থাকলে পরে স্মরণ হতে পারত না।

সুষুপ্তিকালে সুখের অনুভূতি আত্মাই করেছিল—যে অনুভব করে সেই আত্মা।

এখন নিমিরাজ প্রশ্ন করছেন—সুষুপ্তিকালে যদি নিত্য আত্মানুভবই হয়, তাহলে জাগ্রত অবস্থায় জীব আবার সংসারবন্ধনে যুক্ত হয় কেমন করে ? সংসারবন্ধনই যদি পুনরায় হয় তাহলে এই আত্মানুভবের কি দাম ? সুষুপ্তিকালে যে আত্মানুভব হয় এ অনুভব অস্পষ্ট। বিষয় সম্বন্ধে অস্পষ্ট। শ্রুতি বলেছেন—দ্রষ্টা এবং দৃশ্য দুই-ই লোপ হতে হবে, তবে আত্মানুভব স্বচ্ছ হবে এবং স্বচ্ছ হলে বিষয়বাসনা ত্যাগ হবে। এই স্বচ্ছ আত্মানুভূতি কেমন করে হবে ? সুষুপ্তিকালে অবিদ্যা ও তার সংস্কার থেকে যায়। 'তাই আত্মানুভূতি স্বচ্ছ হতে পারে না। তখন মহারাজ নিমি প্রশ্ন করেছেন—তাহলে কখন অর্থাৎ কি ভাবে আত্মানুভূতি স্বচ্ছ হবে যাতে বিষয়বন্ধন,অর্থাৎ সংসার আর থাকবে না। যোগীন্দ্র বললেন—এর আর দ্বিতীয় উপায় নেই। মহারাজ, একমাত্র অব্জনাভ শ্রীভগবানের চরণে উরুভক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই। এই উরুভক্তি মহতী ভক্তির দ্বারা চিত্তের গুণ এবং কর্মজনিত মলিনতা দূরীভূত হয়। কর্ম তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। রাজসিক তামসিক কর্মের মালিন্য তো আছেই, সাত্ত্বিক কর্মেরও মালিন্য আছে। চিনির রস তো সবই মিষ্টি, তবু ভাল খাদ্য করতে গেলে চিনির রসেরও যেমন গাদ ফেলতে হয়, তেমনি সাত্ত্বিক কর্মজনিত মালিন্যকেও ত্যাগ করতে হবে। এই ময়লা কি ? যা ফেলে দিতে হবে তার নামই মালিন্য। সত্ত্বগুণ থেকে

আত্মজ্ঞান জন্মায় এটিও গাদ, এটিও মালিন্য ; একেও ত্যাগ করতে হবে। ভগবান বলেছেন—'জ্ঞানঞ্চ ময়ি সন্ন্যসেৎ'। গোবিন্দপাদপদ্মের রসমাধুরী সন্দেশ যারা তৈরী করবে তাদের পক্ষে সাত্ত্বিক কর্মের গাদ ফেলতে হবে। এই গাদ অন্য গবাদি পশুর খাদ্য হয়ত হতে পারে, কিন্তু সন্দেশের কারিগরের তাতে প্রয়োজন নেই। তেমনি সাত্ত্বিক কর্ম জ্ঞানী, যোগী, নিষ্কাম কর্মীর হয়ত গ্রহণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু গোবিন্দপাদপদ্মসেবী ব্যক্তির পক্ষে তা পরিত্যাজ্য। চিত্তকে ধৌত করে নিতে হবে। শ্রবণ-কীর্তনরূপ জল সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। অন্য কিছু দিয়ে পরিষ্কার করা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য—'চেতোদর্পণ-মার্জনম্'—ধাতুর ময়লা যেমন জল দিয়ে ধুলে যায় না, আগুনে পোড়াতে হয়, তেমনি চিত্তসোনাকে আগুনে দিতে হবে। জীব-চৈতন্য তো খাঁটি সোনা। সোনা যারা চেনে তারা দেখেই বুঝতে পারে, খাঁটি সোনা না খাদ আছে। সাধু-গুরু-বৈষ্ণব জীবকে দেখেই বললেন—স্বরূপ জীবের খাঁটি সোনারই বটে ; কিন্তু খাদ থাকায় রঙ ঠিক ফোটে নি। অর্থাৎ অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার দেখা যাচ্ছে না। তাই তারা বললেন এতে খাদ আছে। উরুভক্তি অর্থাৎ অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তির দ্বারা এই খাদ দূর করতে হবে। প্রাকৃত এষণা ত্যাগ করে গোবিন্দচরণ এষণার নাম উরুভক্তি। আর এষণা মানে এস না। আদর করে ডাকা—'হে গোবিন্দ, এস না—গোবিন্দ, তুমি না এলে আমার হবে না।' ভগবান উদ্ধবজীকে বলেছেন চোখের জল দিয়ে চিত্ত ধৌত না করলে চিত্ত শুদ্ধ হবে কেমন করে? চক্ষু

নির্মল হলে যেমন সূর্য দেখা যায়, তেমনি গোবিন্দচরণে যদি উৎকণ্ঠাময়ী ভক্তি লাভ হয়, তাহলে তার দ্বারা কেবলমাত্র আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করবে কেন? তাই শ্রীজীবপাদ বললেন—আত্মতত্ত্ব তো অতি সামান্য, সেই বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারা সে ভগবানকে উপলব্ধি করবে। আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ আত্মনঃ জীবাত্মনঃ তত্ত্বম্ আশ্রয়ঃ। জীবাত্মার যিনি তত্ত্ব অর্থাৎ আশ্রয়—অর্থাৎ শ্রীভগবান শ্রীগোবিন্দকেই উপলব্ধি করবে। মহতী ভক্তির দ্বারা চিত্ত মার্জিত হলে তাতে মধুসূদনের প্রতিবিম্ব পড়ে। কিন্তু প্রাকৃত দর্পণের প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্বই থাকে, ছায়াই থাকে, কায়া থাকে না, বস্তু থাকে না; কিন্তু সত্য বস্তুর ছায়া প্রতিবিম্ব হয় না। তাই চিত্তে প্রতিবিম্ব পড়ে না বস্তুই পড়ে। বিম্বই পড়ে, প্রতিবিম্ব নয়। যদি প্রতিবিম্ব হত তাহলে ভগবান ঠিক ঠিক তেমন বুঝা যেত না। কারণ প্রতিবিম্বের নিজস্ব কোন স্বাধীনতা নেই—যেমন যেমন বিম্ব প্রতিবিম্বের কাজ ঠিক তেমনি। তবে যে চিত্তকে দর্পণ বলা হল. প্রতিবিম্বের মত মনে হয়—ভগবান ঠিক কেমন প্রথমে বুঝা যায় না। প্রথমে অনুমান করা হয়, ঈষৎ অনুভূতিই প্রতিবিম্বস্থানীয়। শুদ্ধাভক্তি শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্তন মহাদাবাগ্নি নির্বাপণ করে। মহাদাবাগ্নি বলা হল কারণ এ আগুন জল দিলে নেবে না, এ জগতের জলে নেবে না, গোবিন্দ বলে ডাকার অশ্রুতে এ অগ্নি নির্বাপিত হয়। কৃষ্ণ নিজে আজ কৃষ্ণ নামের বিশেষণ দিচ্ছেন। ভক্ত না হলে ভগবানের নাম বুঝতে পারে না। এই জন্যই শ্রীগৌর-সুন্দর আজ ভক্তাবতার হয়ে এসেছেন, ভগবদানন্দের কাছে

ব্রহ্মানন্দও তুচ্ছ। ভগবানের নামকে ভগবান বোধে দয়া প্রার্থনা করতে হবে। নিষ্ঠাপূর্বক প্রার্থনা করতে হবে। নিষ্ঠা করে আশ্রয় করলে তিনি কখনও ফিরিয়ে দেন না। চন্দন ঘষলে যেমন সুবাস, তেমনি হরিনামকে ঘষে তার মাধুর্য বার করতে হবে। নামকে জিহ্বাতে উচ্চারণ করার নামই নামকে ঘসা। কৃষ্ণনাম মায়াসক্তের পক্ষে ঔষধ, আবার সেই নামই মায়ামুক্তের পক্ষে খাদ্য বা পথ্য। ভগবানের নাম, রূপ, গুণলীলা স্বাদু স্বাদু পদে পদে। কৃষ্ণপাদপদ্ম-প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা যাতে আছে আর কিছু নেই তার নামই শ্রেষ্ঠভক্তি।

এই ভক্তি সর্বথা অত্যাজ্য—মুক্ত অবস্থাতেও গোবিন্দপাদপদ্ম সেবা ছাড়া চলে না। প্রাপ্তি তো সেবা—এই সেবাই তো ভক্তি। ভগবানই তো ভক্তি। ভগবানই তো তত্ত্ব, তবে তার প্রকাশ তিন প্রকার—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান—'অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন'। তত্ত্ব যদি এক হয়, তাহলে তত্ত্বপ্রাপিকা সাধনও এক হবে। তাই সাধনও একাভক্তি। তত্ত্ব এক ভগবান, কিন্তু প্রকাশবিশেষে, যেমন—ব্রহ্ম পরমাত্মা তত্ত্ব, তেমনি সাধনও একা ভক্তি, কিন্তু প্রকাশবিশেষে জ্ঞান যোগ হয়েছে—ভক্তির অঙ্গ জ্ঞান, অংশ যোগ। এর পরে ব্রহ্মানুভব, অনুভব অর্থাৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষ আত্মানুভূতি। এই আত্মানুভূতির পর সে ব্রহ্মভূত হয়। তখন তার শোক, মোহ, আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তখন ক্ষুৎপিপাসা আত্মা থেকেই মিটবে। ব্রহ্মভূত মানে এ নয় যে, ব্রহ্ম হয়ে যায় কিন্তু ব্রহ্মভূত হওয়া

মানে ব্রহ্মের গুণ পাবে। ব্রহ্মভূত ব্যক্তি প্রসন্নাত্মা অর্থাৎ নির্মল চিত্ত হবে। ন শোচতি—এমন বস্তু থাকবে না, যার জন্য শোক করতে হবে, অর্থাৎ প্রাপ্তব্য কিছু থাকবে না। সর্বভূতে সমদৃষ্টি হবে, জগতের সবই মায়িক বলে বুঝেছে, সব প্রাণীতেই আত্মা চিৎ এক আর দেহের যে প্রকৃকির উপাদান তাও সম। তাই সমজ্ঞান ভক্তির সাহায্যে আত্মানুভব করাচ্ছে, এখানে ভক্তি প্রধান হয় নি। কারণ ভক্তির ফল আত্মানুভব নয়, তাই ভক্তিকে আড়ালে রাখা হল, যে ভক্তি গোবিন্দকে বশীভূত করে তার ফল মাত্র আত্মানুভব হতে পারে না। ভক্তি মা পুত্র জ্ঞানকে পাঠিয়ে কাজ করে, অর্থাৎ আত্মানুভব করা। তাই ভক্তি-মিশ্র জ্ঞান, কিন্তু জ্ঞানমিশ্র ভক্তি নয়। আত্মানুভবের পরে জ্ঞান চলে গেল। জ্ঞান চলে যাবার পর ভক্তি থাকল এবং সে ভক্তি আরও পুষ্ট হল 'মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্'। ভগবানের শ্রীমুখের বাক্য 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি'। ভক্তির দ্বারা সম্যক জেনে 'বিশতে তদনন্তরম্'—বিশতে প্রবেশ করে —ব্রহ্মপক্ষে ব্রহ্মসাযুজ্য, ভগবৎপক্ষে পার্ষদ্গতি। ব্রহ্ম যে ভগবানেরই অঙ্গজ্যোতি। তাই ভক্তি ছাড়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারও হবে না—ভক্তি থেকে উদ্ভূত গোবিন্দের জ্ঞান—জ্ঞান চলে যাবার পর যে জ্ঞান তারই নাম ভক্তি এবং একে লক্ষ্য করেই ভগবান বললেন—'ভক্ত্যা মামাভিজানতি'—এই দিয়ে ব্রহ্ম অনুভূতি। এর পরে ব্রহ্মসাযুজ্য। আচ্ছা, যদি ভক্তি দিয়েই সব পাওয়া যায়, তাহলে শুধু ভক্তি আশ্রয় করলেই হয়। ভক্তির দ্বারা ব্রহ্ম তো পাবেই, ভগবানকেও পাওয়া যাবে। ভক্তি যদি শুধু

ব্রহ্মানুভব করায় তাহলে তার দাতৃত্ব যোগ্য হয় না। তাই ভগবানের পাদপদ্মও দেয়। আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ জীবাত্মার আশ্রয় উপলব্ধ হয়—আত্মানুভূতি তো হয়ই। দৃষ্টি স্বচ্ছ হলে যেমন সূর্যের প্রকাশ তাব কাছে অতি সুন্দর, তেমনি ভক্তিচক্ষুতে আত্মানুভূতি অথবা আত্মাব আশ্রয় ভগবানকে উপলব্ধি বড় সুন্দর।

—

ষষ্ঠ প্রশ্ন

পঞ্চম যোগীন্দ্র শ্রীপিপ্পলায়নের শ্রীমুখে যখন মহারাজ নিমি শুনলেন যে জীবের হৃদয়ে যে গুণজাত ও কর্মজাত মালিন্য জমা হয় তা একমাত্র অক্তনাভ শ্রীগোবিন্দচরণে শুদ্ধাভক্তির দ্বারাই ক্ষালন করা সম্ভব হয়—অন্য কোন উপায়ে সম্যক ক্ষালন সম্ভব হয় না, তখন নিমিরাজ এই কর্ম কাকে বলে এটি শুনবার জন্য পরম উৎসুক হয়েছেন। তাই ষষ্ঠ প্রশ্নটি তুললেন ঃ

কর্মযোগং বদত নঃ পুরুষো যেন সংস্কৃতঃ।

বিধূয়েহাশু কর্মাণি নৈষ্কর্ম্যং বিন্দতে পরম্॥ ভা. ১১।৩।৪২

হে যোগীন্দ্র! কর্মযোগ কাকে বলে কৃপা করে বলুন—যার দ্বারা মানুষ এ জন্মে কর্ম ক্ষালন করতে পারে, অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্য লাভ করতে পারে। নিমিরাজ বলছেন—পূর্বে আমার পিতা ইক্ষ্বাকুর কাছে বসে ব্রহ্মাপুত্র সনকাদি মুনিকে এই প্রশ্ন করে-ছিলাম। তাঁরা আমার সে কথার কোন জবাব দেন নি। কেন যে তাঁরা উত্তর দেন নি, সেটিও কৃপা করে বলুন।

ষষ্ঠ যোগীন্দ্র শ্রীআবির্হোত্র এই ষষ্ঠ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন—শ্রীদীপিকাদীপনকার এর তাৎপর্য দেখিয়েছেন—'আবিঃ প্রকটং সুজ্ঞেয়ং হোত্রম্ অগ্নিহোত্রোপলক্ষিতং কর্মযস্যেতি নিরুক্ত্যা তদ্বর্ণনে তস্যৈব যোগ্যত্বাৎ স এবোবাচেতি জ্ঞেয়ম্।' অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি বেদবিহিত কর্মমার্গানুষ্ঠান যাঁর সম্যক্ রূপে জানা আছে, সেই আবির্হোত্রই তো কর্ম সম্বন্ধে পরিপাটি করে বর্ণনা করতে পারবেন। পিতার কাছে বসে যখন রাজা

প্রশ্ন করেছিলেন, তখন তিনি বালক, তাই বালকের শিশু-সুলভ চাপল্যে কর্মযোগ বুঝবেন না। ঋষিরা উত্তর দেন নি। আর সনকাদি ঋষির পক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও সহজ হয় নি কেন তার কারণটিও যোগীন্দ্র দেখাচ্ছেন।

কর্মাকর্মবিকর্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥ ভা. ১১।৩।৪৪

কর্ম অকর্ম বা বিকর্ম--এগুলি বেদের পরিভাষা, লৌকিক নয়। শাস্ত্র যা বিধান দিয়েছেন—সেটি আচরণ করার নাম কর্ম, এ কর্ম বিধান কিন্তু নিজের জন্য—নিজ নিজ বর্ণ এবং আশ্রম অনুযায়ী। আর শাস্ত্রবিহিত আচরণ না করার নাম অকর্ম এবং শাস্ত্র-নিষিদ্ধাচরণই বিকর্ম। বেদশাস্ত্রও ঈশ্বরের স্বরূপ—পুত্রের স্বরূপ যেমন পিতা ছাড়া কেউ নয় তেমনি বেদও ঈশ্বরের স্বরূপ। ঈশ্বর যেমন দুর্জ্ঞেয় বেদও তেমনি দুর্জ্ঞেয়। বেদের উৎপত্তি ঈশ্বর থেকে তাই বেদও দুরূহ। পুরুষবাক্যের অর্থ বক্তার অভিপ্রায় থেকে বুঝা যায়, কিন্তু বেদের বাক্য অপৌরুষেয়। বক্তাকে দেখে তার অভিপ্রায় বুঝতে পারা যায়, কিন্তু বেদের বাক্যের অর্থ বুঝতে পারা যায় না। বেদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বাক্য আছে—'অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি'। পুনরায় বললেন 'যদ্ যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে তথৈব পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে'। অপৌরুষেয় বাক্যের অভিপ্রায় জানা যায় না। ভগবৎতত্ত্বজ্ঞ ঋষি তাৎপর্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন। 'পূর্বাপরয়োঃ পরবিধি র্বলবান্।' বিধি তিন প্রকার—অপূর্ব, নিয়ম ও পরিসংখ্যা। তাঁর মধ্যে অপূর্ব বিধিই কর্তব্য নির্দেশ

করেছে। অন্য দুটি নিয়ম এবং পরিসংখ্যা প্রবৃত্তির অনুকূলে কথা বলেছেন—অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা অপেক্ষা বলবান। স্বরূপকে অবলম্বন করে অন্তরঙ্গ এবং বস্তুকে অবলম্বন করে বহিরঙ্গা তাই বেদের বাক্য বুঝা দুষ্কর। এই বেদতাৎপর্য বুঝতে গিয়ে অতিশয় বিদ্বান বক্তিও মুহ্যমান হন। এ বিদ্বান ত্রেতাযুগের, এখনকার কলিযুগের বিদ্বান নয়! এখন বিদ্যা নেই। বিদ্ ধাতু ক্যপ্ প্রত্যয় করে বিদ্যা শব্দ সম্পন্ন হয়। 'বিদ্যা' শব্দে সব লক্ষণ মিলিয়ে শ্রীশুকদেব বললেন—'সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া'। বস্তুগত জ্ঞান বিদ্ ধাতুর অর্থ নয়। কৃষ্ণপাদপদ্ম জ্ঞানই বিদ্ ধাতুর প্রকৃত অর্থ। মহাজন বলেছেন—'হরি না জানিয়ে লাখ জানে যদি সে জানা কেবল ছাই।' অন্য কোন জানাই খাতায় উঠবে না, বস্তুজ্ঞান খাতায় লেখা হয় না—হরি জানাই খাতায় ওঠে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিদ্বান্ বক্তি এতে মোহ প্রাপ্ত হয় কেন? উদ্ধবজীর কাছে ভগবান প্রশ্ন তুলছেন:

> কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
> ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্ বেদ কশ্চন
>
> —ভা. ১১।২১।৪২

এর উত্তর নিজেই দিয়েছেন:

> মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।
> এতাবান্ সর্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্॥
>
> —ভা. ১১।২১।৪৩

বেদের তাৎপর্য যে আর কেউ বুঝতে পারে—এ কথা ভগবান মানেন না, তিনিই একমাত্র বেদবিদ্। তাই বললেন:

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো

বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্। গীতা ১৫।১৫

ভগবান বললেন—বেদ আমাকেই প্রতিপাদন করে। বেদ যখন তত্ত্ব প্রতিপাদন করে, তখন আমাকেই প্রতিপাদন করে। আবার যখন বহিরঙ্গা মায়াকে খণ্ডন করে তখন আমাকেই খণ্ডন করে—'চিৎ-এর সঙ্গে মায়ার সম্পর্ক থাকায় মায়াকে খণ্ডন করা মানে অমাকেই খণ্ডন করা। বেদবিভাগ ব্যাসদেব করেছেন। তাহলে ব্যাস বেদ বুঝেন বলতে হয়—ব্যাস তো নারায়ণ সাক্ষাৎ। তাই ব্যাস যে বেদ বুঝেন সেটি কৃষ্ণকৃপাতেই বুঝেন। বেদের তাৎপর্য দুর্জ্ঞেয়—

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।

কর্মমোক্ষায় কর্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥ ভা. ১১।৩।৪৫

বেদ হল পরোক্ষবাদসম্পন্ন। পরোক্ষবাদ হল যথার্থ স্বরূপকে ঢেকে রেখে অন্য স্বরূপে বলার নাম। ঋষিরা এই বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য ঢেকে কথা বলেছেন। ভগবান বলেছেন—'পরোক্ষবাদা ঋষবঃ পরোক্ষবাদশ্চ মম প্রিয়ম্। মা যেমন ছেলেকে বলেন জলে নেম না, জুজু আছে, তার বয়সে তখন তাকে সত্য কথা বলে বুঝাবার সময় হয় নি। মা সন্তানকে বলেন নিমপাতার রস খাও, নাড়ু পাবে এবং সময়ে তার হাতে নাড়ু দেনও। কারণ তা না হলে পুনরায় ঔষধ পানে প্রবৃত্তি হবে না। বেদেও তেমনি কর্মের উপদেশ করেছেন কর্মমোক্ষ অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্যের জন্য। কর্মের ফলশ্রুতি কর্ম নয়—নৈষ্কর্ম্য। কর্মের দ্বারা কি করে নৈষ্কর্ম্য লাভ হবে, তার হিসাব

স্বামিপাদ বলেছেন। বেদ কর্মমুক্তির জন্য কর্ম করতে বলেছেন। নৈষ্কর্ম্য লাভের জন্যই প্রকৃতপক্ষে কর্মের বিধান। মাঝখানে যে স্বর্গাদি ফল বলা হয়েছে তা অবান্তর ফল। কারণ সকল ফলই ক্ষয়ী—নশ্বর। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি—এই চারটি যুগ একবার ফিরে এলে হয় এক দিব্যযুগ। এই রকম ৭১ দিব্যযুগে এক মন্বন্তর। এই একটি মন্বন্তর পার হলে লোমশমুনির গায়ের একটি করে লোম খসে পড়বে। এমনি করে সব লোম যখন পড়ে যাবে, তখন তাঁর পরমায়ু শেষ হবে। সেই লোমশ মুনির পরমায়ু শেষ হয়ে আসছে ভেবে তাঁর পুত্রেরা তাঁর পরমার্থ চিন্তার জন্য কুটীর তৈরী করেছেন। আর আমাদের পরমায়ু তো তার তুলনায় কত ক্ষীণ। যতক্ষণ আয়ু আছে ততক্ষণ হরি বলতে হবে—তাতে ক্ষতি তো কিছু নেই। মা যেমন মিথ্যা জুজু বলেন, তাতে মায়ের অপরাধ হয় না। কারণ মায়ের লক্ষ্য আছে পুত্রের আরোগ্যলাভ। তাঁর বাক্যে কিন্তু তা ফোটে নি। বাক্যে ফুটেছে নাড়ু দেব। তেমনি শ্রুতিমাতার মনে মনে আছে নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ কর্মক্ষালন, কিন্তু বাক্য দিয়ে বিধান করছেন কর্ম। আচ্ছা, নৈষ্কর্ম্যে যদি পুরুষার্থ হয় তাহলে প্রথমেই কর্মত্যাগ হবে না কেন? না, তা হবে না। যোগীন্দ্র বললেনঃ

নাচরেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ
বিকর্মণা হ্যধর্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ ॥

—ভা. ১১।৩।৪৬

শ্রীস্বামিপাদ বললেন—অজিতেন্দ্রিয়ঃ ব্যক্তি যদি অজ্ঞতাবশে বেদবিহিত কর্মাচরণ না করে, তা'হলে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান না

করায় অধর্মের দ্বারা তাকে পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যু-কবলিত হতে হয়। শ্রীজীবপাদ বলেছেন—ভগবান যে কর্মযোগের অধিকারীর লক্ষণ করেছেন :

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥
—ভা. ১১।২০।৯

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিষয়ে বিরক্ত অথবা যার আমার কথাতে রতি জন্মেছে—এই দুই ব্যক্তি কর্মে অধিকারী নয়—এরা দুজন বাদ দিয়ে আর সকলেই কর্মে অধিকারী। যোগীন্দ্র এখানে যে লক্ষণ করেছেন, তাতে ভগবানের লক্ষণটি বাঁচিয়ে লক্ষণ করেছেন। অজিতেন্দ্রিয় পদের দ্বারা ইহামুত্র ভোগবিরক্ত ব্যক্তিকে বুঝাল। নির্বিন্ন ব্যক্তি জ্ঞানযোগে অধিকারী, আর যে ব্যক্তি কর্মে রত সে ব্যক্তি অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বিষয়বিরক্ত, আর অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির জ্ঞানে অধিকার নেই। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি বেদবিহিত কর্ম না করে তাহলে দোষ হবে। ভগবান বললেন—মৎকথাশ্রবণাদৌ অর্থাৎ আমার কথা শ্রবণে যতদিন শ্রদ্ধা না হবে, ততদিন কর্ম করুক। এখানে শ্রবণের পরে 'আদি' পদের দ্বারা কীর্ত্তন এবং স্মরণকেও বুঝাচ্ছে। যতক্ষণ ভগবানের নাম শ্রবণে কীর্ত্তনে অথবা স্মরণে শ্রদ্ধা না জাগে ততক্ষণ বেদোক্ত কর্ম করতে হবে। শ্রীএকাদশে ভগবান উদ্ধবজীকে বলেছেন—যারা বেদোক্ত কর্মকে আমার আজ্ঞা বলে জানে এবং তার গুণ ও দোষের কথাও ভালভাবে জানে—জেনে তা ত্যাগ করে আমার পাদপদ্ম আরাধনা করে সে

বুদ্ধিসত্তম। এখানে ভগবান সন্ত্যজ্য বলেছেন, অর্থাৎ সম্যক্ ত্যাগ শুধু ফলত্যাগ নয়, কর্মত্যাগ পর্যন্ত। গীতায় ভগবান বলেছেন ঃ

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। গীতা ১৮।৬৬

বেদের আজ্ঞা যিনি পালন করেন তিনি সৎ আর যাঁরা বেদ আজ্ঞা পালন করেন এবং ভগবানকে ভজনা করেন তাঁরা সত্তর। আর যাঁরা কেবল আমার পাদপদ্ম ভজনা করেন তাঁরা বুদ্ধিসত্তম। এই বুদ্ধিসত্তম ব্যক্তি বেদ-আজ্ঞা ত্যাগ করে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অর্থাৎ যারা নির্বেদ প্রাপ্ত নয়, আর যাদের ভগবানের কথা শ্রবণে রুচি জন্মায় নি, তাদের বুঝাবার জন্য যোগীন্দ্র বললেন অজ্ঞ। মৎকথাশ্রবণরূপা ধী হল জ্ঞা। নাস্তি জ্ঞা যস্য স অজ্ঞ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেছেন ঃ

শ্রদ্ধা শব্দেতে কহে সুদৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রদ্ধা কাকে বলে? 'গুরুপদিষ্টবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা।' সুদৃঢ় বিশ্বাস কাকে বলে তার বাণী দিয়েছেন শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ ঃ

যার যা লেগেছে ভাল তারে ভজুক তারা গো
আমার চোখে লেগেছে ভাল শচীর নয়নতারা গো

বিশ্বাস হলে কেমন হয় ভিক্ষু বলেছেন ঃ

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥

—ভা. ১১।২৩।৫৮

একমাত্র গোবিন্দচরণ সেবা করেই আমি দুস্তর মায়ার সাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে যাব।

শ্রদ্ধা না হলে ভক্তির পরীক্ষা হয় না। এই শ্রদ্ধা যার নেই, তাকেই যোগীন্দ্র অজ্ঞ বললেন। এই অজ্ঞ এবং অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি বেদবিহিত কর্ম না করে তাহলে তারা বিকর্মরূপ অধম আচরণ করে, মৃত্যুর পর মৃত্যুকেই প্রাপ্ত হয়।

কর্মযোগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যোগীন্দ্র বলেছেন—কর্মের ফল যা হবার তাই হবে, বিশ্বাস তার উপকরণ। গীতায় ভগবান বলেছেনঃ

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্। গীতা ৩।২৬

যারা কর্ম করছে, অর্থাৎ যারা অজ্ঞ, যাদের আত্মজ্ঞান হয় নি তাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাবে না, অর্থাৎ জগতের বস্তু নশ্বর বলে তাদের ভক্তি বা জ্ঞান মার্গ উপদেশ কর না। শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা আছে নিজে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ পরমার্থ (ভক্তি বা জ্ঞান) জানলে তাকে কর্ম উপদেশ কর না, রোগী চাইলেও যেমন চিকিৎসক কুপথ্য দেয় না। শ্রেয়স্ শব্দে কল্যাণ অর্থাৎ জ্ঞান আর নিঃশ্রেয়স হল ভক্তি। আর প্রেয় বলতে জাগতিক বস্তুকে বুঝায় মাটির পুতুলের মত, বিজ্ঞজনের এতে প্রীতি হতে পারে না। কারণ এগুলি সব ক্ষণভঙ্গুর। এই চৌদ্দ ভুবনের যা কিছু সবই প্রেয়। কেবল শাশ্বত বস্তুই জীবের প্রয়োজন নয়, শাশ্বত আনন্দ জীবের প্রাপ্তব্য, দুঃখ জীবের প্রাপ্তব্য নয়। শ্রেয়ঃ উত্তম বটে কিন্তু সম্পূর্ণ উত্তম হল ভক্তি। এর নাম নিঃশ্রেয়স্। এই ভক্তি এবং ব্রহ্মজ্ঞান দুটির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ যদি বিচার কর।

যায়, তা'হলে দেখা যাবে একজনকে ব্রহ্মজ্ঞান অপরজনকে ভক্তি দেওয়া যাক, কে বদলাবদলি করতে চায়। যে তার নিজেরটির বদলে অপরটি পেতে চায়, তারটি অন্যের চেয়ে নিকৃষ্ট বুঝতে হবে। ব্রহ্মজ্ঞান যে পেয়েছে সে ভক্তি পেতে চায় এর বহু প্রমাণ আছে। আত্মারাম মুনি তাদের কোন প্রয়োজন নেই, তথাপি তারা ভগবানে ভক্তি করছে, কেন করছে এতে কোন হেতু নেই—কোন হেতু উল্লেখ করতে পারবে না—এরই নাম খাঁটি ভক্তি। কারণ শ্রীহরির এমনই মাধুর্য যে তাঁকে ভক্তিরসে লুব্ধ করে। ব্রহ্মজ্ঞানীও ভক্তি পাওয়ার জন্য এগোয়, কিন্তু ভক্ত কখনও ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। ভক্ত অপবর্গ চায় না। তারা ভগবানের লীলা সাগরে সন্তরণ করে সুখী হয়। ব্রহ্মজ্ঞান হল শ্রেয়স্ আর ভক্তি নিঃশ্রেয়স্। আদি ব্রহ্মজ্ঞানী সনকাদি মুনি যাঁদের ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভব নিঃশ্বাসের মতই স্বাভাবিক, ভগবানের চরণকমলের চন্দন মিশ্রিত তুলসীর গন্ধে তাঁদের ব্রহ্মজ্ঞান ছুটে গেল। ভক্তিতে চিত্ত লুব্ধ হল, দাস হবার বাসনা জাগল। ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত নিজ সাধনে পাওয়া যায়। শ্রবন কীর্তণ স্মরণ প্রভৃতি ভক্তিসুখ। যে ব্যক্তি কর্ম করছে তাকে ভক্তি বা জ্ঞানের উপদেশ করবে না, গীতাবাক্যে এইটি বলা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি কর্ম করে নি তাকে ভক্তিধর্মের উপদেশ করবে, এটি শ্রীমদ্ভাগবতবাক্যের তাৎপর্য। কল্যাণ যারা চায় তাদের সকলের পক্ষেই বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানের যোগ্য। সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখপরিহার—এই দুটি হল উপেয়। উপেয় পেতে হলে উপায় ছাড়া পথ নেই। যোগীন্দ্র এই উপায়ের পথ বললেন, বৈদিক কর্ম-অনুষ্ঠান। বেদমাতা কর্ম,

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, বিভিন্ন মার্গ উপদেশ করেছেন কিন্তু উদ্দেশ্য তাঁর একটাই—জীব সন্তানকে শাশ্বত সুখ দান। জীব তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তাই অধিকারভেদে বেদের ব্যবস্থাও তিন প্রকার। সাত্ত্বিক জীব সহজেই শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস করে, রাজসিক জীবও কিছুটা করে; কিন্তু তামসিক জীব একেবারেই করে না। হিন্দুধর্মে বহুবিধ ভেদ। জীবের রুচি ভিন্ন, তাই কার্য অনুরোধে বহু দেবতা। দেবতার কাছে নিবেদন জানানোর প্রকারও দ্বিবিধঃ (১) সাক্ষাৎ, (২) মারফৎ। গোবিন্দের কাছে সাক্ষাৎ দরখাস্ত দেওয়া যায়। আর তার সঙ্গে যদি চোখের জল থাকে তাহলে আর কেউ বাধা দেবে না। বেদোক্ত কর্ম করে যখন স্বর্গে গতি হবে, সেখানে দেবতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, ঘনিষ্ঠতা হলে জানা যাবে যে ইন্দ্রাদি দেবতাও শ্রীহরির কৃপায় ঐ পদ লাভ করেছেন। তাঁর মুখে শুনলে জীবের সুদৃঢ় বিশ্বাস হবে। তখন সে হরিভজন করবে। তীর্থভ্রমণের উপকারিতাও ঐ একই কারণে। তীর্থে মহতের সমাগম হয়। সাধুসঙ্গ হলে ক্ষণকালে জীবনের গতি ফিরে যায়। স্বর্গাদি কামনায় শ্রুতি যে যজ্ঞের বিধান দিলেন, তাতেও এ জগতের বিষয়সুখ ত্যাগ অভ্যাস করতে হয়। স্বর্গসুখকমনায় যদি হাতের কাছে পাওয়া সুখ ত্যাগ করা যায়, তাহলে গোবিন্দসেবাকামনায় স্বর্গসুখও ত্যাগ করা যাবে। কাজেই শ্রুতি-মা ঠিক পথই সন্তানকে প্রথম থেকে উপদেশ করেছেন। ত্যাগের পথ—এই ত্যাগই যখন সর্বত্যাগে (গোবিন্দসেবা ব্যতীত) পরিণত হবে তখনই তো প্রাপ্তি। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য 'বিনা সর্বত্যাগং ন ভবতি ভজনং

হ্যম্বুপতেঃ।' সর্বস্ব ত্যাগ না হলে প্রাণপতি শ্রীগোবিন্দের পূজা হয় না। আসল কথা হল 'কৃষ্ণকৃপা বিনা কোন সুখ নাহি হয়।' বাক্য আছেঃ

বৃন্দাবনেঽথবা নিজমন্দিরে বা শ্রীকৃষ্ণভজনং বিনা ন সুখং কদাপি। মায়ের কোলে যেমন দুষ্ট শিষ্ট উভয় সন্তানই স্থান পায়, তেমনি শ্রুতি-মাতার কোলে সকল জীবই স্থান পেয়েছে। শ্রুতি সকলের জন্য স্থান দিয়েছেন। মায়ের ইচ্ছা সকলে যেন গোবিন্দ পায়। তিনি ভাবলেন সকলকে আগে কোলে নিই; তারপর ধীরে ধীরে শুধরে নিলেই হবে। মায়ের কোলে বসে যেমন দুষ্ট ছেলে শিষ্ট হয়ে যায়, তেমনি শ্রুতি-মাতার কোলে বসে কর্ম করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হয়ে যাবে। চিত্ত শুদ্ধ হয়ে গেলে আর কর্ম করতে হবে না। এই দুটিই তো দরকার —অজ্ঞ এবং অজিতেন্দ্রিয় হলেই কর্ম করতে হবে। তা না হলে অর্থাৎ যার বিষয়াসক্তি নেই এবং যার ভগবৎকথাতে রুচি জেগেছে তার পক্ষে বেদোক্ত কর্মের অধিকার নেই। ভগবান বলেছেন :

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। গীতা ৩।৫

এক ক্ষণও জীব কর্ম না করে থাকতে পারে না। ব্যাকরণ-শাস্ত্রে নিদ্রাকেও ক্রিয়া বলা হয়েছে। কোনটিই নৈষ্কর্ম্য নয়। ভগবদুদ্দেশ্যে যে কাজ তারই নাম নৈষ্কর্ম্য। কর্মের দ্বারা অমৃত পাওয়া যাবে না, বিকর্ম হল বিষ। অমৃতের সন্ধান চাই, যাতে বিকর্ম অবসর না পায়। এইজন্য বিষয়বিরক্ত এবং ভগবৎকথায়

শ্রদ্ধাশীল—এই দুইজন ছাড়া সকলের প্রতি শ্রুতি-মাতা বেদোক্ত কর্মের উপদেশ করেছেন।

যোগীন্দ্র বললেন—অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি বেদোক্ত কর্ম না করে তাহলে বিকর্ম করবে। তার ফলে মৃত্যু হতে মৃত্যুকেই লাভ করবে। জীব সতত বিকর্ম করে; কিন্তু তার ফল যে দুঃখ তা জানে না। ভক্তিসাধনে পৌঁছুলে অন্য সাধন ত্যাগ হবে, কিন্তু এ ত্যাগজনিত প্রত্যবায় হবে না। যেমন ব্রহ্মচারীর ধর্মত্যাগে গৃহস্থের প্রত্যবায় হয় না, গৃহস্থের ধর্মত্যাগে বাণপ্রস্থীর এবং বাণপ্রস্থীর ধর্মত্যাগে সন্ন্যাসীর প্রত্যবায় হয় না, অথবা কর্মী, যোগী, জ্ঞানী যদি সব ছেড়ে ভক্তিপথে যায় তাতে প্রত্যবায় নেই। তাই ভগবান বললেন:

> সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
> অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
>
> —গীতা ১৮।৬৬

কৃষ্ণবিমুখ জীব দুই প্রকার: (১) কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু একথা জানে না। (২) অথবা কৃষ্ণ প্রভু একথা জানে, কিন্তু জেনেও ভজে না। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অতিশয়রূপে বিষয় গ্রহণ করে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করবে এবং তাতে অতিশয় দুঃখ পাবে। শ্রুতি-মাতা তা সহ্য করতে পারলেন না। তাই পরম কারুণিকা বেদ-মাতা তা বারণ করবার জন্য কর্ম বিধান করলেন। বেদ ফল-শ্রুতির দ্বারা জীবের বৈদিক কর্মে রুচি জন্মাচ্ছে। বেদের তাৎপর্য হল জীব যাতে বিকর্ম করতে অবসর না পায়—বিহিতকর্মে

জীবকে ব্যস্ত রাখতে চায়। শুধু মুখে ভয় নয়, বিকর্ম করলে তাকে দুরবস্থাও ভোগ করায়। অন্যথা তার আজ্ঞা কেউ পালন করবে না। বিবেকী ব্যক্তি এইভাবে বেদের তাৎপর্য বুঝবে। বুঝে নিজের অজিতেন্দ্রিয়তা দুর্বার এটি লক্ষ্য করে বিকর্ম যাতে না করে তাতে সাবধান হয়ে বিহিত কর্ম করবে। শ্রীস্বামিপাদ টীকায় বলেছেন, বিহিত হয়ে করবে, নিঃসঙ্গ অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হয়ে করবে। ঈশ্বরে কর্ম এবং তার ফল উভয়ই অর্পণ করবে, অর্থাৎ কর্ম এবং ফল উভয়েতেই অভিনিবেশহীন হবে। যেমন কোন মনিবের জমি চাষ করে চাষী—সে জানে জমি মনিবের। সে যা কাজ করছে তা মনিবের কাজ। তাই কাজে তার অভিনিবেশ নেই এবং ফলে তো সুতরাং নেই-ই। এর দ্বারাই নৈষ্কর্ম্য লাভ হবে। আচ্ছা, কর্ম করলে তো আসক্তি হবেই, সুতরাং ফলেও আসক্তি হবে। এর দ্বারা নৈষ্কর্ম্য লাভ হবে কেমন করে? ঈশ্বরে অর্পিত কর্ম করবে। কর্ম করে ঈশ্বরে অর্পণ করবে না। অর্পিত কর্ম কেমন? কাজ ঈশ্বরের, আমি তাঁর ভৃত্যমাত্র। প্রভুর জমি ভৃত্য চাষ করে—জানে মনিবের কাজ—এ বোধ আগেই হয়েছে। আমি ভৃত্যমাত্র—ফল মনিবের, আমার নয়। গীতাতেও ভগবান বললেন—কর্তা হয়ো না, কর্ম করে অর্পণ করলেও অর্পণকর্তা হতে হয়। মাঝখানে কর্তা হলে তাতেও দোষ—ভগবানই এক-মাত্র কর্তা। দরওয়ান যেমন ধনীর গৃহে পাহারা থাকে, কেউ যাতে কোন দ্রব্য অপহরণ করতে না পারে। অপহরণ করলেই ধরে, তেমনি ভগবান কর্তা, মায়া তাঁর দাসী দরওয়ান।

জীব কৃষ্ণের কর্তৃত্ব চুরি করছে কি না দেখে। 'অহং কর্তা' ভাবলেই মায়া তার হাতে হাতকড়া পরায়, তাকে সাজা দেয়।

তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতম্। ভা. ৩।২৬।৭

জীবের কর্মে রুচি উৎপাদনের জন্যই শ্রুতি ফলশ্রুতি দিয়েছেন। অগদপানে লড্ডুকদানের মত। যেমন যে রোগী তার রোগ ভাল করতে চায়, সে নাড়ুর লোভে ওষুধ খায় না —এমনিই খায়, তেমনি যে ব্যক্তি বৈদিক কর্মের তাৎপর্য বুঝতে পারে তার পক্ষে আর ফলশ্রুতির দরকার নেই। আয়ু, যশ, আরোগ্য, পুত্র, সম্পদ, মান, মর্যাদারূপ ফল সে চায় না। কিন্তু এর দ্বারা তার নৈষ্কর্ম্য লাভ হচ্ছে কেমন করে? কর্মী জীবের ফলশ্রুতি দেখে বেদের কর্মে রুচি হল, নাড়ুরূপ ফলশ্রুতি দেখে কর্মে প্রবৃত্তি হল, মা যেমন শিশুকে ভুলিয়ে নাড়ুর লোভ দেখিয়ে ওষুধ খাওয়ান এবং পরে নাড়ু দেনও। শ্রুতি-মাও তেমনি নানাবিধ ফল জীবকে দেন— জীব পরে বুঝতে পারে বেদের মর্মকথা এ সকল ফললাভে নয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের বাণী অনুশীলন করে জীব বুঝল :

যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।

যে ব্যক্তি পরমপুরুষকে না জেনে এই দেহ ত্যাগ করে সে কৃপণ, অর্থাৎ তুচ্ছ দেহত্যাগের আগে অন্ততঃ অক্ষর—সেই পরমপুরুষকে জানতে হবে, তখন জীব ভাবতে লাগল—তাহলে পরমপুরুষকে জানাতেই কি সমগ্র বেদবাক্যের তাৎপর্য? যারা আত্মাকে জানে না, তাদের জীবন তুচ্ছ। যজ্ঞের দ্বারা,

বেদানুবচনের দ্বারা, পরমপুরুষকেই জানতে হবে, তখন সে বুঝল—বৈদিক কর্মের ফল তাহলে নশ্বর স্বর্গাদি সুখভোগ নয়। যে কোন অনুষ্ঠানের তাৎপর্য হল ভগবানকে জানা —যাগযজ্ঞ যা কিছু সকলের পর্যবসান হল পরমপুরুষের জ্ঞানে। যেমন সকল নদীর গতির পর্যবসান হল সাগরে। তখন আর তাকে নানাবিধ ফলশ্রুতি-রূপ নাড়ু দিতে হয় না—নাড়ু ছাড়াই ওষুধ খায়। তাই বিচারে দেখা গেল কর্মই নৈষ্কর্ম্য দান করে। শ্রুতিতে বলা আছে—'স্বর্গকামো যজেত', অর্থাৎ যে যজ্ঞ করবে তার স্বর্গ কামনা থাকলে অর্থাৎ স্বর্গ আকাঙ্ক্ষিত হলে স্বর্গ ফল হবে। আর কামনা না থাকলে স্বর্গ ফলরূপে আসবে না। অতএব ফলই যদি না এল, তাহলেই নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি। বেদ যা ফলশ্রুতি দেখালেন তা বালকের প্রতি বিধান। শ্রীজীবপাদ বললেন—বিজ্ঞজনের প্রতি কি ব্যবস্থা বলছি, শোন। কর্ম গ্রহণ করানোর অর্থ হল ভগবদর্চনা কর্ম গ্রহণ করান। ঘি খেয়ে যদি উদরাময় হয়, তাহলে ঘি খেয়েই তা ভাল হবে; কিন্তু এই দুটি ঘি এক নয়। যা খেয়ে রোগ ভাল হবে, তা হল অন্য দ্রব্য মেশান ঘি। কর্মই বন্ধন ঘটায় তা ঠিক, কিন্তু এই কর্মই আবার অন্যের সঙ্গে মিশিয়ে করলে অর্থাৎ ভগবদারাধনার সঙ্গে মিশিয়ে করলে তাতে কর্মবন্ধন টুটে যায়। যেমন একজন লোক আর একজনকে গাছের সঙ্গে বেঁধেছে, আবার আর একজন লোক এসে তা খুলে দিতে পারে। কর্ম আটকাবার পন্থা, গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে দেয় না। বেদশাস্ত্র

নানাবিধ ফলশ্রুতির ছায়া দিয়ে পথিককে, সাধককে আহ্বান করে। সাধক তাতে লুব্ধ হয়। পথে বৃক্ষের ছায়ায় লুব্ধ পথিক যদি বিশ্রাম নেয়, তাহলে তার যেমন গন্তব্যস্থানে আর তাড়াতাড়ি যাওয়া হয়ে ওঠে না—দেরী হয়ে যায়, তেমনি কর্মমার্গের বেদ ফলশ্রুতি ছায়া তৈরী করে। তাতে যদি সাধক আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তাহলে আর তার গন্তব্যস্থল গৌর-গোবিন্দপাদপদ্মে পৌঁছান হয়ে উঠবে না। সূর্যাস্ত-নিলাম মনে রাখতে হবে—আয়ুসূর্য অস্ত যাবার আগে গৌরগোবিন্দ বলে যেতে হবে। বেদের কর্মমার্গের ছায়া এই যে বুঝতে পারে তাকেই ভগবান বেদবিদ্ বলেছেন। যোগীন্দ্র বলছেন— এমন কর্ম কর, যার দ্বারা কর্ম ছিন্ন হয়—সেই কর্মই যোগীন্দ্র বিজ্ঞের প্রতি উপদেশ করেছেন।

ঈশ্বরে অর্পিত কর্ম করলে সেই মহিমায় নৈষ্কর্ম্য লাভ হবে শিশুমতির জন্য বেদের কর্মযোগ বলা হয়েছে। এখন বিজ্ঞজনের প্রতি কর্ম উপদেশ করছেন। যে ব্যক্তি আশু অর্থাৎ অতি শীঘ্র অনাদি অবিদ্যা হৃদয়গ্রন্থি বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে চায় (গ্রন্থি বলা হয়, কারণ বিষয়বাসনাতে হৃদয়ে গেরো পড়ে গেছে)। এই বিষয়বাসনার মাত্রা যে কতদূর পর্যন্ত তা আমরা বুঝি না, কারণ আমরা ছোটখাট নিয়েই ব্যস্ত। এ হৃদ্গ্রন্থি কার? এ গ্রন্থি পরমাত্মার নয়, কারণ তাঁর কোন গ্রন্থি হয় না, কারণ পরমাত্মার কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা নেই। জীবাত্মাই ভাবনাতে ফলের ভোক্তা, আসলে ফল যে সুখ ও দুঃখ, এটি ভোগ করে মন। প্রকৃতির মায়াসৃষ্ট খাদ্য

পরমাত্মার হতে পারে না। কোন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ছেলে যেমন বন্ধুত্বের খাতিরে বন্ধুর সঙ্গে যাবনিক খাদ্যের সামনে বসে মাত্র কিন্তু খায় না, তেমনি জীবাত্মার প্রতি স্নেহে পরমাত্মাকে প্রকৃতির খাদ্যের কাছে বসতে হয় বটে, কিন্তু সে প্রকৃতির খাদ্য খায় না। যে ব্যক্তি সেই হৃদ্‌গ্রন্থি ছেদন করতে তাড়াতাড়ি চায়, সে ভগবান্‌ কেশবের উপাসনা করবে—এটি তন্ত্রোক্ত উপাসনা, অর্থাৎ শাণ্ডিল্য সূত্র এবং বৃহন্নারদীয় সূত্রে যে উপাসনার কথা বলা আছে। বেদোক্ত বিধির দ্বারা ভগবদারাধনা করবে। বৈদিক কর্ম করে যে নৈষ্কর্ম্য লাভ তা বহুকালসাপেক্ষ আর দেবার্চনার ফলে যে নৈষ্কর্ম্য লাভ তাতে তাড়াতাড়ি কাজ হয়। অক্ষর পরিচয় করাতে শিশুর যেমন গুরুমশাই-এর দরকার হয়, তেমনি সাধন-জগতেও গুরুকরণের প্রয়োজন। শাস্ত্রে মন্ত্র দেওয়া আছে, জপে নেব—এ কথা বললে হবে না। সর্বভূতে তো ভগবান আছেন তবে ছুঁলে পাওয়া যায় না কেন? কিন্তু আমরা গ্রহণ করতে পারি না বলে ভগবান নেই—একথা বলা যায় না। ইন্দ্রিয়ের শক্তি দরকার, তা না হলে শুধু বস্তু থাকলেও পাওয়া যায় না। ভগবান চিদ্বস্তু আর আমাদের ইন্দ্রিয় প্রাকৃত, জড়; তাই ইন্দ্রিয় তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না। প্রাকৃত জগতেও দেখা যায় সজাতীয় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এক ইন্দ্রিয় অপরের কাজ করতে পারে না। কান চোখের কাজ করতে পারে না—ইন্দ্রিয় যথা অধিকারে কাজ করে। অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়ের যে বিষয় গ্রহণে অধিকার, সে ইন্দ্রিয় সেই বিষয় গ্রহণ করে। এখন প্রয়োজন হচ্ছে,

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়কে যদি চিৎ করতে পারা যায়, তাহলে সেই চিৎ ইন্দ্রিয় দিয়ে চিৎ ভগবানকে পাওয়া সম্ভব হবে। এখন এই ইন্দ্রিয়কে আমাদের নিজেদের চেষ্টায় চিৎ করতে পারব না। যাঁরা ইন্দ্রিয়কে চিৎ করেছেন, তাঁদের কৃপায় আমাদের ইন্দ্রিয় চিৎ হবে। কয়লার ময়লা কিছুতে যায় না, কোটি কোটি বছর পড়ে থাকলেও নয়; কিন্তু যে মুহূর্তে অগ্নি তাকে স্পর্শ করে সেই মুহূর্তে তার ময়লা দূর হয়, তেমনি কয়লার মত মালিন্যপূর্ণ ইন্দ্রিকে যখন কৃপা-অগ্নি স্পর্শ করে সেই মুহূর্তে তার মালিন্য চলে যায়। শ্রীগুরুদেবের সন্দর্শিত পথে অর্চনা করতে হবে, অভিমত শ্রীমূর্তি স্থাপনা করে অর্চনা করতে হবে। বাহ্য এবং আন্তর শুচি হয়ে উপাসনা করতে হবে। বাহ্যশুচিতা দেহ, জল এবং মৃত্তিকা দ্বারা মার্জন করে এবং আন্তরশুচিতা, দম্ভ, অহঙ্কার, অভিমান, দ্বেষ, হিংসা ত্যাগ করে। অঙ্গন্যাস করন্যাস করে দেহ শুদ্ধ করতে হবে। পুষ্পমাল্য প্রভৃতি অর্চনাব উপকরণকে কীটাদি থেকে শুদ্ধ করতে হবে। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ অর্চনামার্গ বিচার করেছেন, বিত্তবান গৃহীর পক্ষে অর্চনা একান্ত প্রয়োজন। অর্চনাতে খরচ বাঁচাবার জন্য যদি সেই ব্যক্তি কেবল হরিনাম করে, তাহলে তার পক্ষে হরিনাম ফল দেবেন না। তাতে বরং বিত্তবান ব্যক্তির বিত্তশাঠ্য দোষ হবে। আত্মদুর্লভ বস্তু দিয়ে ভগবানের সেবাকাজ করতে হবে। অর্থাৎ নিজের জিনিষের প্রয়োজনে যে মূল্য দিয়ে কেনা হয়, ভগবানের সেবার দ্রব্য তার চেয়ে অন্ততঃ কিছু বেশী মূল্য দিয়ে কিনতে

হবে, যাতে নিজের ভোগের বস্তু অপেক্ষা ভগবানের ভোগের সামগ্রীর উৎকর্ষ হয়। ভগবানের তো কোন কিছু গ্রহণের প্রয়োজন নেই, কিন্তু তাঁকে খেতে দিতে জানতে হবে। ভগবান ভক্তের অণু উপহারও পরম আদরে গ্রহণ করেন কিন্তু অবিদ্বানের পূজা গ্রহণ করেন না। আপন সুখের জন্য যারা আরাধনা করে তারা অবিদ্বান, আর ভগবানের সুখের জন্য যারা পূজা করে তারা বিদ্বান। ভগবানের কাছে আমরা কামনার পূতিগন্ধ মাখিয়ে পূজা দিই। কাজেই তিনি তা গ্রহণ করতে পারেন না। তবে যে গ্রহণ করেন সে করুণ হয়ে দয়া করে গ্রহণ করেন। আমরা প্রাণ খুলে বলতে পারি না—প্রভু, তোমার বিচারে যা ভাল হয়, তাই দাও। বিচারে কৃষ্ণভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু। ভগবানের শ্রীচরণে সেইটিই প্রার্থনীয় বস্তু হবে। পূজার সময় নিজেকে অব্যগ্রতা দ্বারা শুদ্ধ করতে হবে। মূর্তিকে অনুলেপন দ্বারা শুদ্ধ করতে হবে। পাদ্যাদি সম্মুখে স্থাপন করে সমাহিতচিত্তে অঙ্গন্যাস, করন্যাস করে মূলমন্ত্রের দ্বারা অর্চনা করতে হবে। অঙ্গ হৃদয়াদি, উপাঙ্গ সুদর্শনাদি, এবং পার্ষদের সঙ্গে অভিমত সেই সেই মূর্তিকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, মাল্য, দূর্বা, পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং নানা উপহারের দ্বারা পূজা করে বিধি-অনুযায়ী স্তব করে হরিপাদপদ্মে নমস্কার করবে। স্বামিপাদ বলেছেন—আতপচালের দ্বারা বিষ্ণু ভগবানের এবং কেতকীকুসুমের দ্বারা মহেশ্বরের পূজা করবে না। শ্রীচক্রবর্তিপাদ অর্থ করেছেন—অক্ষত অনুপহত অর্থাৎ, যা ভোগ করা হয় নি, এমন পুষ্পমাল্য প্রভৃতি দ্বারা

কেশবের অর্চনা করবে। কেশবই একমাত্র হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করতে পারেন। নিজেকে ধ্যানের দ্বারা তন্ময় রাখতে হবে। অর্থাৎ অনুগত হয়ে আবিষ্ট থাকতে হবে। ধ্রুব 'অহংগ্রহ' উপাসনা করেছিলেন, কিন্তু তার চেয়ে অনুগত হয়ে উপাসনাতে কাজ হয় বেশী। শ্রীজীবপাদ বলেছেন—ধনকামী ব্যক্তি যেমন জগৎকে ধনময় দেখে, কামুক ব্যক্তি যেমন কামিনীময় দেখে, ধীর ব্যক্তি তেমনি জগৎকে নারায়ণময় দেখে। কারণ নিজে যদি হরি হয়ে যায় তাহলে আর উপাসনা হয় না। উপাসনার শেষে নির্মাল্য মস্তকে ধারণ করবে। পরে বিগ্রহকে স্বধামে প্রেরণ করাবে, অর্থাৎ শয়নাদি করাবে। হরিবিগ্রহের বিসর্জন নেই, কারণ জীব নিত্যকৃষ্ণদাস। তাই বিসর্জন দেবে কখন?

এইভাবে যে ব্যক্তি তান্ত্রিক কর্মযোগ অনুসারে অগ্নি বা সূর্য বা জল বা অতিথি অথবা নিজ হৃদয়ে হরিবুদ্ধি করে অর্চনা করে সে ব্যক্তি অনায়াসে হৃদ্‌গ্রন্থি ছেদন করে মুক্তিলাভ করে। তাই যোগীন্দ্র পাঞ্চরাত্র মন্ত্রোক্ত এবং বেদোক্ত কর্মের বিধান দিলেন। মহারাজ নিমি যে প্রশ্ন করেছিলেন 'কর্ম কাকে বলে'—যোগীন্দ্র এইভাবে তার উত্তর দিলেন।

সপ্তম প্রশ্ন

শ্রীনিমিরাজ বললেন—পূর্বেই বলা হয়েছে অর্চনামর্গে নিজ নিজ অভিমত মূর্তি .প্রতিষ্ঠা করে বন্দনা করবে। তাহলে কি কি মূর্তি আছে তা জানতে হবে। তবে তো স্তুতি করা যাবে। তাহলে যত প্রকার অবতার আছেন সব জানতে হবে। এই সকল অবতারের গুণ, চরিত্র এবং তত্ত্ব জানা চাই। মহারাজ নিমি প্রশ্ন করলেন :

যানি যানীহ কর্মাণি যৈর্যৈঃ স্বচ্ছন্দজন্মভিঃ।
চক্রে করোতি কর্তা বা হরিস্তানি ব্রুবন্তু নঃ॥

—ভা. ১১।৪।১

ভগবানের জন্ম স্বচ্ছন্দ, জীব কিন্তু কর্মবশানুগ, জীবের জন্ম কর্মজনিত। তাই ভগবানের জন্মের সঙ্গে জীবের জন্মের এত পার্থক্য। ভগবানের জন্ম এবং কর্ম চিৎ জাতি, নিজের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু বুঝা তো যায় না, বুঝতে পারলে তো আর কোন গোলমাল নেই। জীবের জন্ম ও কর্মের উপাদান আর ভগবানের জন্ম ও কর্মের উপাদানের মধ্যে পার্থক্য কয়লা ও অগ্নির মত। প্রাকৃত নিয়ে ঘর করি আমরা। তাই অপ্রাকৃতের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। জলচর প্রাণী যেমন স্থলচর প্রাণীর খবর রাখতে পারে না। তাই ভগবানকে যে জীব জানতে পারে না—এ জীবের দোষ নয়,

কিন্তু যোগ্যতা রোজগার করতে হবে। এই অধিক অধিকার একমাত্র মানুষেরই আছে। অনুশীলন করতে করতে ক্ষণিকের মধ্যে জানা হয়ে যাবে। মার খেয়ে কেউ বিদ্যা মুখস্থ করতে পারে না, কিন্তু বিদ্যাতে যদি রস লেগে যায় তাহলে আপনিই মুখস্থ হয়ে যাবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আদেশে নাম করতে হবে। একদিন যখন নাম করতে করতে রস লেগে যাবে, তখন হরিনামই নাম করিয়ে নেবে। আমাকে করতে হবে না। ভগবানের শ্রীমূর্তি চিদ্‌ঘনবস্তু. ভগবানের জন্ম কর্ম ঠিক ঠিক জানতে পারলে জীবের অনাদি অবিদ্যাব ফলে যে জন্ম, তার নাশ হবে। ভগবানের জন্ম আবির্ভাব মাত্র। নিমিরাজ প্রশ্ন করলেন—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান তিন কালের অবতার এবং তাদের কর্মের কথা বলুন। সপ্তম যোগীন্দ্র দ্রুমিল এ প্রশ্নের জবার দিচ্ছেন। শ্রীদীপিকাদীপনকার দ্রুমিল শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন – ধ্যানে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত অবতারগণের সঙ্গে দ্রুত মিলিত হন, তাই তাঁব নাম দ্রুমিল। এখন কথা হচ্ছে ধ্যানপ্রাপ্ত রূপ তো সাক্ষাৎ নয়। যেমন কাগজ ও কালির ছবিতে রূপ গুণ দেখা যায় না, কিন্তু অঘাসুরবধ প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব এর জবাব দিয়েছেন। ভগবানেব প্রতিমাকে মনে মনে ভাবলেও তাতেই ভাগবতী গতি লাভ হবে। এর থেকে সিদ্ধান্ত হল প্রতিমা ও স্বরূপ ভিন্ন নয়। চিত্রপটে গোবিন্দ-ইচ্ছাতেই গোবিন্দ প্রকাশ পান, মানুষ তাকে প্রকাশ করতে পারে না। চিত্রপটকে ভজন দিয়ে যেচে যেচে কথা বলাতে হবে। চিত্রপটও কথা বলে। জড় দেহে অণু-চৈতন্য প্রবেশ করে দেহ যদি চলে

বলে, তাহলে কাগজে বিভুচৈতন্য প্রবেশ করলে সে কেন কথা বলবে না? আর বিভুচৈতন্যের তো প্রবেশ নেই, তিনি আছেনই—অগ্নি, জল, সূর্য, অতিথি এরা তো ভগবানের অধিষ্ঠান। এদের পূজা করলে ভগবানের পূজা করা হয়।

দ্রুমিল যোগীন্দ্র বললেন—ভগবানের গুণ অনন্ত, যখন তখন তা কি বলা সম্ভব? অনন্ত ভগবানের অনন্ত গুণ যিনি বলতে চান তাঁর বুদ্ধি শিশুর মত। পৃথিবীর ধূলিকণা যদি বা গণনা করা সম্ভব হয়, তবু ভগবানের গুণ বলে শেষ করা যায় না। একই ভগবানের অনন্ত গুণ কেমন করে সম্ভব? অনন্ত রুচির অনন্ত জীবকে আয়ত্ত করতে ভগবানও নিজে অনন্ত গুণ প্রকাশ করেছেন, কেহ যেন বঞ্চিত না হয়। অনন্তই যদি হয় তাহলে কেমন করে বলা যাবে?

“পক্ষী যেমন আকাশের কিছুই না পায় টের
যতদূর শক্তি উড়ি যায়।”

এটি যোগীন্দ্রের দৈন্য প্রকাশ—যথামতি যথাকৃপা বুদ্ধিরূপ পাখা দিয়ে যতটা উড়তে পারি ততটা বলব।

আদিদেব নারায়ণ পুরুষাবতার হলেন—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষাবতার সত্ত্ব, রজ, তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। কালপ্রভাবে রজোগুণ অধিক হলে সৃষ্টি হয়। প্রকৃতিগর্ভ থেকে মহত্তত্ত্ব পুত্র জাত হয়। মহৎ স্রষ্টা হলে তাঁর পুরুষ নাম। ব্রহ্মাণ্ডের বীজ হল মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব থেকে অহংকারতত্ত্ব। তমোগুণ থেকে পঞ্চমহাভূত। এই

পঞ্চভূতে বিরচিত ব্রহ্মাণ্ড। পরমপুরুষ অংশে এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হন—'তৎ সৃষ্ট্বা তদনুপ্রাবিশৎ'। এঁর নাম গর্ভোদশায়ী, প্রতি বস্তুকে বাঁচাবার জন্য ইনি প্রবেশ করেন। সৎ-ই তো সত্তা। বস্তু তো মায়িক। মায়িক বস্তু অসৎ—তার ভেতরে সৎ না থাকলে সে সৎ হতে পারে না। সৎ এবং অসৎ এই দুই-এর অতীত যা তার নাম অনির্বচনীয় মিথ্যা। মায়িক বস্তুর না বাঁচাই স্বভাব। তাঁকে বাঁচাবার জন্যই ভগবান প্রবেশ করলেন। অসৎ যখন সত্তা লাভ করেছে তখন ঈশ্বর যে তাতে প্রবিষ্ট এটি অনুমান করা যায়, অবশ্য ভগবান এখানে মুরলীধর হয়ে প্রবেশ করেন নি। সচ্চিদানন্দ ভগবানের সন্ধিনীর কণা ব্রহ্মাণ্ডকে ধরে রেখেছে। সন্ধিনীর কণা শক্তি, ভগবান শক্তিমান। শক্তি ও শক্তিমান তো অভিন্ন। তাই বলা হয়ভগবানই প্রবেশ করলেন। মহাবিষ্ণুর শরীরে ত্রিভুবন, অর্থাৎ ঊর্ধ্ব, মধ্য এবং অধোলোক। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁর প্রতি রোমকূপে যাওয়া আসা করে। আমরা সকলে ব্যষ্টি জীব, সমষ্টি হলেন হিরণ্যগর্ভ। অন্তর্যামীর কাছ থেকে জীব জ্ঞান লাভ করে। আমরা যখন মানুষ, তখন ভগবানকে জানতে হবে। ভগবান ছাড়া আর কিছু জ্ঞাতব্য নেই। ঘটে পটে ভগবানের সত্তা আছে, কিন্তু তিনি তো শুদ্ধ ভগবান নন। সে সব বস্তুতে যে ভগবানের অবস্থান তাতে মায়াগুণের মিশ্রণ আছে। তাই তা জানলে হবে না, তত্ত্ব জানতে হবে, অর্থাৎ কৃষ্ণ-পাদপদ্ম জানতে হবে। এটি জানলে জীবের প্রশংসা, আর না জানলেই নিন্দা।

আদিদেব পুরুষাবতার এবং গুণাবতার গ্রহণ করেন। মায়ার গুণের মারফতে ভগবানকে দেখা যাচ্ছে বলে তাঁকে গুণাবতার বলা হয়। রজোগুণের দ্বারা ব্রহ্মা, তমোগুণের দ্বারা রুদ্র বলা হল, কিন্তু সত্ত্বগুণের দ্বারা বিষ্ণু এ-রকম বলা হয় নি। বিষ্ণু ধর্মসেতু। শ্রীজীবপাদ সিদ্ধান্ত করলেন—'সত্ত্বেন' বলা হয় নি, কারণ বিষ্ণু হলেন শুদ্ধস্বরূপ। সত্ত্বগুণের দ্বারা পালন কাজ হয়, সত্ত্বগুণ ভগবানের গ্রহণের দরকার হয় না, সান্নিধ্যমাত্রে উপকারক। 'সর্গায় রক্তম্'—এখানে রক্ত পদে লাল রংকে বুঝাচ্ছে না, সক্ত বলতে আসক্ত, তা না হলে তামসিক যোনি বক সাদা হয় কি করে? তমোগুণের দেবতা শিব শুভ্রকান্তি হন কেমন করে? বরং সত্ত্বগুণাধিপতি বিষ্ণুই কাল। ব্রহ্মা সৃষ্টিতে আসক্ত। ব্রহ্মার এক নাম শতধৃতি—কারণ তাঁর ধৈর্য অসীম, ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীব তাঁর পুত্র। কেউ তাঁর আদেশ পালন না করলেও তিনি ধৈর্য ধারণ করে থাকেন। ব্রহ্মা হলেন বিশ্বসৃষ্টিকর্তা—মূল উপাদানকে নিয়ে ব্রহ্মা স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই বিশ্ব চরাচর সৃষ্টি করেন।

এর পরে ভগবানের নর-নারায়ণ অবতার। দক্ষ প্রজাপতির কন্যা মূর্তি হলেন ধর্মের স্ত্রী। এঁদের পুত্র হলেন নরনারায়ণ ঋষি। ইনি নৈষ্কর্ম্য লক্ষণ কর্ম নিজে আচরণ করে উপদেশ করেছিলেন। কর্মের ফল বন্ধন—এই বন্ধন যদি না ঘটে তার নাম নৈষ্কর্ম্য, যেমন জগতে সৎপাত্রে দান করলে বলা হয় এ খরচ হচ্ছে না—তোলা থাকছে। তেমনি নৈষ্কর্ম্য লক্ষণ কর্ম জমার খাতাতেই ওঠে, খরচের খাতায় ওঠে না। কর্মের ফল

বন্ধন—পিপাসায় জলপান করলে তৃপ্তি—এই তৃপ্তিই আবার পিপাসার সৃষ্টি করে—কর্মই আমাদের বেঁধে রেখেছে। এমন কর্ম করতে হয়, যা কর্মের এই বন্ধনদোষ ক্ষালন করে। এই কর্মের নামই নৈষ্কর্ম্য-লক্ষণ কর্ম। ঘি খেয়ে যদি উদরাময় হয়, ঘিই তার ওষুধ। কিন্তু ওষুধ-ঘি শুধু ঘি নয়—দ্রব্য মেশান ঘি। শ্রীমদ্ভাগবত বললেন—কর্ম তোমার বন্ধন ঘটিয়েছে, কর্মই কর। তবে দ্রব্য মিশিয়ে কর্ম কর। ভগবানের কর্ম কর—এই কর্ম তোমার বন্ধন মুক্ত করবে। ভক্তি কর্মের দ্বারা বন্ধন নাশ হবে। শ্রবণ কীর্তন, স্মরণ, বন্দন কর্ম হলেও এগুলি ভগবৎসম্পর্কিত বলে এর দ্বারা বন্ধন হবে না, মুক্তিই হবে। যেমন আকৃতিতে মানুষ—একজন মানুষের দ্বারা বন্ধন আবার অপর মানুষের দ্বারা মুক্তি—আকৃতিতে সাম্য কিন্তু প্রকৃতিতে ভেদ—তেমনি বন্ধনের কর্ম এবং ভগবৎ কর্ম দেখতে একরকম হলেও প্রকৃতিতে ভেদ আছে। একজন বন্ধন ঘটায় অপরটি বন্ধন মুক্ত করে। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি বলেছেন—'ভক্তিরেবাস্য ভজনম্। ইহামুত্রফলভোগ-বিরাগেন অমুস্মিন্নেব মনঃ কল্পনম্—এতদেব নৈষ্কর্ম্যম্।' নরনারায়ণ ঋষি নারদাদি মুনিকে উপদেশ দিয়েছেন—নারদের বৈষ্ণবধর্মের গুরু হলেন নর-নারায়ণ ঋষি। এই ঋষি বদরিকা-শ্রমে শ্রীমূর্তি রূপে আজও আছেন।

নরনারায়ণ ঋষি গভীর ধ্যানে তন্ময়, তাঁর ঘন ধ্যানে ইন্দ্র কুপিত হয়েছেন। ইন্দ্র আশঙ্কা করলেন—ঋষি ধ্যানের দ্বারা পুণ্য অর্জন করে আমার ধাম স্বর্গলোক জয় করবেন। এই

আশঙ্কায় ঋষির মহিমা না জেনে তাঁর তপোভঙ্গের জন্তে ইন্দ্র মদনকে পাঠালেন, সঙ্গে দিলেন অপ্সরা, বসন্ত এবং দক্ষিণপবন। ঋষি মনে মনে বিষয়টি বুঝে নিলেন—এ হল ইন্দ্রকৃত অপরাধ। তাই গর্বলেশশূন্য হয়ে মদনকে বললেন—'হে মদন, মলয়মারুত ও দেববধূগণ, তোমরা ভয় পেও না—জগতের সকল জায়গাই ভয়ের—আমার কাছে আবার ভয় কেন? আমার দেওয়া আতিথ্য গ্রহণ করে আশ্রমকে অশূন্য কর। ঋষির এই কৃপা-বাক্য শুনে সগণে মদন লজ্জিত হয়ে ঋষিচরণে প্রণত হল। ঋষি মদনকে বিভু বলে সম্বোধন করেছেন —তুমি বিভু, তুমি পার—জগৎ মুগ্ধ করবার তোমার সামর্থ্য আছে। এখানে বিচারের বিষয় আছে। শিবের তপোভঙ্গে দেখা যায় শিব ক্রুদ্ধ হয়ে মদনকে ভস্মীভূত করেন। ক্রোধ প্রশমিত করবার জন্য দেবতারা অনুরোধ করেছেন, কিন্তু ঋষি নরনারায়ণ ক্রুদ্ধ হন নি —হেসে মদনের সঙ্গে কথা বলেছেন। পরাজিতকে সম্পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে পরাজিত করেছেন, আতিথ্য গ্রহণ করিয়েছেন। শিব পরাজিত মদনকে মর্যাদা দান করেন নি—ঋষি মনে মনে বুঝেছেন ইন্দ্রপ্ররোচনায় মদন এসেছে। তাকে প্রচুর সমাদর দেখিয়েছেন—ঋষিকে ক্রোধ স্পর্শও করে নি। এইটিই নরনারায়ণ ঋষি ও শিবের তপোভঙ্গের পার্থক্য।

নরনারায়ণ ঋষি মদনকে প্রশ্ন করেছেন—তুমি আমার তপস্যার বিঘ্ন করতে এসেছ কেন? মদন বলছেন—তোমাকে ভগবান বলে বুঝি নি। ঋষি বললেন ভগবান বলে বুঝে না থাক, ভগবদ্দাস বলে বুঝেছ। ভগবদ্দাস না হলে তো কেউ

তপস্যা করে না, দাসের ওপরেই বা বিঘ্ন করতে এসেছ কেন ? মদন বললেন—অপরাধ করা আমার স্বভাব, অপরাধ ক্ষমা করা তোমার স্বভাব। তুমি যে আমাদের শক্তির গণনা করবে না—এতো জানা কথাই। তোমার দাসেরাই আমাকে গণনা করে না—তোমার অনুগ্রহে তারা আমাদের গণনা করে না। যারা ভগবানের পাদপদ্ম ভজে—দেবতারা তাদের বহু বিঘ্ন ঘটায়। ঋষি প্রশ্ন করলেন—কেন বিঘ্ন ঘটায়, ভক্তের কি অপরাধ ? ভক্তের কোন অপরাধ নয়—মাৎসর্যের জন্য ভক্তের ন্যায়কেও দেবতারা অন্যায় বলে মনে করে। ভক্ত তো মাৎসর্যের পাত্র নয়—পাত্র না হলে কি হয়। মৎসরী ব্যক্তি অপাত্রকে পাত্র করে নেয়। যারা তোমাকে ভজে, তারা দেবতাদের সব লোক অতিক্রম করে তোমার পাদপদ্মে যায়। তা দেবতারা সহ্য করে না, দেবতারা অপমানিত বোধ করে। যারা তোমাকে ভজে না তাদের কোন বিঘ্ন দেবতারা করে না—ভক্ত ভগবানের ভজন করে, ভগবদ্ধামে গমন করে। কারণ বাক্য আছে :

> যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
> ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥
>
> —গীতা ৯।২৫

তাই দেবতারা মাৎসর্যবশে তাদের বিঘ্ন ঘটায়—যাতে তারা তোমার লোকে যেতে না পারে। প্রজা কর দিলে যেমন রাজা তার ওপর কোন বিঘ্ন ঘটায় না, তেমনি যারা যজ্ঞ করে দেবতাদের হবিঃ দান করে, দেবতারা তাদের কোন বিঘ্ন করে

না। ভক্তের তো তাহলে দেবতাদের হবিঃ দান করা উচিত ; তা না করে তারা তো অন্যায়ই করে—না, অন্যায় করে না। ভক্তেব এ আচরণ যে অন্যায় নয়, তা দেবতারা বুঝতে পারে না। বৃক্ষমূলে জলসেচ করলে সমস্ত শাখাপ্রশাখা যেমন আপনা আপনি তৃপ্তি লাভ করে—মূলে জলসেচ ছাড়া যেমন শাখাপ্রশাখাকে তৃপ্ত করার অন্য কোন উপায় নেই—ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হবে যদি প্রাণ তৃপ্ত হয়, ইন্দ্রিয়কে খাদ্য দিলে ইন্দ্রিয় তর্পণ হয় না, তেমনি ভগবদারাধনা করলে সমস্ত দেবতার আরাধনা হয়ে যায়, কারণ ভগবান বলেছেন 'মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে'। আরাধনারূপ জল যদি কৃষ্ণচরণমূলে অর্পণ করা যায়, তাহলে শাখাপ্রশাখারূপ সকল দেবতাই তৃপ্ত হন। মদন যে আজ এই তত্ত্বকথা বলছেন এটিও নারায়ণের কৃপায়। কৃষ্ণ তৃপ্ত হলে ইন্দ্রাদি দেবতা শাখাপ্রশাখা আপনা থেকেই প্রফুল্লিত হবে। মদন ঋষিকে বলছেন—ভক্তেরা তোমার পাদপদ্মে আরাধনারূপ জল দিয়ে ইন্দ্রাদি দেবতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তোমার তত্ত্ব বুঝতে পারলে এ বোধ হয়, কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবতার তো সে বোধ নেই। তারা নিজের পদমর্যাদাতে এতই গর্বিত যে তা বুঝবার সামর্থ্য তাদের নেই। মদনের কথা শুনে ভগবান বলছেন—কিন্তু দেবতাদের তো মহিমা আছে, তাদের মহিমা রক্ষা কর। ইন্দ্রাদি দেবতার বিঘ্ন উৎপাদনের হেতু এমন কিছু বল, যাতে তাদের মহিমা বজায় থাকে। তার উত্তরে মদন বলছেন—ভক্ত থাকে মায়ার জগতে এই ব্রহ্মাণ্ডে আর তুমি থাক চিৎ জগতে। মায়ার জগৎ থেকে ওপরে উঠতে গেলে সিঁড়ি চাই। দেবতারা যে

ভক্তের ওপর বিঘ্ন সৃষ্টি করে—এ বিঘ্ন হল সোপান। ভক্ত এই বিঘ্নকে সোপান করে তোমার কাছে যায়। প্রহ্লাদ এ বিঘ্নরাজি অতিক্রম করে তোমার কাছে গেছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হরি তাঁকে নিশ্চিত রক্ষা করবেন। শরণাগতি যদি আন্তরিক হয়, তাহলে ভগবান রক্ষা করেন। যখন রক্ষা হয় না, তখন ভগবানের ক্রটি নয়—শরণাগতির ক্রটি। মদন বলছেন হে ভগবান, তোমার কৃপায় আমার বুদ্ধি খুলেছে। ভক্ত বিঘ্নের দ্বারা অভিভূত তো হয়-ই না, বরং বিঘ্নের মস্তকে পদাঘাত করে চলে যায়—ধ্রুব তাই করেছেন। এর দ্বারা জগৎকে দেখিয়েছেন—ভগবদ্দাস মৃত্যুর মস্তকে পদাঘাত করে ভগবানের কাছে যায়। ভক্তির আস্বাদ যারা পেয়েছে তাদের জগতের সুখতুঃখ কোনটাই গণনা হয় না। প্রথমে তারা সুখতুঃখ তুটিকেই সমদৃষ্টিতে দেখে, ভক্তির আস্বাদ কার কত হচ্ছে—তা সুখতুঃখের সমদৃষ্টির ওপরে বিচার হবে। এক বস্তা হীরে যদি রোজ পাওয়া যায়, তাহলে যেমন এক পয়সার লাভ বা এক পয়সার ক্ষতি কোনটাই গণনার মধ্যে আসে না, এও তেমনি। তারপর বিচার হবে সুখ এবং তুঃখ—এই তুটির মধ্যে কৃষ্ণপ্রাপ্তির অনুকূল কে আর প্রতিকূল কে? বিচারে দেখা যায় সুখ প্রতিকূল আর তুঃখ অনুকূল। তাই ভক্ত তুঃখ বিপদ প্রার্থনা করে। তুলসীদাসজী বলেছেন—'সুখমে পড়ুক বাজ, তুখমে বলিহারী যাই'। কারণ সে ঘড়ি ঘড়ি হরি স্মরণ করায়। কুন্তী মা গোবিন্দের কাছে বিপদ প্রার্থনা করেছেন। বিপদই ভগবৎপ্রাপ্তির আনুকূল্য করে। দেবতারা ভক্তকে বিঘ্ন দিয়ে

ভগবানের কাছে যাবার সিঁড়ি তৈরী করে দেয়। এতে তাদের ভক্তের সেবা করা হয়ে যায় এবং এই সূত্রে তারা ভগবানেরও সেবা করে। মদন বলছেন—আর যারা তোমাকে ভজে না, তাদের দুটি গতি: (১) কামের বশবর্তী হয়, অথবা (২) ক্রোধের বশবর্তী হয়। ভক্তের জীবনে বিঘ্ন হল কষ্ঠিপাথর —কষ্ঠিপাথরে ঘসলে কোন সোনা কি দামের যেমন বুঝা যায় বিঘ্নের সম্মুখীন হলে তেমনি কোন ভক্তের কেমন দাম বুঝা যায়। যারা ভগবানকে ভজে না, তারা হয় কামের বশীভূত হয়, না হয় ক্রোধের বশীভূত হয়। কামের বশীভূত হলে তবু কিছু ভোগ পায়। আর যারা কামনারূপ অপার জলধি পেরিয়ে এসেছে, তারা ক্রোধের বশীভূত হয়, তারা অতি মন্দ। মদন বলছেন—আমার যে রূপ দেখছেন এ আমার আসল রূপ নয়, আমার রূপ নানা ভাবে দেখা যায়—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সবই কামের চেষ্টা, 'সর্বং কামস্য চেষ্টিতম্'। কামনা সর্বত্রব্যাপী, যে কোন সুখানুভবের নামই মদন। কাম শব্দে বাসনা বুঝায়। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত তো এতদিন ধরে ভোগ করা হল। এতে অভ্যাস হওয়া উচিত কিন্তু অভ্যাস তো হয় না। কামনা জয় করা বড় কঠিন, কামনা অপার জলধি কিন্তু জগতে এমন অনেক তেজস্বী ঋষি আছেন—যাঁরা এ কামনাকে জয় করেন। কিন্তু কপালের ফের এমনি যে তাঁরা সাগর পেরিয়ে গোষ্পদে ডোবেন। ক্রোধকে গোষ্পদ বলা হয়েছে, কারণ ক্রোধ বেশীক্ষণ থাকে না। তাই গোষ্পদ ক্রোধের বশীভূত হলে তাদের সকল চেষ্টাই বিফল হয়। তোমার পাদপদ্ম তারা

ভজে নি ; এই জন্য কপালের ফের তাদের ভোগ করতে হয় —তারা দুশ্চর তপস্যা বৃথা ত্যাগ করে। শ্রীস্বামিপাদ বলেছেন—খাতোদকে টাকার কলসী ফেলে দেওয়ার মত বৃথা তাদের তপস্যা নষ্ট হয় —'ন দানায় ন ভোগায়'। টাকার কলসীর মত তপস্যার ধন কামনা জয়ের দ্বারা ভোগে লাগে না। আবার বিষ্ণুর উপাসনা করে নি, তাই ন মোক্ষায়। মোক্ষেও লাগে না, কিন্তু অভিশাপাদি বাক্যের দ্বারা বৃথা নষ্ট হয়। মদনের স্তুতির মধ্যে ঋষি ঐশ্বর্য প্রকাশ করলেন, বহু সুন্দরী অপ্সরা সৃষ্টি করলেন, যা দেখে মদন অবাক হয়ে ভাবলেন —'অহো রূপম্'। এই স্ত্রীগণ কিন্তু প্রাকৃত বিভূতি। ঋষি বলছেন,—তোমাদের মুগ্ধ করতে চিৎ বিভূতিতে হাত দিতে হয় নি—প্রাকৃত বিভূতিই যথেষ্ট। ঋষি বললেন এদের মধ্যে থেকে একজনকে অন্তত নাও যে স্বর্গের ভূষণ হবে ; তখন উর্বশীকে নিয়ে মদন স্বর্গে চলে গেলেন। ইন্দ্র উর্বশীকে দেখে বিস্মিত হলেন। মদন দেবতাদের সভায় নারায়ণের সব কথা বললেন, ইন্দ্র ভীত হলেন। কিন্তু নারায়ণেব অভয় পাদপদ্ম-বলেই ইন্দ্র সে যাত্রা রক্ষা পেলেন।

হংস, দত্তাত্রেয়, কুমার, সনকাদি মুনিগণ —এঁরা ভগবানের জ্ঞানকলায় অবতীর্ণ, প্রাকৃত বিষয় সম্পর্ক এঁদের হয় নি, এঁরা ভগবানের অবতার। ঋষভদেব—নবযোগীন্দ্রের পিতা (যোগীন্দ্র বড় গরব করে পিতার নাম উল্লেখ করেছেন)। এঁরা সকলেই আত্মযোগ উপদেশ করেছেন। এর মধ্যে হংসাবতার উপাখ্যান উল্লেখযোগ্য। একবার সনকাদি মুনিগণ পিতা ব্রহ্মাকে প্রশ্ন

করেছিলেন, বিষয় এবং চিত্ত পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবিত হয়। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ অতি দুর্বার; কিছুতেই নিবারণ করা যায় না। মুমুক্ষু ব্যক্তি এর আকর্ষণ থেকে কি করে নিজেকে মুক্ত করবে? এই প্রশ্নই সকল মনীষী ব্যক্তির হওয়া উচিত। প্রত্যেকেই ধর্মযাজন কিছু না কিছু করে, কিন্তু ঠিকমত পেরে ওঠে না। তাব আটকায় কোথায়? চিত্তের বিষয়াভিনিবেশ তীব্র, আবার ভুক্ত বিষয় চিত্তে বাসনারূপে স্থিতি লাভ করে। যার ফলে কেউ কাউকে ছাড়তে পারে না। সনকাদি মুনি সমগ্র জীবের হয়ে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং ভগবানের কাছ থেকে জীবের জন্য এর উত্তর রেখে গেছেন। তা না হলে এর উত্তর আমরা কোথায় পেতাম? সনকাদির পিতা ব্রহ্মা এ প্রশ্নবীজ বুঝতে পারলেন না। কারণ ব্রহ্মা কর্মধী, তাঁর বুদ্ধি কর্মেতে আসক্ত। তাই অধ্যাত্ম প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ ব্রহ্মাকে কর্মধী বলেছেন, তার থেকে ব্রহ্মা রেহাই পান নি। কিন্তু শ্রীজীবপাদ ব্রহ্মাকে রক্ষা করেছেন। তিনি বললেন—ব্রহ্মার ওপরে যখন মায়া দিয়ে সৃষ্টিকাজের ভার পড়ল, তখন ব্রহ্মার আশঙ্কা হল মায়া নিয়ে যখন কারবার তখন মায়া আমাকে স্পর্শ না করে—যেমন ছুরি, কাঁচি নিয়ে কাজ করতে হলে হাত কাটবার সম্ভাবনা। ব্রহ্মার এই আশঙ্কা বুঝতে পেরে ভগবান আগেই ব্রহ্মাকে বর দিয়ে রাখলেন—'ভবান্ কল্প-বিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ'। ব্রহ্মা নিজেও বলেছেন—আমার বাক্য কখনও মিথ্যাকে স্পর্শ করে না, আমার ইন্দ্রিয় কখনও বিপথে গমন করে না। কেন

এমন হয় না এর উত্তরে ব্রহ্মা নারদকে বলেছেন হরিদর্শনের অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় আমি হৃদয়ে হরিকে ধারণ করেছি। তাই এই সব হয় না। এর তাৎপর্য হল উৎকণ্ঠা না হলে হরি ধরা যায় না। তাই যদি হয়, তাহলে ভগবান ব্রহ্মাকে কর্মধী বললেন কেন? শ্রীজীবপাদ ব্রহ্মার পক্ষ থেকে সমাধান করেছেন—হংসাবতারের মহিমা প্রকাশের জন্য ব্রহ্মাকে কর্মধী বলা হয়েছে। ব্রহ্মাও যখন কর্মধী তখন জীবের আর কি কথা! জীব যেন এর থেকে সাবধান হয়। কর্ম চিত্তকে মলিন করে। ব্রহ্মা যখন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না, তখন পিতা হয়ে পুত্রের প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না-- এই লজ্জায় ভগবানের শরণ নিলেন। হংস যেমন ক্ষীর নীর পৃথক করে সেই স্বভাবে চিত্ত ও বিষয়, চেতন ও জড়, পৃথক করবেন। এইজন্য ভগবান হংস রূপ ধারণ করে পিতা ব্রহ্মা ও পুত্র সনকাদি মুনির মাঝখানে আবিভূর্ত হলেন। হংসকে দেখে সনকাদি মুনিগণ অতিথি জেনে পাদবন্দনা করেছেন। পরে বিজাতীয় হংসাকৃতি দেখে প্রশ্ন করেছেন—'কো ভবান্?' হংসাবতার এই প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে বলছেন, তোমাদের এ প্রশ্ন কাকে অবলম্বন করে? দেহ, জীবাত্মা অথবা পরমাত্মা—কোনটিকে অবলম্বন করে প্রশ্ন—'কো ভবান্' অর্থাৎ 'আপনি কে?' আত্ম অর্থাৎ জীবাত্মা সম্বন্ধে এ প্রশ্ন হতে পারে না। কারণ সব আত্মার স্বরূপই সমান, সবাই চিদেকরূপ আর দেহ সেও তো সব পঞ্চভূতে গড়া পাঞ্চভৌতিক—অতএব দেহ সম্বন্ধেও এ প্রশ্ন নয়। মাটির বাসনের দোকানে যেমন যে কোন পাত্রই হোক সবই মাটি দিয়ে গড়া আর যদি পরমেশ্বর

ভেবে আমাকে প্রশ্ন করে থাক--'কো ভবান্'—তাও তো ঠিক নয়। কারণ পরমেশ্বর তো দুটি নেই, যা আছে একটিই। তাহলে দৃশ্যাদৃশ্য সবই তো আমি। সবই যদি আমি, তাহলে কে বলবে--'কো ভবান্'। আত্মজ্ঞানী সনকাদির পিতা বলে ব্রহ্মা নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করেন। কখনও পিতার নামে পুত্রের পরিচয় হয়, কখনও আবার পুত্রের নামে পিতার পরিচয় হয়। সেই আত্মজ্ঞানী সনকাদি প্রশ্ন করে পিতাকে আজ বিব্রত করেছেন। আত্মা চিদেকরূপ, তার ওপরে চিত্ত ও বিষয়ের দুটি জামা পরান আছে। চিত্ত ও বিষয় দুটিই অধ্যস্ত দেহ। অনাদি কাল থেকে আত্মার গায়ে এ জামা পরান হয়েছে। তাই মুক্তির কোন ব্যবস্থাই নেই, এ জামা আর খোলা যায় না। তবে মুক্তির উপায় কি ? সূত্র হল—নিষ্কিঞ্চন ভগবৎভক্তের করুণাদৃষ্টিতে অনাদি কালের এই জামা ছিন্ন হবে। জীবের হৃদয়েও মুক্তির বাসনা ওঠে। সংসারযন্ত্রণা থেকে কেমন করে পরিত্রাণ পাব, এ বাসনা ওঠে, কিন্তু কাজে লাগান যায় না। কারণ চিত্ত ও বিষয় পরস্পর পরস্পরকে অবিরত আকর্ষণ করছে যুবক-যুবতীর মত। ভগবান বলছেন এ চিত্ত, বিষয় এবং তাদের আকর্ষণ সবই আমার সৃষ্টি। তাই ছাড়ান যায় না। মুক্তিকামীর প্রথম কর্তব্য হবে, চিত্তকে বিষয়ভোগ থেকে সরাতে হবে। ওষুধ পরে খেলেও চলবে, কিন্তু আগে কুপথ্য নিবারণ করতে হবে। উপবাস দিতে হবে, চিত্তকে বিষয় থেকে সরিয়ে নেওয়াই হল উপবাস। কিন্তু প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না হলেও ভাবনার দ্বারা তো বিষয়ভোগ হবেই। বিষয় মনে মনে টেনে এনে বিষয় ভোগ

হবে, কিন্তু মনে মনে বিষয়ভোগ করলেও ভাবনার সম্পর্ক ও প্রত্যক্ষ সম্পর্কের মধ্যে ভেদ আছে। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, কিন্তু মনে মনে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায় না। রোগী খাদ্য খেতে চায়, কিন্তু খেতে না দিলে রোগীর কল্যাণই হয়। কিন্তু মনের বিষয়ভোগ দ্বারা মানসিক অসুস্থতা তো থেকেই গেল। দেহকে বিষয়ভোগ থেকে সরান সহজ, কিন্তু মনকে বিষয়ভাবনারহিত করা কঠিন। তা না করতে পারলে তো মুক্তি নেই। এর জন্য আলাদা ওষুধ খেতে হবে। গৌরগোবিন্দপাদপদ্ম ধ্যানরূপ ওষুধপানে একমাত্র এ মানসিক অসুস্থতা দূর হয়। প্রাকৃত দেহবিষয় কুৎসিত এবং এর মধ্যে সবচেয়ে কুৎসিত জিনিষটি হল তার ক্ষণভঙ্গুরতা। কিন্তু তাকেও আমরা ভালবাসি, সুন্দর বলে গ্রহণ করি। অসুন্দরকে যদি সুন্দর বলে গ্রহণ করা যায়, তাহলে সত্যকার সুন্দর ভগবানকে মনকে বুঝিয়ে কেন গ্রহণ করান যাবে না। প্রিয় বলে যদি মন বুঝতে পারে তাহলেই গ্রহণ করবে। মনকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে কৃষ্ণপাদপদ্ম ভালবাসাতে হবে। তাঁর রূপ, গুণ, লীলা শুনিয়ে শুনিয়ে মনকে কৃষ্ণপাদপদ্মে মজাতে হবে। মনকে বুঝান পর্যন্তই পরিশ্রম—মন একবার বুঝে নিতে পারলে আর পরিশ্রম নেই। প্রাকৃতবিষয়ভোগকে প্রিয় বলে ভাবনাই ব্যাধি। ভগবানকে প্রিয় বলে মনকে ভাবতে হবে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অন্ততঃ মনকে বুঝাতে হবে যে কৃষ্ণপাদপদ্ম প্রিয়, যে তা পারে সেই ব্যক্তিই সাধু। তারই জন্মমরণ সার্থক। হংসাবতারের কথা এখনও আমরা শুনতে পাচ্ছি। কথার কত

দাম। শ্রীশুকদেব তাঁর আর্ষ প্রজ্ঞাতে সে কথা ধরে রেখে আমাদের দিয়েছেন।

হয়গ্রীব অবতারে ভগবান পাতাল থেকে বেদ উদ্ধার করেন। মধুদৈত্য বেদরাশিকে গ্রাস করেছিল, ভগবান যোগনিদ্রায় অভিভূত। ব্রহ্মা যোগনিদ্রার স্তুতি করলেন, যোগনিদ্রা সরে এলেন, অচ্যুত জাগ্রত হলেন। হয়গ্রীব অবতারের সঙ্গে মধু-কৈটভ দৈত্যদের পাঁচ হাজার বছর ধরে যুদ্ধ হল। দৈত্য দুজন যুদ্ধে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবানকে বললেন,—বর নাও। ভগবান দেখলেন, যোগনিদ্রার কাজ এর মধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে। ভগবান বললেন, 'তোমরা আমার বধ্য হও'। দৈত্যেরা বলল, —'তথাস্তু'। কিন্তু যেখানে জল নেই, সেখানে আমাদের বধ কর। ভগবান জানুর ওপরে রেখে মধুকৈটভ দৈত্যকে বধ করেন। মৎস্য-অবতারে ভগবান সত্যব্রত মনুকে প্লাবন হতে রক্ষা করেন। বরাহ-অবতারে ভগবান হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। কূর্ম-অবতারে মন্থনদণ্ড মন্দর পর্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করেন। হরি-অবতারে একান্ত আর্ত ও শরণাগত গজেন্দ্রকে রক্ষা করেন।

ত্রিকূট পর্বতে এক সুবিপুল সরোবরে একটি যূথপতি করী করেণুদের নিয়ে জলবিহার করছিলেন। এমন সময় ঐ সরোবরে এক বলবান কুমীর গজেন্দ্রের চরণ আক্রমণ করলেন। গজেন্দ্র নিজের বলবিক্রম প্রকাশ করতে লাগলেন। কুমীরের বলও অল্প নয়, তিনিও মহাবেগে আকর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন। হস্তীর এই অবস্থা দেখে হস্তিনীর দল তাকে ত্যাগ

করে জল থেকে উঠে আত্মরক্ষা করল। বিপদে সংসারে এই অবস্থা হয়। আত্মীয়, পরিজন—বিপদে পড়লে কেউ কারও নয়। এইভাবে সুদীর্ঘকাল গজেন্দ্রের কুমীরের সঙ্গে যুদ্ধে তার উৎসাহ —শারীরিক মানসিক বল, ইন্দ্রিয়সামর্থ্য সবই ক্ষীণ হয়ে এল এবং কুমীর ক্রমশ তাকে জলের নীচে টানতে লাগলেন। এইভাবে গজেন্দ্রের যখন প্রাণ প্রায় যায় যায় অবস্থা শ্রীহরি-পাদপদ্মে শরণাগতি নিয়ে গজেন্দ্র সমাহিত চিত্তে ভগবানের স্তব করতে আরম্ভ করলেন। গজেন্দ্র কাতরস্বরে আর্তিভরে ভগবানের চরণে নিবেদন করছেন—'প্রভু গো, কুমীরের আক্রমণে আমি ক্লান্ত, অবসন্ন, প্রাণ বোধ হয় আমার আর থাকবে না—তবে তুমি তো অশেষ শক্তিমান—বহু বিরুদ্ধ বিশেষণ দিয়ে প্রভুকে আহ্বান করলেন গজেন্দ্র—যাঁর জন্মকর্ম নেই, নাম-রূপ নেই, গুণদোষ নেই, তবু যিনি লোকের উৎপত্তি এবং বিনাশের জন্য নিজ মায়ার দ্বারা সময়ে সময়ে জন্মকর্ম স্বীকার করেন তিনি আমার পরম গতি হোন। তিনি অরূপ ব্রহ্ম আবার বহুরূপী ও অনন্তশক্তি, তিনি সকলের প্রকাশক, বিশ্বের নিয়ন্তা—বাক্য, মন ও চিত্তের অপ্রাপ্য ; তিনি সগুণ এবং নির্গুণ, তিনি জ্ঞানঘন শান্ত, শুদ্ধ কৈবল্য-নাথ, নিষ্কারণ আবার পরম কারণ অক্ষর, অব্যক্ত পরম্ ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়, তিনি আমাকে রক্ষা করুন। তিনি দেবতা নন, দানব নন, স্ত্রী নন, পুরুষ নন, তিনি আমার মুক্তির জন্য আবির্ভূত হোন।

এইভাবে বহু স্তুতিবাদের পর ভগবান গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করে, চক্রধারণ করে বিপন্ন গজেন্দ্রের কাছে উপস্থিত

হলেন। আকাশপথে গরুড়ের পৃষ্ঠে চক্রধারীকে দর্শন করে গজেন্দ্র ভগবানের চরণকমলে উপহার দেবার জন্য মানস সরোবর থেকে একটি বিকশিত কমল শুঁড় দিয়ে তুলে নিয়ে, মুখে উচ্চারণ করলেন—'হে নারায়ণ, হে অখিলগুরো, হে ভগবন্ তোমাকে নমস্কার'।

দয়াময়ের হৃদয়ে দয়ার উচ্ছলন হল—ভাবলেন, গরুড় শ্লথ-গতি হয়েছে। তাই ভক্তবাৎসল্যের আকর্ষণে সহসা অবতীর্ণ হয়ে মহাবেগে গজেন্দ্রের কাছে এসে চক্রদ্বারা কুমীরকে বিনাশ করে গজেন্দ্রকে মুক্ত করলেন।

ভগবান নরসিংহ অবতারে স্ফটিকস্তম্ভে অবির্ভূত হয়ে দৈত্য-পতি হিরণ্যকশিপুর বক্ষা বিদারণ করে নিজভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করেন। হিরণ্যকশিপু মন্দর পর্বতে দীর্ঘকাল তপস্যা করে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। ফলে বর যা পেয়েছিলেন তাতে একরকম অমরত্বই লাভ হয়েছিল। কারণ জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে দিবা-রাত্রি, প্রাণবান-প্রাণহীন কোনও কিছুতে তাঁর মৃত্যু হবে না। হিরণ্যকশিপুর বাসনা ছিল অমর হওয়ার জন্য, অর্থাৎ যাতে কোন দিন প্রাকৃতবিষয়ভোগের নিবৃত্তি না হয়। কিন্তু ব্রহ্মার পক্ষে অমরত্ব দান সম্ভব নয় তবু প্রকারান্তরে প্রায় অমরত্বই লাভ হয়েছে, কারণ ব্রহ্মার সৃষ্ট কেউ তাঁকে বিনাশ করতে পারবে না। ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুর অভিলষিত বর দান না করে পারেন নি কারণ দৈত্যপতি এমনই জোরালো তপস্যা করেছেন। অবশেষে ব্রহ্মার বাক্যকে সফল করে ভগবান অর্ধেক পশুরাজ সিংহমূর্তি এবং অর্ধেক মনুষ্যমূর্তিতে (ব্রহ্মার সৃষ্টির

বাইরে) অচেতন স্ফটিকস্তম্ভে আবির্ভূত হলেন। কারণ স্ফটিক-স্তম্ভের দিকে দৃষ্টি দিয়ে ভক্ত প্রহ্লাদ বলেছিলেন পিতাকে আমার প্রভুকে এই স্তম্ভেও দেখা যাচ্ছে। এতে প্রহ্লাদের বাক্যও রক্ষা হল, আরও রক্ষা হল দেবর্ষিপাদ নারদ ও সনকাদি ঋষির বাক্য। সনকাদি ঋষির অভিশাপে বৈকুণ্ঠনাথের দ্বারী জয় এবং বিজয় প্রথম জন্মে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে অবতীর্ণ, তিনজন্মে তাদের উদ্ধার। ভগবানের সঙ্গে বিরোধিতা করবেন বলেই তাঁরা আবির্ভূত হয়েছেন। দেবর্ষিপাদ দেবরাজ ইন্দ্রকে বলেছিলেন দেবতাদের দৈত্যপতির উৎপীড়ন হতে নিষ্কৃতির একটিমাত্র উপায় ভক্ত প্রহ্লাদের ওপর দৈত্যরাজের দ্রোহ আচরণ। যার ফলে ভগবানের আসন টলেছে, কারণ তেত্রিশ কোটি দেবতার দুঃখে ভগবান বিচলিত হন নি, কিন্তু একটি ভক্তের ওপর অত্যাচার ভগবান সহ্য করতে পারেন নি। ভক্তের প্রেমে ভগবান এমনই বশীভূত। হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করে ভগবান সাধুদের অভয় দান করেন।

কশ্যপ প্রজাপতির জন্য বালখিল্য ঋষিরা কাষ্ঠ আহরণ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে জলে নিমগ্ন হয়ে বিপদের সম্মুখীন হয়ে ভগবানের স্তুতি করেন। তাতে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান তাঁদের রক্ষা করেন। আবার দেবরাজ ইন্দ্র যখন বৃত্রাসুরকে বধ করে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন, তখনও ভগবান ইন্দ্রকে উদ্ধার করেন। অসুরগৃহে নিরুদ্ধা অনাথা দেবস্ত্রীদের ভগবান মুক্ত করেন। এইভাবে ভগবান বহু অবতারে আবির্ভূত হয়ে জগতের কল্যাণবিধান করেন।

আবার কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে ও দেবমাতা অদিতির গর্ভে বিষ্ণু ভগবানের অনুজ হয়ে ভগবান বামন-অবতারে আবির্ভূত হন। সমুদ্র মন্থনকালে ধন্বন্তরী যখন অমৃতকলস নিয়ে ওঠেন তখন দেবতা ও অসুর দুই দলই সে অমৃত-আস্বাদনে লোলুপ। কিন্তু অসুরগণ অমৃতভোজী হলে পৃথিবীতে অনর্থ হবে—এই আশঙ্কায় ভগবান বিষ্ণু নিজে মোহিনী-মূর্তিতে সে অমৃত পরিবেশনের ভার নিলেন। অসুরেরা ভগবানের মায়ায় মুগ্ধ হলেন, দেবতাদের মাঝে সুধা বণ্টন করা হল। দৈত্যপতি বলিরাজ মোহিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করে বলেছিলেন—'মোহিনী! আমি তোমার হলাম, কিন্তু তুমি আমার হবে তো?' মোহিনী বললেন—'মহারাজ, আমরা তো স্বৈরিণী রমণী, সুতরাং আমাদের ওপর বিশ্বাস কি—ভবিষ্যতে দেখা যাবে'। সেই দেখা যাবার দিনটি এসেছে, ভগবান যখন বামন-অবতারে বলিরাজের কাছে ভিক্ষাগ্রহণের ছলে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেছেন। সদ্য উপনীত ব্রাহ্মণবটু, মুণ্ডিতমস্তক, দণ্ডকমণ্ডলুধারী বলিরাজের দানের খ্যাতি শুনে এসেছেন দান গ্রহণ করতে। বামন ভগবান যখন বলিরাজের কাছে নিজের ক্ষুদ্র চরণের ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করেন, বামন ভগবানের শ্রীচরণ নখর হতে আরম্ভ করে মস্তক পর্যন্ত সর্বশুদ্ধ একহাত পরিমাণ—তার মধ্যেই অসীম রূপের ছটা—প্রতি অঙ্গে অপরূপ রূপলাবণ্য—এ রূপদর্শনে বলিরাজ মুগ্ধ হয়েছেন। বলেছেন—'ব্রাহ্মণবটু তুমি যা চাইবে তাই দেব।' বলিরাজের কথায় ভগবান প্রশংসা করে বললেন—'অসুররাজ! তোমার পিতা বিরোচন নিজের শত্রু

জেনেও ব্রাহ্মণবেশধারী দেবতাকে নিজের পরমায়ু দান করেছিলেন, কারণ তিনি ব্রাহ্মণবৎসল ছিলেন—তুমি তোমার পূর্বপুরুষগণের যশস্বি-পদাঙ্কই অনুসরণ করেছ। তাই তোমার কাছে কিঞ্চিৎ ভূমি ভিক্ষা করি। হে দৈত্যেন্দ্র! আমার পদের পরিমাণে তিনপদ মাত্র পৃথিবী চাই। রাজন, তুমি অসামান্য দাতা, আমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত তুমি দিতে পার, কিন্তু আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করব না।'

ভগবান বামনদেবের কথা শুনে বলিরাজ বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন :

অহো ব্রাহ্মণদায়াদ বাচস্তে বৃদ্ধসম্মতা :।

ত্বং বালো বালিশমতিঃ স্বার্থং প্রত্যবুধো যথা॥ ভা. ৮।১৯।১৫

ওহে ব্রাহ্মণবটু কথা তো বেশ বিজ্ঞের মত বলছ দেখছি, কিন্তু নিজের স্বার্থবুদ্ধিটুকুও তো তোমার নেই : তা না হলে তোমার ঐ ক্ষুদ্র চরণের তিন পাদ ভূমি প্রার্থনা করছ। বামন-ভগবান বললেন—মহারাজ! আমরা জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, তাই তিন পাদ ভূমি পেলেই খুশী কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে সাম্রাজ্য দিয়েও সুখী করা যায় না। এর পরে বামন ভগবান ত্রিবিক্রম মূর্তি ধারণ করে এক চরণে সমগ্র মর্ত্যভূমি, দ্বিতীয় চরণে সমগ্র স্বর্গ-ভূমি এবং দেহকে বিস্ফারিত করে ভুবর্লোক, অন্তরীক্ষলোক অধিকার করলেন। নাভিদেশ থেকে তৃতীয় চরণ প্রকাশ করে তার স্থান প্রার্থনা করলেন, কিন্তু বলিরাজের তো আর স্থান নেই। ভগবান বলিকে তিরস্কার করে বরুণ পাশ দিয়ে বেঁধেছেন, তোমার সত্যরক্ষা কর মহারাজ। বলিরাজ বলেছেন—তিরস্কার

আমাকে করছ কর প্রভু, কিন্তু আমার পক্ষে দাস হয়ে প্রভুকে তো কিছু বলা সাজে না। তবু কিছু না বলে পারছি না, তুমি ভূমি প্রার্থনার সময় যে চরণ দেখিয়েছিলে, ভূমি গ্রহণের সময়ে কি সেই চরণ আছে? তৃতীয় চরণের স্থান যখন বলিরাজ দিতে পারছেন না, ভগবানের বাক্যবাণে যখন জর্জরিত হচ্ছেন, তখন বলিরাজের স্ত্রী রাণী বিন্ধ্যাবলী ছুটে এসেছেন, বলেছেন —'মহারাজ! এখনও দর্প-অভিমান আছে—নিজের মাথাটি ভগবানের ঐ রাঙা চরণে নিবেদন করে বলতে পারছেন না না মহারাজ! এই সর্বস্ব তোমার চরণে দিলাম। তখন বলিরাজ নিজের মাথাটি ভগবানের কাছে পেতে দিয়ে বললেন:

পদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষ্ণি মে নিজম্।

ভগবান তাঁর তৃতীয় চরণ বলিরাজের মস্তকে দিয়ে তাঁকে আত্মসাৎ করলেন। এখানে প্রশ্ন হতে পারে ভগবানের যে চরণ স্বর্গ এবং মর্ত্যভূমি অধিকার করেছে সেই চরণ ঐ ক্ষুদ্র মস্তকে স্থান পেল কি করে? মহাজন সমাধান করেছেন—তা হবে না কেন? বলিরাজ তো তাঁর মস্তকের বুদ্ধি দিয়ে এ ত্রিভুবন অধিকার করেছেন। ধনের চেয়ে যেমন ধনী বড়, তেমনি স্বর্গ মর্ত্যভূমির চেয়ে বলিরাজের মস্তকের স্থান বড়। তাই ভগবানের তৃতীয় চরণের স্থান বলিরাজের মস্তকে অনায়াসে হতে পারবে। ভগবান বামনদেব বলিরাজকে করুণা করে আত্মসাৎ করেছেন। বলিরাজ আত্মনিবেদন করেছেন, তাঁর আত্মনিবেদনের মন্ত্র—'মাং মদীয়মহং দদে'—'তোমার চরণে আমাকে দিলাম এবং আমার বলতে যা কিছু আছে সর্বস্ব

তোমার চরণে দিলাম।' মুহূর্তের জন্য ভগবান বলিরাজকে বরুণপাশে আবদ্ধ করেছিলেন, বিনিময়ে সারাজীবনের মত সুতলে বলিরাজের দ্বারে দ্বারী হয়ে আছেন।

এর পরে ভগবানের পরশুরাম ও রাম অবতার। পরশুরাম হৈহয়পুর অর্থাৎ কার্তবীর্যপুরে একুশ বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। এখানে যোগীন্দ্র বলেছেন—যে রাম পৃথিবীকে একুশ বার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, তিনিই সাগর বেঁধেছিলেন :

সোঽব্ধিং বধ্নন দশবক্ত্রমহন্ সলঙ্কং সীতাপতির্জয়তি
লোকমলঘ্নকীর্তিঃ॥ ভা. ১১।৪।২১

এখানে অংশাংশিনোরভেদাভিপ্রায়াৎ—পরশুরাম অংশ রামচন্দ্র অংশী। জনক রাজার ঐশ ধনু ভঙ্গ করে ভগবান রামচন্দ্র জানকীকে বিয়ে করেন। 'সলঙ্কং দশবক্ত্রমহন্'—এখানে লঙ্কার সঙ্গে দশাননকে বধ করেছিলেন। এ অর্থ করলে সমীচীন হবে না, তাহলে তো লঙ্কাও ধ্বংস হয়ে যেত। এখানে এই রকম অর্থ করতে হবে—লঙ্কায় অবস্থিত রাবণকে বধ করেছিলেন। এখানে ভগবান রামচন্দ্র সম্বন্ধে জয় ঘোষণা করে যোগীন্দ্র বললেন—'জয়তি সীতাপতি'—'জয়তি' বর্তমান কাল দেওয়া আছে। কারণ সীতাপতি তখন প্রকট। ত্রেতাযুগের ঘটনা। লোকমলঘ্নকীর্তি সীতাপতি—লোকের মল যিনি বিনাশ করেন—মল হল অবিদ্যাজনিত ভগবানে অরুচি। এই অরুচি যিনি বিনাশ করেন তিনিই মলঘ্নকীর্তি। রামচন্দ্র ভগবান মর্যাদাপুরুষোত্তম, তাঁর প্রতিটি লীলাই করুণ; তাই প্রতিটি লীলাই সুন্দর। রামচন্দ্রের জীবনে বিরহে মিলন

আরও সুন্দর হয়েছে। অলঙ্কার শাস্ত্রেও বলা আছে বিরহ না থাকলে মিলনের মাধুর্য হয় না। কাপড় কষজলে ডুবিয়ে নিয়ে তাতে রং ধরালে যেমন রং খোলে তেমনি বিরহকষ-জলে চিত্ত ডোবালে তাতে মিলনের রঙ ভাল ধরে। বিরহের পরে মিলনের ভোগ হয় বেশী। নিরন্তর মিলনে ঠিক মিলনের মধুর আস্বাদ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ-অবতারে এই বিরহ অবস্থা প্রকট হয়েছে। কৃষ্ণ ভগবান সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'নিরন্তর কামক্রীড়া যাহার চরিত'—নিজ আনন্দিনী শক্তির সঙ্গে সর্বথা বিহার, এটিই ভগবত্তার চরম। সকলেই নিজ শক্তির সঙ্গে বিহার করে—গীতশক্তি, চিত্রশক্তি —এদের সঙ্গে বিহার ক'রেই লোকে সুখ পায়। জীবের পক্ষে নিজশক্তিকে মূর্তি দেবার সামর্থ্য নেই, কিন্তু ভগবানের সে সামর্থ্য আছে। তাই ভগবান তাঁর আনন্দিনীশক্তির রূপ দিয়ে অসংখ্য গোপবালার সঙ্গে বিহার করেছেন। এর নামই শ্রীলীলামুকুটমণি রাসলীলা। 'আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্'—এই আনন্দিনী শক্তির সঙ্গে ভগবানের বিহার, রাধামাধবের বিহার —এইটি স্বাভাবিক। এটি আরম্ভ হয়েছে রামচন্দ্র স্বরূপে। এখানেই প্রথম বিরহ আস্বাদন। রামচন্দ্রের জগতের সঙ্গে ব্যবহার এত স্বাভাবিক যে তাঁর ভগবত্তাকে যেন বুঝা যায় না। ভগবান যখন অংশাবতারে এসেছেন, তখন তাঁর কাজ আমাদের সঙ্গে মেলে না। ভগবান যতই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়েছেন ততই তাঁর ব্যবহার স্বাভাবিক হয়েছে। শ্রীশুকদেব রামচরিত্র বর্ণন করেছেন : বনপথে চলতে চলতে রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণকে

বলছেন—বনের পায়ে-হাঁটা পথ আগাছায় ঢেকে গেছে; আসল পথ চেনা যাচ্ছে না। লক্ষ্মণ বুঝতে পারলেন না এ কথার সার্থকতা কি? এর অর্থ হল কলিকালে উপধর্মরূপ আগাছা এত বৃদ্ধি পাবে যে তাতে আসল ধর্মের পথ ঢেকে যাবে—আসল ধর্মের পথ চেনা যাবে না—ভগবান রামচন্দ্র পিতৃ-আদেশে বনগমন করেছেন এবং তার দ্বারা দেবতাদের কার্য সিদ্ধি হয়েছে। রাম-অবতারের আসল কারণ পিতা দশরথ ও মাতা কৈশল্যার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তাদের প্রেম আস্বাদন, দেবতাদের কার্যসিদ্ধি গৌণ, যেমন ভগবান কৃষ্ণের কংসবধ কাজটি অকিঞ্চিৎকর; কিন্তু প্রেমদান এবং প্রেম-আস্বাদন কাজই মুখ্য। চণ্ডীতে বিষ্ণুশক্তিই তো অসুরবধ করেছেন। এখানেও বিষ্ণুশক্তি দিয়েই অসুরবধ অর্থাৎ রাবণবধ হতে পারত। সেজন্য ভগবান রামচন্দ্রের আসবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু দশরথ কৌশল্যার প্রেমে মুগ্ধ হয়েই তাঁদের বাৎসল্যপ্রেম আস্বাদনের জন্যই রামচন্দ্রের আবির্ভাব।

চতুর্বিংশতি চতুর্যুগের ত্রেতায় রামচন্দ্র অবতার, আর অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের দ্বাপরে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব অর্থাৎ রামচন্দ্রের আবির্ভাবের সতের যুগ পরে কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব। বর্তমানে সপ্তম বৈবস্বত মনুর রাজত্ব চলছে। ধর্মশীল যদুরাজের বংশে কৃষ্ণ জন্মেছেন। যদুর পিতা মহারাজ যযাতি শুক্রাচার্যকন্যা দেবযানীর পাণিগ্রহণ করেন। রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা সহস্র দাসীসঙ্গে দেবযানীর দাসী হয়ে থাকলেন। অবিবাহিতা অবস্থায় দাসী শর্মিষ্ঠার গর্ভে পুরুর জন্ম হওয়ায়

মহারাজ যযাতির ওপর শুক্রাচার্যের অভিশাপ হয়। তার ফলে যযাতি জরাগ্রস্ত হন। এই জরা জ্যেষ্ঠপুত্র যদু নেন নি ; তিনি ভাবলেন, আমার যৌবন দিয়ে পিতার জরা নিলে তা দিয়ে তো হরিভজন হবে না। উচ্ছিষ্ট খাদ্য দিলে ভিখারীও খায় না, আর হরিভজন এই উচ্ছিষ্ট দেহ দিয়ে কেমন করে হবে? উচ্ছিষ্ট দেহ ভগবানকে দেওয়া চলে না, কিন্তু ভগবান অত্যন্ত লোভী বলে তিনি গ্রহণ করেন। যদুমহারাজ বিচার করেছেন —পিতার বাক্য লঙ্ঘন করায় তাঁর অপরাধ হল কি না। পিতা দুজন : (১) প্রকাশক পিতা, (২) পরমপিতা। ঈশ্বর সকলের পিতা—তাই পিতৃদ্রোহ করলেই দণ্ডভোগ করতে হবে। জগতে কর্তব্য ও অকর্তব্য দুটি আছে—ঋণশোধ কর্তব্য আর হরিভজন অবশ্য কর্তব্য। হরিপাদপদ্মে মজে তাঁকে ভজতে পারলে আর কিছু করতে পারা যাবে না। এই জন্যই ভগবানের চরণকে পদ্ম বলা হয়েছে। চরণপদ্ম তাই ভক্ত ভ্রমরকে আকৃষ্ট করবে। ভ্রমর পদ্মে আকৃষ্ট হলে তার পক্ষে যেমন আর কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়, তেমনি হরিপাদপদ্মভজন ছেড়ে ভক্তেরও আর কিছু করা সম্ভব নয়। শ্রীমদ্ভাগবত বললেন, যে ব্যক্তি হরিপাদপদ্মভজন করে তার কোন ঋণ থাকে না। ভগবানের নিজের মতও তাই। তাই বলেছেন :

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। গীতা ১৮।৬৬

এর পরে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাবপ্রসঙ্গ যোগীন্দ্র উল্লেখ করেছেন। পৃথিবীর ভার হরণের জন্য ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র যদুকুলে আবির্ভূত হয়েছেন। যা কখনও ছিল না, তার জন্ম হয়।

ভগবানের জন্ম হল বলা চলে না, কারণ তিনি নিত্যকাল আছেনই। তিনি অজ হলেও বলবার জন্য বলা হয়, ভগবান জাত হলেন—'অজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ'। ভগবান কৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণ যোগীন্দ্র যা উল্লেখ করলেন—ভূমির ভার হরণ সেটি ঠিক কথা নয়—ভূমির ভার হরণ উপলক্ষ্য মাত্র। কৃষ্ণ আবির্ভাবের অনেক কারণ। গীতায় অর্জুনের কাছে ভগবান যে কারণ উল্লেখ করেছেন :

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ গীতা ৪।৭-৮

এ হল ভগবানের অন্য অবতারের কারণ—স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাবের কারণ—এটি হতে পারে না।

শ্রীরাসলীলাপ্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব উল্লেখ করেছেন :

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥
ভা. ১০।৩৩।৩৭

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাবের কারণ বলছেন—মানুষের দেহকে আশ্রয় করে ভগবান যে আবির্ভূত হলেন, তা প্রাণীদের প্রতি অনুগ্রহ বিধানের জন্য। তিনি জগতে আবির্ভূত হয়ে এমন লীলা প্রকাশ করলেন যা শুনে জীবের তাঁর প্রতি রতি হয়। ভগবানের এই মানুষ দেহ আশ্রয় সম্বন্ধে গীতাতেও বলা আছে :

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ গীতা ৯।১১

আমার মহান্ ঐশ্বর্য জানে না বলেই তারা আমাকে মানুষ বলে মনে করে অর্জুন এবং এতেই আমাকে অবজ্ঞা করা হয়। মানুষের মত ভগবান দেখতে হলেও, উপাদান এক নয়— স্বর্ণপিণ্ডনির্মিত মানুষ যেমন মানুষ নয়। ভগবানের দেহের উপাদান সৎ চিৎ আনন্দ, আর মানুষের দেহের উপাদান রক্ত মাংস মেদ মজ্জা অস্থি চর্ম প্রভৃতি। মানুষের দেহ যদি ভগবানের হয় তাহলে তিনি কি গরুড়ের পিঠে উঠতে পারেন? শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য:

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥

মানুষীং তনুম্ বলতে মানুষের শরীরের যেমন সন্নিবেশ ভগবানের দেহের সন্নিবেশ সেই রকম। মানুষ যেমন দেহকে আশ্রয় করে, ভগবান তেমনি দেহকে আশ্রয় করেছেন বললে ভুল হবে। ভগবান দেহী এবং তাঁর দেহ নিত্য। বলা আছে:

গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্। ভা. ৭।১০।৪৮

তাইতো বাক্য আছে:

কৃষ্ণের যতেক খেলা
সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশের অবস্থা বর্ণন করা আছে। মুরারির অধ্যাত্ম যোগ ভাল লাগে, বাশিষ্ঠ

পড়ে, ভক্তি তার রোচে না। আর মুকুন্দের উপাস্য হলেন চতুর্ভুজ নারায়ণ—শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্মধারী। দ্বিভুজ মুরলীধর স্বরূপকে তিনি ভগবান বলে মানতে চান না। অদ্বৈত আচার্য প্রভু মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন—'প্রভু এটা কি তোমার মত নয়?' মহাপ্রভু বললেন—'ভক্তিরসের বন্যা বইয়ে গঙ্গার জলে নয়নের জল মিশিয়ে তুমি যে আমাকে এনেছ আচার্য তুমিও এই কথা বলছ?' মহাপ্রভু বললেন—'ভগবানের স্বাভাবিক রূপ দ্বিভুজ আব ঐচ্ছিক রূপ চতুর্ভুজ বহুভুজ'। তত্ত্বকথা হল ভগবান মনুষ্যদেহ নিত্য ধারণ করে আছেন, গোলোকেও তিনি দ্বিভুজ—এইটিই তাঁর নিত্যরূপ। দ্বিভুজ রূপ তাঁর বড় প্রিয়, তিনি এই রূপ বড় ভালবাসেন। তাই তাঁর প্রিয় মানুষকে দ্বিভুজ করে গড়েছেন তাঁর প্রিয় হবে বলে। পাণ্ডবজননী কুন্তীও ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব সম্বন্ধে কারণ উল্লেখ করেছেন ঃ

ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানামবিদ্যাকাম কর্মভিঃ।
শ্রবণস্মরণার্হানি করিষ্যন্নিতি কেচন॥ ভা. ১।৮।৩৫

অবিদ্যা, কাম এবং কর্মের দ্বারা জীব নিয়ত ক্লিষ্ট। ভগবান এ জগতে আবির্ভূত হয়ে যে লীলা করলেন, তা শ্রবণ করে, কীর্তন করে, স্মরণ করে জীব অচিরে কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করবে। কৃষ্ণ চরণাম্বুজ দর্শনের ফলে তার সকল ক্লেশ নিবৃত্ত হয়ে যাবে এবং জন্মমরণ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে। কৃষ্ণ-আবির্ভাবের এইটিই হেতু। কুন্তীমাও বলেছেন পৃথিবীর ভারহরণের জন্য ভগবানের

আবির্ভাব, কিন্তু সেটি গৌণ; কারণ জীবের ক্লেশ দূর করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

যোগীন্দ্র বললেন, দেবতাদের পক্ষে যা দুষ্কর, ভগবান যদু বংশে জন্মগ্রহণ করে তাই করবেন। পৃথিবীর ভার অপহরণের জন্য স্বয়ং ভগবানের আসবার দরকার হয় না, আবেশ অবতারের দ্বারাই সে কাজ হয়। রজোগুণ থেকে অসুরের জন্ম। রজোগুণ এবং তমোগুণকে দমন করে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করাই পৃথিবী রক্ষা। প্রতিটি শরীরে তিনটি ধাতুর প্রভাব দেখা যায়—বায়ু পিত্ত কফ, রজঃ সত্ত্ব ও তমঃ গুণের মত। রজোগুণকে আশ্রয় করে ব্রহ্মা, তমোগুণকে আশ্রয় করে শিব এবং সত্ত্বগুণে বিষ্ণু ভগবান। অসুর দমন করে ভগবান পৃথিবীর ভার হরণ করেন, অর্থাৎ সত্ত্ব গুণ বৃদ্ধি করেন। এই পৃথিবীর ভার হরণের জন্য ব্রহ্মা, শিব, নারদ এবং অন্যান্য দেবতা ক্ষীরসাগরের তীরে গিয়ে ক্ষীরোদ-শায়ীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন—দেবতারা মানুষ হয়ে, ঋষিরা গাভী হয়ে, তৃণগুল্ম হয়ে গোকুলে জন্ম নেবেন। কৃষ্ণ-অভিন্নতত্ত্ব বলদেব অগ্রজ হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। ব্রজবাসী সকলে দেবতা। এখন কথা হচ্ছে ভগবান যদি ভারহরণের জন্যই আবির্ভূত হন, তাহলে এত সব আয়োজন কেন? তাহলে বুঝা যাচ্ছে, ভারহরণ আসল কাজ নয়—উপলক্ষণমাত্র। ভগবানের অন্য উদ্দেশ্য আছে। স্বয়ংভগবান শ্রীগোবিন্দের আবির্ভাবের আসল উদ্দেশ্য হল পরকীয়া রস আস্বাদন। যাঁরা গোবিন্দের মনের কথা জানেন অর্থাৎ গোবিন্দে বিশ্বস্তধী যাঁরা তাঁরা

সেই কারণই উল্লেখ করেছেন। শ্রীরাসলীলাপ্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বললেন :

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকা।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥
—ভা. ১০।২৯।১

ভগবান অর্জুনের কাছে তাঁর আবির্ভাবের যে কারণ উল্লেখ করেছেন, সেটি ফাঁকা কথা ; কারণ অর্জুন তো নর্মসখা নন, তাই আসল মনের খবর দেন নি। কৃষ্ণের কাজ অসুরমারণ নয় :

বিষ্ণু দ্বারে কৃষ্ণ করেন অসুর সংহার।

কৃষ্ণের কাজ তাহলে কি ? নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত। কৃষ্ণ অখিলমাধুর্যঘন বিগ্রহ, অসুরমারণ কাজ তাঁর হতে পারে না। পালনকর্তা বিষ্ণুর ওপরেই পৃথিবী রক্ষার ভার। তাই অসুর বিনাশ করে, রজোগুণকে দমন করে, সত্ত্বগুণকে বর্ধিত করে তিনি পৃথিবী রক্ষা করেন। গোলোকেও দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, চার রসের খেলা। গোলোকাধীশ শ্রীগোবিন্দ তাঁর পরিকর নিয়ে এলেন ভূ-বৃন্দাবনে লীলা করতে। তবু গোলোকের লীলা অপেক্ষা ভূবৃন্দাবনের লীলার মাধুর্য সমধিক। এ বৈশিষ্ট্যের কারণ কি ? তাঁরাই তো লীলা করেছেন, বনভোজনের মত এতে নূতন আস্বাদ। সেই একই চাল-ডাল, লোকজন, তবু বনভোজনের আস্বাদ বেশী।

বাক্‌পতি বেদবক্তা লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দের আবির্ভাবের কারণ নির্দেশ করেছেন :

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো॥

—ভা. ১০।১৪।৩৭

হে প্রভু, তুমি নিজে নিষ্প্রপঞ্চ হয়েও প্রপঞ্চের মত ব্যবহার কর। ভগবান যেন প্রশ্ন করছেন—কেন ব্রহ্মন্, এটি করবার প্রয়োজন কি বলতে পার? ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, তোমার দয়া হলে বলতে পারি—যারা 'যা কর গোবিন্দ' বলে সর্বস্ব ত্যাগ করে পড়ে আছে তাদের আনন্দবিধানের জন্য, ভূভার-হরণের জন্য ভগবানের আবির্ভাব—এ কথা ব্রহ্মা বলেন নি। ভক্তের আনন্দবৃদ্ধিই তাঁর আবির্ভাবের কারণ। ব্রহ্মা এবং শ্রীশুকদেব যে কারণ নির্দেশ করলেন তাতে পাওয়া গেল ভক্তানন্দ বৃদ্ধি।

শ্রীশুকদেব রাসলীলার প্রসঙ্গে ভগবানের আবির্ভাবের কারণ দেখিয়েছেন :

রেমে তয়া চাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাং চৈব দুরাত্মতাম্॥

—ভা. ১০।৩০।৩৫

রাধা আদি ব্রজরামাগণ সকলেই মহাভাবের গণ, কৃষ্ণ হতে দ্বিতীয় নন এবং দ্বিতীয় নন বলেই ভগবানেব আত্মরতভাব টি`কল। তাঁরাও কৃষ্ণই—কৃষ্ণ হলেন বিষয়কৃষ্ণ আর গোপীরা হলেন আশ্রয়কৃষ্ণ। আশ্রয়কৃষ্ণ এবং বিষয়কৃষ্ণ বললে ভাল শোনায় না বলে বলা হয় নি। বিষয়কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান নিজে রসস্বরূপ পরম আস্বাদ্য—পরম চরম মাধুর্যের খনি। রস আজ

নিজেকে আস্বাদন করবার জন্য অন্য আকারে দাঁড়ালেন। কৃষ্ণ আনন্দস্বরূপ, কিন্তু সে আনন্দকে তো কারো ভোগ করা চাই। আনন্দ ভোগের শক্তিই হলেন নিত্য পরিকর। গোপীরূপে আনন্দভোক্তা আস্বাদন করবার জন্য কৃষ্ণই দাঁড়ালেন—এ কথা বলবার জন্য বলা। তা না হলে অনাদিকাল থেকে এ আস্বাদক স্বরূপ হয়েই আছে। শ্রীশুকদেব বলেছেন—'মহারাজ, এ গোপীরা কেউ কৃষ্ণ হতে দ্বিতীয় নন, ভিন্ন নন:

রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ।

—ভা. ১০।৩৩।১৭

শ্রীশুকদেবের 'রেমে তয়া চাত্মরত'—এই বাক্যে বিরুদ্ধবাদীরা ব্যাখ্যা করেন, রাসলীলার কারণ ভগবান গোপীসঙ্গে বিহার করলেন, কামীর দুঃখ ও স্ত্রীজনের দুষ্টতা জগতে দেখবার জন্য। কিন্তু এই যদি রাসলীলার কারণ হয়, তাহলে রাসলীলার ফলশ্রুতি যে শুকদেব বলেছেন:

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ ভা. ১০।৩৩।৪০

রাধা আদি গোপবালাদের সঙ্গে শ্রীগোপীবল্লভের এই রসময়ী লীলাকথা যাঁরা শ্রীগুরুআনুগত্যে শ্রদ্ধাভরে কানে শুনবেন অথবা কীর্তন করবেন, তাঁরা শ্রীগোপীজনবল্লভের পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি লাভ করবেন এবং হৃদয়ের কামনা রোগ অচিরে দূর হবে। কামাদি সন্তাপ তাঁদের আর কখনও সন্তপ্ত করতে পারবে না।

শুকদেবের পূর্ব ও পরবাক্যে তাহলে সামঞ্জস্য থাকে না। এটি ব্যাসকূটের মত শুককূট বলতে পারা যায়। মহাজন ছাড়া এর থেকে উদ্ধারের আর কোন উপায় নেই। এর থেকে আসল যা পাওয়া যায়, তা হল ভগবান শ্রীরাসলীলা করে জগতে প্রেমের লীলা দেখালেন এবং জগতকে বুঝালেন—এই প্রেমের লীলা দেখে বুঝে নাও যে জগতের কাম কত ঘৃণ্য। চিটে গুড়ের আস্বাদ কত ঘৃণ্য বুঝতে পারা যায় যখন টাটকা মধুর আস্বাদ জিভে লাগে। স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দের রাসবিহারের প্রাকৃত উপমা হয় না। কেউ কেউ বলেন—এ রাসবিহার আর কিছু নয়, জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন, জীবাত্মা রাধা এবং পরমাত্মা কৃষ্ণ—এ হল যোগীর কথা, ভাল কথা। যে কোন উপায়ে প্রাকৃত সংসর্গ ত্যাগ—তাও উপমা হয় না। কারণ জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মিলন হল অণু ও বিভুর মিলন। কিন্তু কথা হচ্ছে রাধা তো জীবাত্মা নন :

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি॥

গোপীর সঙ্গে কৃষ্ণমিলনের উপমা হয় না, কারণ রাধাকৃষ্ণ ভিন্ন নন, একই। তা যদি না হত তাহলে এ রাসলীলা মুনিদের বন্দনীয় হত না।

যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণ করেন নিন্দন।
তাঁরাও রামের রাসে করেন স্তবন॥

মনের সুখদুঃখ যেমন মন দিয়েই বুঝা যায় ভগবানও তেমনি নিজেকে বিছিয়ে রমণ করেছেন। যোগীন্দ্র মহারাজ নিমির

যজ্ঞশালায় সকলের সামনে কথা বলছেন, তাই ভগবান কৃষ্ণের আবির্ভাবের গূঢ় কথাটি বলতে পারেন নি। সাধারণ কারণটি মাত্র বলেছেন :

ভূমের্ভারাবতরণায় যদুষ্বজন্মা জাতঃ করিষ্যতি
সুরৈরপি দুষ্করাণি। ভা. ১১।৪।২২

অসুরগণ সত্ত্বগুণের বিরোধী। তাই তারা পৃথিবীর ভার। জগতে এই অসুরের বৃদ্ধিতে অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। উপবাসে সত্ত্ব গুণ বৃদ্ধিপায়। দৈত্যগণ পৃথিবীর ব্যাধি। এই ব্যাধির চিকিৎসার জন্য ভগবান চিকিৎসক আসেন। অসুরবিনাশে রজোগুণ বিনাশ করেন। দৈত্যগণ তো বাইরের—অন্তরের দৈত্য আছে। রাজোগুণ প্রবল হলে মানুষ আমরাই অসুর—এটি ভিতরের। এটিও জগতের ভার। ভগবান বলেছেন :

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
—গীতা :৬।৬

বিষ্ণুভক্ত এবং অসুর—এর মধ্যে অসুর যারা তারা দেখতে মানুষের আকার কিন্তু বৃত্তি অসুরের। মিথ্যাকথা বলা, অসদুপায়ে অর্থ-উপার্জন—অপরাধ পাপ এ সবই অসুরের কাজ। প্রথম দৈত্য হল প্রকাশ্য অসুর, আর এরা হল অপ্রকাশ্য অসুর। শত্রু যারা তাদের চেনা যায়, তাদের কাছ থেকে সাবধান হওয়া যায়, কিন্তু যারা মিত্রবেশী শত্রু তাদের কাছ থেকে সাবধান হওয়া কঠিন। তাই এরা আরও ভয়ানক। বিষ্ণুবৈষ্ণবনিন্দা, প্রবঞ্চনা কপটতা—এ সবই অসুরবৃত্তি। বৈষ্ণবনিন্দুকের ভার পৃথিবী কখনও সহ্য করেন না। কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়ে প্রকাশ্য অসুর বিনাশ

করেছেন। আর তাঁর লীলাকথা শাস্ত্ররূপে জগতে রেখে গেছেন, তার দ্বারা আজও অপ্রকাশ্য অসুর বিনাশ হচ্ছে। তাহলে কৃষ্ণেরই দুটি কাজ। কৃষ্ণের যে কোন কাজ দেবদুষ্কর—প্রথম গণ্ডুষ পূতনাবধ, শেষ গণ্ডুষ কেশীবধ। যে কেশী দৈত্যের হ্রেষায় দেবতাগণ কম্পিত হন তাকে কৃষ্ণ বধ করলেন গলার ভেতর হাত ঢুকিয়ে। পূতনা মায়ের বেশে গোকুলে এসেছে। গোস্বামিপাদগণ ধরেছেন পূতনা রাক্ষসী গোকুলে এল কেমন করে, সচ্চিদানন্দ ভগবদ্ধাম গোকুল, যেখানে শুদ্ধভক্তেরই একমাত্র গতি। মুক্তপুরুষও যেখানে আসতে পারে না, সেখানে 'পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা'—সে এল কেমন করে? গোস্বামিপাদগণ সিদ্ধান্ত করেছেন—লীলাশক্তির অনুমোদনে পূতনা গোকুলে এসেছে। লীলাশক্তি কেন অনুমোদন করলেন? প্রয়োজন হল শ্রীগোবিন্দের মহিমা প্রকাশ। শক্তির কাজ হল শক্তিমানের মহিমা ঘোষণা করা। পূতনা রাক্ষসী সেও যখন মাতৃগতি সদ্‌গতি লাভ করল, কৃষ্ণানন্দ পেল, তখন তাকে দেখে যে কেউ কৃষ্ণপাদপদ্মে আসতে পারে—এতেই ভগবানের মহিমা প্রকাশ পেল। পূতনার পরিবর্তে যদি কোন বৈকুণ্ঠপার্ষদ্‌ আসতেন তাহলে মহিমা প্রকাশ পেত না। কংস পূতনাকে পাঠিয়েছেন, বলে দিয়েছেন—'অসাধারণ বালক দেখলেই খেয়ে ফেলবি, শিশু কৃষ্ণের অসাধারণত্ব আনন্দবৃন্দাবনচম্পু গ্রন্থে শ্রীকবি কর্ণপূর গোস্বামিপাদ বর্ণনা করেছেন—কৃষ্ণতনু এতই কোমল যে মা যশোমতী কোলে নিতে শঙ্কা করেন, নিজে নীচু হয়ে স্তনদুগ্ধ পান করান। পূতনা মায়ের বেশে

সজ্জিত হয়ে এসে কৃষ্ণকে বক্ষে তুলে নিয়ে যশোদা-মা ও রোহিণী -মাকে তিরস্কার করেছেন 'হ্যাঁগা তোরা কেমন মা? সোনার বাছাকে মাটিতে রেখেছিলি?' মায়েদেরও স্বাভাবিক দৈন্যবশে মনে হয়েছে—সত্যিই তো, আমরা গোপালের মা হবার উপযুক্ত নই। এই রমণীই গোপালের মা হবার উপযুক্ত। কৃষ্ণভক্তি যাজন করতে হলে দৈন্য চাই--আর কৃষ্ণের দৈন্য—সে তো অনেক উঁচুতে। পূতনা কালকূট বিষমাখানো স্তনের বোঁটাটি যখন কৃষ্ণবদনে তুলে দিল তখন কৃষ্ণ কিন্তু আপত্তি করেন নি। কৃষ্ণ ভাবছেন লীলাশক্তি গোকুলে পূতনাকে ডেকে আনলেন কিছু তাকে দেবার জন্য, কিন্তু আমি তাকে কেমন করে দিই। আমাকে কিছু না দিলে ত আমি কিছু দিতে পারি না। আমাকে কিছু দিলেই তাকে কিছু দেবার বিধান আছে। পূতনা তো আমাকে বিষ দিয়েছে, এর বদলে তো ওকে কিছু দেওয়া যায় না। ওকে কিছু দিতে গেলে তো ওর কাছ থেকে শুধু বিষ নিলে হবে না। তাই কৃষ্ণ পূতনার পঞ্চপ্রাণ সেই বিষের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছেন, এর বদলে তাকে সদ্‌গতি দিয়েছেন। জগৎ যদি প্রশ্ন করে—হ্যাঁহে কৃষ্ণ, তুমি যে পুতনার বিষদানের বদলে তাকে সদ্‌গতি দিলে—এ তোমার কেমন বিচার হল? তার উত্তরে কৃষ্ণ বলবেন—পূতনা তো শুধু বিষ দেয় নি, তার পঞ্চ-প্রাণ দিয়েছে, পূতনা বুঝতে পেরেছে তার পঞ্চপ্রাণ কৃষ্ণ চুরি করেছেন। তাই 'ছাড় ছাড় ছাড়'—বলে স্তনের বোঁটাটি কৃষ্ণ-বদন থেকে টেনে নিয়ে কোল থেকে তাকে ফেলে দিতে চেয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণ তো আর ছাড়েন না। কৃষ্ণের এমনই স্বাভাব যে

একবার আদর করে যে তাঁকে বুকে তুলে নেয়, সে ছাড়তে চাইলেও কৃষ্ণ তো তাকে ছাড়েন না—এইটিই তো সাধকের ভরসা। আমরা তো প্রতি মুহূর্তে কৃষ্ণচরণ বিস্মৃত হতে চাই, কিন্তু কৃষ্ণ যদি না ভোলেন তবে তো কাজ হবে। কৃষ্ণ যে সব অসুর বধ করেছেন এ সব কাজই দেবতাদের অসাধ্য।

কেশীদৈত্য কৃষ্ণকে কামড়াবে বলে ছুটেছে, ভগবান তাঁর হাতকে তপ্ত লোহার মত করে কেশীর গলার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছেন। কেশী দৈত্য ফেটে গেল। কংসের ১৮০ হাত ধনুর্ভঙ্গ, কুবলয়াপীড় বধ, কালীয়দমন, গিরিগোবর্ধনধারণ, কোনটিই মানুষের কাজ নয়—এরও পরে শ্রীশুকদেব রাসবিহার বলেছেন। দুই দুই গোপবালার মধ্যে শ্যামসুন্দর বিহার করেছেন, আকাশের চাঁদ সগণে বিস্মিত হয়ে অস্ত যেতে ভুলে গেছেন। গোবিন্দ মনে মনে গোপবালাদের সঙ্গে রমণের ইচ্ছা করলেন। এই মনের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে কাজ হওয়া উচিত ছিল, তা কিন্তু হয় নি। অনেক পরে বাঁশী বাজিয়ে গোপবালাদের আকর্ষণ করেছেন, নিকুঞ্জের দ্বারে শ্যামনাগর দাঁড়িয়েছেন, মনে মনে ইচ্ছা করলেন, সব ঠিক-ঠাক হল, অনেক পরে বাঁশী বাজালেন। ভগবানের ইচ্ছামাত্রে কাজ তার আবার আয়োজন কি আছে? বাধা কিসের? শ্রীগোবিন্দসর্বস্ব শ্রী-বৃন্দাবনসর্বস্ব শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ এই ব্যবধানের কারণ নির্দেশ করেছেন। গোপবালারা পরোঢ়া রমণী। গোবিন্দ বংশীনিনাদের আগে ভাবছেন পরকীয়া রস আস্বাদন করা চলে কি না। একমাত্র শ্রীগোবিন্দ ছাড়া অন্য কোন ভগবান পর্যন্ত পরকীয়া

রস আস্বাদন করতে পারেন না, তাতে দোষ হয়। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থে বলা আছে ঃ

নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া
তদ্‌গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ
আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং
কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ ॥

শৃঙ্গাররসে পরোঢ়া রমণী অঙ্গীভূত হয় নি, কিন্তু গোকুলসুন্দরী বাদ দিয়ে পরকীয়া রসভোগের ফলে যে লঘুত্ব তা অন্য নায়ক সম্বন্ধে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে নয়। শ্রীউজ্জ্বল কৃষ্ণ আবির্ভাবের কারণ বলেছেন—'রসনির্যাসস্বাঙ্গার্থাবতারিণী'—রস নির্যাস আস্বাদনের জন্য। তত্ত্বকথায় এইটিই দাঁড়াল, কৃষ্ণের ওপরে আর কেউ নেই। জগতে যা কিছু আছেন সবই তিনি। একই টাকা যেমন ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় ভোগের বস্তুতে পরিণত হয়, তেমনি এক গোবিন্দ, যিনি ভোগের বস্তু, তিনি ধাম পরিকর রূপে আপনাকে বিস্তৃত করে রেখেছেন। তাই রসিকতার জন্যই এই পরকীয়া রসের সৃষ্টি। তা না হলে গোপবালারা তো তত্ত্বত কৃষ্ণ হতে অভিন্ন, পরকীয়া তাই অতি গূঢ় রসের কথা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বলা হয়েছে, গোপবালারা কৃষ্ণের নিত্যকান্তা, রসের নির্যাস আস্বাদনের জন্য লীলাশক্তি তাদেরই পরকীয়া করলেন। তাৎপর্য একমাত্র কৃষ্ণসুখ। কৃষ্ণ গোপীর জন্য ব্যাকুল, আবার গোপী কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল, বস্তুত তারা কিন্তু অভিন্ন। অগ্নি যদি তার দাহিকাশক্তিকে, চন্দ্র যদি তার জ্যোৎস্নাকে অন্বেষণ করে, তা

যেমন অসম্ভব, কৃষ্ণও গোপী অন্বেষণ করছেন বা গোপী কৃষ্ণ অন্বেষণ করছেন এও অসম্ভব। উভয় উভয়কে খুঁজছেন—এ এক লীলার বিচিত্র পরিপাটি। এমন অপূর্বতা আর কখনও দেখা যায় নি। তত্ত্বের ওপরে রসের স্থান, তত্ত্ব বুঝে তাকে ভুলে রসভোগ করতে হবে। তত্ত্ব মনে থাকলে ব্যাঘাত (বাধা) সম্ভব হবে না অথচ রসলীলার তরঙ্গ বাধা না পেলে উঠবে না, বরং তত্ত্বের বোধে লীলার তরঙ্গ স্তিমিত হয়ে যাবে। তত্ত্ব বাহন, রস বাহ্য। যেমন ঘোড়া বাহন দামী কিন্তু মানুষ যে তার পিঠে চড়ে তার দাম ঘোড়ার চেয়েও বেশী। তাই তত্ত্বের চেয়ে রসের দাম বেশী। লীলারসের কাছে তত্ত্বের খাতির নেই। সখ্যরসে ব্রজসখা শ্রীদাম তত্ত্ব কৃষ্ণের কাঁধে চড়ে অপরাধ করে নি, কারণ কোন দণ্ড সে পায় নি।

রাসস্থলীতে মনে মনে রমণ ইচ্ছার অনেক পরে ভগবান বংশীনিনাদ করেছেন। ভগবান বংশীনিনাদ পরে করলেন কেন? ভাবছেন—পরকীয়া রস আমার আস্বাদন করা চলবে কি না। পরকীয়া রসের গুরু হলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু। মহাপ্রভু বলেছেন —'শুক সে আমার তত্ত্ব জানেন সকল'। শ্রীচৈতন্যমনোবৃত্তি হল শুদ্ধ পরকীয়া রস। কৃষ্ণ চিন্তা করছেন পরকীয়া রস আস্বাদন করা ঠিক হবে কি না, ধর্মবিগর্হিত কাজ করতে যাচ্ছি। কৃষ্ণের যখন এই প্রকার চিন্তা, তখন কৃষ্ণকে তত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখলে চলবে না। লীলারস আস্বাদন এখন—এ সময়ে তত্ত্ব ভুলতে হবে। কৃষ্ণের এই চিন্তা হওয়ায় বাঁশী বাজাতে সাহস হচ্ছে না। পরকীয়া রস আস্বাদনে ধর্ম, বেদ, দেবতা, সমাজ সব লঙ্ঘন করতে

হবে। কিশোর বয়স কৃষ্ণের, কত আর বুদ্ধি, লোকনিন্দা হবে—জগৎ কি বলবে? ভরসা পাচ্ছেন না। গোবিন্দ যখন এইভাবে চিন্তাগ্রস্ত সে সময় গোবিন্দভাবনা দেখে আকাশে চাঁদ উঠলেন। চন্দ্র পূর্বদিগ্‌বধূর শ্রীমুখ নিজকরের (কিরণের) দ্বারা মার্জন করে যেন কৃষ্ণকে বুঝাচ্ছেন—'ওগো কৃষ্ণ, আমি তোমার পূর্বপুরুষ, অতিবৃদ্ধ দ্বিজরাজ—আমিও এ বয়সে ইন্দ্রপত্নী পূর্বদিগ্‌বধূর রসাস্বাদনে লুব্ধ, পরকীয়া রস আস্বাদন করছি। আর তুমি আমার বংশধর, তাতে বয়সে নবীন, আর তুমি ব্রাহ্মণ নও—গোপজাতি; তোমার পরকীয়া রস আস্বাদনে ভাবনা কি? তুমি সানন্দে পরকীয়া রস আস্বাদন কর। আমি তোমার সাক্ষী রইলাম। তখন ভগবান আশ্বস্ত হয়ে ভরসা পেয়ে বংশী নিনাদ করলেন ঃ

জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্। ভা. ১০।২৯।৩

তাহলে দেখা যাচ্ছে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের কাজ দেবতাদের পক্ষে শুধু দুষ্কর নয়, অন্য দেবতাদের তো বটেই, এমন কি শিব বিরিঞ্চিরও আরাধ্য।

কৃষ্ণ ভগবান যে যে লীলা করেছেন সবই দেবতাদের অসাধ্য। কংসবধ করতে কৃষ্ণ পারতেন না—কংস সম্বন্ধে মামা—তাই বধ করলে পাছে দোষ পড়ে কৃষ্ণ সেজন্য কোন অস্ত্র দিয়ে কংসকে বধ করেন নি। কুবলয়াপীড় হস্তী বধের পরে কংস ভয়ে আধমরা হয়ে যান, কংস জেনেছেন মৃত্যু তাঁর অত্যন্ত নিকট। তারপর যখন মল্লেরা পরাজিত হল তখন কংস আর ভরসা পান নি। কংসকে ধাক্কা দিয়ে সিংহাসন থেকে মাটিতে

ফেলে দিয়ে বিশ্বম্ভর মূর্তিতে ভগবান তার ওপর গড়িয়ে পড়লেন, বিশ্বম্ভরের চাপে কংস বিগতপ্রাণ হলেন। কংসবধের সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ আঠার বার মথুরা আক্রমণ করেছে, জরাসন্ধের দ্বারা প্রেরিত কালযবন কৃষ্ণের পিছনে তাড়া করেছে, কৃষ্ণ ভয়ে পালাচ্ছেন—এও লীলার পরিপাটি। যাঁর একাংশের দ্বারা সমস্ত জগৎ ধৃত হয়ে থাকে তাঁর আবার ভয় কি? তাঁর ভয় তো দূরের কথা, তাঁর দাসেরই ভয় থাকে না, ত্রেতাযুগের রাজা মুচুকুন্দকে ভক্তি লাভ করান—এ সব কাজ দেবতাদের পক্ষেও দুষ্কর।

প্রভুর দাসের কত ক্ষমতা দেখা যায় শ্রীহনুমানজীব চরিত্রে। মাতা অঞ্জনাকে যখন হনুমানজী প্রভু রাম-চন্দ্রকে দর্শন করান তখন রামচন্দ্রের অঙ্গে ক্ষত দেখে অঞ্জনা বলেন—'হনুমান! তুমি নিজের অঙ্গে বাণ ধারণ করে প্রভুকে রক্ষা কর নি কেন? তুমি সাগরের ওপরে নিজেকে বিছিয়ে দিয়ে প্রভুর সেতুবন্ধনের ক্লেশ নিবারণ কর নি কেন?' প্রভুর দাসের যদি এত সামর্থ্য হয়, তাহলে প্রভুর কা কথা? মথুরাতে কৃষ্ণ যুদ্ধ করেছেন। বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণ তো শুধু-হাতে গেছেন। জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধের সময় বৈকুণ্ঠ থেকে রথ, ঘোড়া, অস্ত্র এল। কৃষ্ণ সমুদ্রমধ্যে দ্বারকাপুরী নির্মাণ করলেন, স্বর্গ হতে সুধর্মাসভা পারিজাত পুষ্প নিয়ে এলেন—এ সবই দেবদুষ্কর। দ্বারকার অতুলনীয় বৈভব, দেবরাজ ইন্দ্র সেখানে কৃষ্ণদর্শনলালসায় দৌবারিককে উৎকোচ দান করেন।

শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাবের কারণগুলি শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামিপাদ দেখিয়েছেন :

আত্মারামান্ মধুরচরিতৈর্ভক্তিযোগে বিধাস্যন্
নানালীলারসরচনয়া নন্দয়িষ্যন্ স্বভক্তান্
দৈত্যানীকৈর্ভুবমতিভরাং বীতভারাং করিষ্যন্
মূর্ত্যানন্দো ব্রজপতিগেহে জাতবৎ প্রাদুরাসীৎ॥

আত্মারাম মুনিদের প্রতি ভক্তিযোগ দানের জন্য নিজ ভক্তগণের আনন্দবিধানের জন্য এবং দৈত্যভারে আক্রান্তা পৃথিবীকে ভারমুক্ত করবার জন্য মূর্তিমান আনন্দপ্রতিমা শ্রীকৃষ্ণভগবান ব্রজরাজ নন্দমহারাজের গৃহে জাত হলেন।

ভক্তের সুখবিধান কর'ল ভগবান নিজে সুখী হন। আবার ভক্ত সুখ পায় যদি ভগবান সুখ পান। এর মধ্যেই প্রেমদান লীলা আছে। এ প্রেমদান দেবতাদের সাধ্য নয়, প্রেমদান তো দূরের কথা, কৈবল্য মুক্তি পর্যন্ত দেবতারা দিতে পারেন না। এই মুক্তি দেবার ভার মাত্র দুজনের ওপর কৃষ্ণ দিয়েছেন—শিব ও শিবানী। এঁরা ভক্তিও দেন। কারণ তাঁরা নিজেরা নিত্যমুক্ত এবং পরমভক্ত। তাই মুক্তি এবং ভক্তি দুই-ই দিতে পারেন। মাঝপথে ভক্তি বা মুক্তি তাঁরা চুরি করবেন না--তাই বিশ্বাস করে কৃষ্ণ তাঁদের ওপর দেবার ভার দিয়েছেন।

প্রেমদানের জন্য চারটি উপায় কৃষ্ণ গ্রহণ করেছেন—প্রেমমাধুর্য, রূপমাধুর্য, লীলামাধুর্য এবং বেণুমাধুর্য। এই চারটি গুণ গোবিন্দের নিজস্ব। গোবিন্দ জীবকে আকর্ষণ করবার

জন্য তাঁর প্রেমমাধুরী, রূপমাধুরী, লীলামাধুরী ও বেণুমাধুরী সাজিয়ে রেখেছেন; যেমন গয়না কাপড় পরে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। গোবিন্দ দেখে ভালবাসতে ইচ্ছা করে না, বেদবিধি লঙ্ঘন করে না, এমন ধৈর্যবান কে আছে? প্রেমদান কথাটির মানে কি? প্রেম মানে কৃষ্ণকে ভালবাসতে ইচ্ছা—এরই উপায়রূপে কৃষ্ণ চারটি নিয়েছেন—প্রেমমাধুর্য, লীলা-মাধুর্য, বেণুমাধুর্য ও রূপমাধুর্য—এই চারটি মাধুর্যই সাগরের মত। এই বেণুমাধুর্য সাগরের একটি কণা যদি শ্রীগুরুবৈষ্ণবকৃপা বায়ুর দ্বারা তাড়িত হয়ে কানে প্রবেশ করে তাহলে অপ্রকাশ্য অসুর বিনাশ হয়ে যাবে, অপ্রকাশ্য অসুর হল কৃষ্ণবিমুখ জীব। তাদের বিনাশ মানে প্রাণে বিনাশ নয়, কৃষ্ণপদে চিত্ত উন্মুখ হলেই অপ্রকাশ্য অসুর বিনাশ হল। প্রাকৃত ভোগসুখ জল থেকে সাধুগুরুবৈষ্ণব সিঁড়ি দিয়ে উঠে কৃষ্ণপাদপদ্ম ডাঙ্গায় যদি উঠা যায়, তবে অসুর বিনাশ হবে। কৃষ্ণ-অবতার সম্বন্ধে যত চিন্তা করা যাবে ততই কথা আছে। এ কথা অফুরন্ত।

অহিংসা নীতি প্রচার করেছেন বুদ্ধ। যজ্ঞ করবার যারা অধিকারী নয় তাদের প্রতি যজ্ঞ নিষেধ করেছেন। কলির শেষে কল্কি আবির্ভূত হয়ে বিনাশ করবেন। শ্রীদ্বাদশে উক্তি আছে ঃ

যদা চন্দ্রশ্চ সূর্যশ্চ তথা তিষ্যবৃহস্পতী
একরাশৌ সমেষ্যন্তি তদা ভবতি তৎ কৃতম্॥ ভা. ১২।২।২৪

যে সময়ে পুষ্যা নক্ষত্রের সঙ্গে একযোগে চন্দ্র, সূর্য ও বৃহস্পতি একরাশিতে সমাগত হবেন তখনই সত্যযুগ আরম্ভ হবে।

শ্রীদ্বিতীয়েও বলা আছে :

যর্হ্যালয়েষ্বপি সতাং ন হরেঃ কথাঃ স্যুঃ
পাষণ্ডিনো দ্বিজজনা বৃষলা নৃদেবাঃ
স্বাহা স্বধা বষড়িতি স্ম গিরো ন যত্র
শাস্তা ভবিষ্যতি কলের্ভগবান্ যুগান্তে॥

ভা. ২।৭।৩৮

কলিযুগের অন্তে যখন সাধুর আলয়েও হরিকথা থাকবে না, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিন বর্ণ পাষণ্ডী হবে, শূদ্র রাজার আসনে বসবে, আর স্বাহা স্বধা বষট্ ইত্যাদি বাক্যের লোপ হবে, তখন তিনি কলির শাসনকর্তা হবেন।

সপ্তম যোগীন্দ্র শ্রীদ্রুমিল অবতারবাদকথা সমাপ্ত করছেন :

এবংবিধানি কর্মাণি জন্মানি চ জগৎপতেঃ
ভূরীণি ভূরিযশসো বর্ণিতানি মহাভুজ॥ ভা. ১১।৪।২৩

এইভাবে জগৎপতি শ্রীগোবিন্দ জন্মাদি লীলা থেকে আরম্ভ করে বিবিধ লীলা প্রকাশ করে তাঁর অতুলন যশোরাশি বিস্তার করেছেন।

অষ্টম প্রশ্ন

মহারাজ নিমির অষ্টম প্রশ্ন—অভক্তের অর্থাৎ যারা ভগবৎপাদ-পদ্ম ভজনা করে না তাদের গতি কি ?

ভগবন্তং হরিং প্রায়ো ন ভজন্ত্যাত্মবিত্তমাঃ

তেষামশান্তকামানাং কা নিষ্ঠাবিজিতাত্মনাম্॥ ভা. ১১।৫।১

মহারাজ নিমি যোগীন্দ্রকে আত্মবিত্তমা বলে সম্বোধন করেছেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে যারা বুঝতে পারে তারা আত্মবিৎ। শুধু জীবাত্মাকে বুঝা যায় না, যে কোন আলো মিশিয়ে নিতে হবে। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান যে কোন তত্ত্ব জানবার জন্য যে আলো নেওয়া হবে তার দ্বারাই জীবাত্মার জ্ঞান হবে, জীবাত্মাকে জানাবার জন্য আর পৃথক আলো জ্বালতে হবে না। গীতাগ্রন্থে এইজন্যই জীবাত্মার স্বরূপ নিরূপণ করা হয়েছে। জীবাত্মার উপদেশের জন্য বলা হয় নি। পরমাত্মাকে পাবার অধিকারী একমাত্র জীবাত্মা, আর চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—তারা অজা অর্থাৎ প্রকৃতির গণ, তাই তারা পরমাত্মার অনুসন্ধান করতে পারবে না। পরমাত্মজ্ঞান যাদের হয়েছে তারা আত্মবিদ্; ভগবজ্‌জ্ঞানী ব্যক্তি হল আত্মবিত্তম। আর কৃষ্ণজ্ঞান যাদের হয়েছে তারা আত্মবিত্তর। এখানে ভগবান এবং হরি দুজনকেই বিশেষ্য অথবা ভগবানকে বিশেষণ এবং হরিকে বিশেষ্য হিসাবে ধরা যায়। ভগবান হরিকে যারা ভজে না তাদের ফলশ্রুতি বলেছেন নিমিরাজ—তারা হল অশান্তকামা এবং অবিজিতাত্মা। বাসনা-বায়ুতে তাড়িত হয়ে জীবের বুদ্ধিরূপ নৌকা অবিরত জন্মমৃত্যুর

তটে আঘাত খাচ্ছে। শ্রীগোবিন্দপাদপদ্মরূপ স্থির জায়গায় নোঙর করতে হবে, তবে কামনার নিবৃত্তি ও বুদ্ধি সুস্থিতা হবে। একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্ম ছাড়া অন্য কোন সুখধাম শাশ্বত আনন্দ আর কিছু নেই। ভগবানের সৃষ্টির এমনই কৌশল যে খাদ্যের চেয়ে ক্ষুধা বেশী করে দেওয়া হয়েছে, এ গোবিন্দের ইচ্ছায়, এইটিই গোবিন্দের সকলের চেয়ে বড় করুণা। জাগতিক খাদ্যে ক্ষুধা তৃপ্তি না হওয়ায় ক্ষুধার তাড়নায় জীব কোনদিন তাঁকে ভজবে, এই আশায় করুণা করে ক্ষুধা বেশী দিয়ে জীবকে ছেড়েছেন। তাই তো জীব গোবিন্দ ভজে। জগতে এমন কোন খাদ্য নেই যাতে ক্ষুধা মেটে। গোবিন্দপাদপদ্মই একমাত্র সুখধাম। তাই শ্রুতি বললেন ঃ

ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

হরি ভজলে কামনার নিবৃত্তি হয়। গোবিন্দের রূপ সম্বন্ধে বলা আছে :

যে রূপের এক কণ
ডুবায় সব ত্রিভুবন
নরনারী করে আকর্ষণ।

শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী প্রিয়সখী শ্রীললিতাজীকে বলছেন— 'আমার সই, কৃষ্ণ দর্শন হল না'। রাধারাণীর কৃষ্ণপ্রেমের নাগাল যূথেশ্বরী ললিতাজীও পান না। তাই তো রাইএর চরণে ললিতাজী দাসী হয়ে আছেন। 'চরণনখরে নয়নযুগল পড়লে সেখানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে যায়। সেখান থেকে আর উঠতে চায় না। এমনি করে কৃষ্ণদর্শন আমার হয়ে ওঠে না।' এইটিই

তাঁর উক্তির তাৎপর্য। শ্রীজীবপাদ বলেছেন নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধের ভোগের তারতম্য আছে। সাধনসিদ্ধ গোবিন্দমাধুর্যের অণু ভোগ করে, কারণ তার তৃষ্ণা ঐটুকুই, ওর বেশী সে নিতে পারে না। তাই ওর বেশী সে পায় না বলে তার আক্ষেপও নেই। কিন্তু নিত্যসিদ্ধের নিজের ভোগের তৃষ্ণা এত বেশী যে সে তৃষ্ণায় গোবিন্দমাধুরী বেশী করে ধরতে পারে। দুই-ই গোবিন্দ—যাঁকে আস্বাদন করা যায় তিনি বিষয়-গোবিন্দ আর যিনি আস্বাদন করেন তিনি আশ্রয়-গোবিন্দ অর্থাৎ রাধা। তাই মহাজন বললেন :

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি॥

তত্ত্বে রাধা এবং কৃষ্ণ সমান, লীলায় রাধা কৃষ্ণ অপেক্ষা কিছু বেশী। দুটি পুকুর সমান কাটলে তবে একটির জল অপরটিতে ঢেলে রাখা যায়। তেমনি মাধুর্যের সাগর কৃষ্ণের যতখানি, রাধারাণীর ততখানি, তাই কৃষ্ণমাধুর্যসাগর একমাত্রসাগর রাধারাণীই সম্পূর্ণ আস্বাদন করতে পারেন। লীলাতে রাধারাণীর কিছু বেশী অধিকার। যে কৃষ্ণচরণে শিববিরিঞ্চি পর্যন্ত লুণ্ঠিত হন, তাঁর চূড়া লীলায় রাধারাণীর চরণে নখ-রঞ্জনীর মত লুণ্ঠিত। সাধনসিদ্ধ যখন বিন্দু ভোগ করে নিত্যসিদ্ধ সাগর ভোগ করে, গোবিন্দমাধুর্যের পঙ্গতে এই অসমবিচার কেন? শ্রীগোবিন্দলীলামৃতগ্রন্থে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বিচার করেছেন—সাধনসিদ্ধ যে যৎকিঞ্চিৎ পাচ্ছে, তার সে বোধ থাকবে না, সে যা পেয়েছে তাতেই পূর্ণ :

যার যেই ভাব সেই সর্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তর তম॥

তা যদি না হত, তাহলে দাস সখা হতে চাইত, সখা মাতাপিতা হতে চাইত, মাতাপিতা কান্তা হতে চাইত, কারণ পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা পর পর রসের উৎকর্ষ বেশী। পূর্ব পূর্বের আক্ষেপ হয় না, কারণ যার যা আছে তাই নিয়ে সে এমন পূর্ণ যে তার অপর পাতায় তাকাবার অবসর নেই। নিত্যসিদ্ধের ভোগ বেশী সত্য, কিন্তু সাধনসিদ্ধ যে যৎকিঞ্চিৎ পেয়েছে—এই বোধ তার থাকে না। সে যা পেয়েছে তার কাছে তাই অফুরন্ত সাগর। বিচারে দেখা যায় জীবের যৎকিঞ্চিৎ আধার, তাই তার চেয়ে বেশী সে নিতে পারে না। গোবিন্দ অনন্ত, রাধা এই আদি ও অনন্ত গোবিন্দের চেয়ে কিছু বড়। কারণ সে অনন্তকে থাকবার জায়গা দেয়।

জীবের বুদ্ধি অশান্ত; কারণ কৃষ্ণে যতক্ষণ বুদ্ধি না পৌঁছায় ততক্ষণ বুদ্ধি অশান্ত। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। আমার শ্রীগুরু মহারাজ শ্রীল শ্রীপাদ রামদাসবাবাজী মহারাজের শ্রীমুখের বাণী—শান্ত কে? 'ছোটাছুটি যার বন্ধ হয়েছে সেই শান্ত' আর কিছু চাই না বলতে পারলেই শান্তি। একমাত্র কৃষ্ণ-ভক্তেরই কামনা নিবৃত্তি হয়।

সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তচেতসাম্।
কুতস্তৎ ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চধাবতাম্॥

কৃষ্ণভক্তি ছাড়া অন্যত্র সর্বত্র কেবল চাইবার তাগদা, কৃষ্ণভক্তিই

একমাত্র কিছু চাইতে দেয় না, চাওয়া বন্ধ না হলে ইন্দ্রিয় জয়ও হয় না, অন্তঃকরণকে বাঁধা যায় না। মন জয় হলে তবে বাইরের ইন্দ্রিয় সংযত হবে। দাগা বুলালে যেমন শিশু লিখতে শেখে। মন এমনই চঞ্চল সে আমাকে পাত্তা দেয় না, হরিপাদপদ্ম না ভজলে মন সংযত হয় না। শ্রুতিস্তুতিতে বলা আছে ঃ

> বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
> য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
> ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
> বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ ॥ ভা. ১০।৮৭।৩৩

মন অশ্বকে বাঁধবার জন্য পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ক্ষুধা পিপাসা জয় করেছে—এর চেয়ে ভাল লাগাম আর হয় না; কিন্তু তাতেও মন জয় হয় নি। মন অতি চঞ্চল। প্রশ্ন হতে পারে—এতেও মন জয় হচ্ছে না কেন? অকৃতকর্ণধার বণিকের সকল চেষ্টা যেমন বিফল হয়, তেমনি শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপ কর্ণধারের আশ্রয়ে কৃষ্ণ-ভজন ব্যতিরেকে মন কিছুতেই শান্ত হয় না।

ইন্দ্রিয় জয়ের উপায় মহাজন বলেছেন ঃ

> হৃষীকেশে হৃষীকানি যস্য স্থৈর্যং গতানি হি।
> স এব ধৈর্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে ॥

জীবের হৃদয়ের কামনার তাপ কৃষ্ণপাদপদ্মের নখমণির সুস্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে প্রশমিত হয়। কৃষ্ণপাদপদ্মসেবীর সব রকম তিরস্কার ভূষণ হয়। কৃষ্ণপাদপদ্ম সব রক্ষা করে। মায়ের কোলে থাকলে শিশুর যেমন আর কোথাও থেকে কোন ভয় থাকে না তেমনি

কৃষ্ণপাদপদ্মকে মায়ের মত আশ্রয় করতে হবে। তাহলে আর কোন বিপদ থাকবে না। কামনার অগ্নিতাপ নিবে গেলে শীতল হওয়া যায়, তখনই প্রকৃত জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায়। গোস্বামিপাদগণ ব্রহ্মচর্যের লক্ষণ করেছেন—ব্রহ্ম পরব্রহ্ম পরমেশ্বর, তার চর্যা সেবা, গোবিন্দপাদপদ্মসেবাই ব্রহ্মচর্যা। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ— যোগ যত সংখ্যায় কষ্ঠি টেনে দেওয়া হয়, তেমনি সব জায়গায় সম্বন্ধ এক জায়গায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে কষ্ঠি টেনে দিতে হবে। তারই নাম আসল যোগ। শ্রীহরিভজনে যার মন মজেছে তারই ইন্দ্রিয় জয় হয়েছে। এ ছাড়া ইন্দ্রিয় জয়ের আর কোনও উপায় নেই।

মহারাজ নিমির অষ্টম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন শ্রীচমস যোগীন্দ্র চমস শব্দে পাত্র বুঝায়, কুপাত্রের গতি কি রকম হবে এটি সুপাত্রই একমাত্র বলতে সমর্থ। সেই জন্যই অভক্তের গতি এ প্রশ্নের উত্তর চমস যোগীন্দ্র দিচ্ছেন। যোগীন্দ্র বললেন- নিজের জনক গুরুরূপী ভগবানকে অনাদর করায় তাদের দুর্গতিই লাভ হবে। ভগবান যে যে কোন মানুষের অবশ্য ভজনীয়, এটি যুক্তি দিয়ে বলছেন—ভগবানের মুখ, বাহু, উরু এবং চরণ হতে ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার আশ্রমের সঙ্গে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ অনুসারে পৃথক পৃথক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণ উৎপন্ন হয়েছে। এর মধ্যে সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, সত্ত্বরজোগুণে ক্ষত্রিয়, রজঃ এবং তমোগুণে বৈশ্য এবং তমোগুণে শূদ্রবর্ণের উৎপত্তি। ভগবানের জঘনদেশে গৃহস্থাশ্রম, হৃদয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বক্ষস্থলে বানপ্রস্থাশ্রম এবং

মস্তকে সন্ন্যাস আশ্রমের স্থান। সুতরাং চারিবর্ণের এবং চারটি আশ্রমের সকলেরই উৎপত্তিস্থান ভগবান স্বয়ম্। এদের মধ্যে যারা ভগবানকে ভজনা করে না, তাদের দুটি ভাগ : (১) তারা জানে না বলে ভজনা করে না, (২) ভগবান যে ভজনীয় এটি জেনেও অবজ্ঞা করে। এদের মধ্যে প্রথম জন কৃপার যোগ্য, আর দ্বিতীয় জন উপেক্ষার যোগ্য। এই দুই ব্যক্তিই নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম হতে ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়।

যে সব স্ত্রী এবং শূদ্র জাতির পক্ষে হরিকথা বা হরিকীর্তন সুদূরবর্তী, অর্থাৎ বধির, যাদের কানে হরিকথা প্রবেশ করে না, যারা সাধুসঙ্গরূপ সৌভাগ্য লাভ করতে পারে না, তারা অনুকম্পার পাত্র, অর্থাৎ ভক্ত তাঁদের মস্তকে চরণধূলি দান করে কৃতার্থ করবেন।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—এই তিন বর্ণ যাদের বেদাদিশাস্ত্রে অধিকার আছে, তারা অনেকসময় হরিপাদপদ্মের নিকটে গিয়েও হরি ভজে না—ফিরে আসে। প্রশ্ন হতে পারে—তা কখনও সম্ভব? পিপাসার্ত হয়ে জলাশয়ে গিয়ে কেউ কি জলপান না করে ফিরে আসে? হ্যাঁ, এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হরিপাদপদ্মের নিকটে গিয়েও হরি না ভজে ফিরে আসে। এদের বড়ই দুর্ভাগ্য, এদের অবস্থা হল '—উষিত্বা জাহ্নবীতীরে কূপং বাঞ্ছন্তি দুর্ভাগাঃ'। পিপাসা থাকলেও যারা ফিরে আসে তারা তো দুর্ভগা বটেই, আর পিপাসা না থাকলে যারা ফিরে আসে তারা আরও দুর্ভাগা। কৃষ্ণপাদপদ্মস্পর্শে সকল তাপ দূর হয়—মনের দ্বারাও যদি সে পাদপদ্ম স্পর্শ করা যায়, তাহলে সকল সম্পদ

লাভ হয়। এ জগতে, ও জগতে সর্বত্র মায়ার তাপ। দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য যতই চেষ্টা করা যাক না কেন, দুঃখ একটাও কমছে না—একটি দুঃখের দ্বারা আর একটি দুঃখ নিবৃত্তি করা হচ্ছে মাত্র, যেমন এক জায়গায় মাটি কেটে অন্য জায়গায় গর্ত বোঁজান হচ্ছে, কিন্তু গর্ত বন্ধ হচ্ছে না। দুঃখ নিবৃত্তি করার দরকার বুঝতে হবে। দিন অচল আমাদের হয় না, তাই বুঝা হয় নি। অন্নজল না হলে যেমন দিন অচল হয়ে যায়, হরিকথা ছাড়া দিন তো তেমন অচল হয় না। ভিখারী যখন দরজায় চিৎকার করে যায় 'দিন গেল মিছে কাজে/রাত্রি গেল নিদ্রে' তখন সে কথা আমাদের শুনতে হবে। ধনের মত্ততায় আমরা সে কথা শুনি না। সাধুগুরুবৈষ্ণব তেমনি ভিখারীর মত চীৎকার করছেন, শাস্ত্র বারে বারে ঘোষণা করছেন। শাস্ত্রকারের করুণার গরজ —আমরা মনে করি তাঁদের গরজ—কিন্তু দুঃখ তাঁদের ঘুচবে না, দুঃখ ঘুচবে আমাদের। ছেলে রাগ করে খায় না, মা খাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন, ছেলে মনে করে মায়ের গরজ। খেলে বুঝি মায়ের পেট ভরবে, কিন্তু মায়ের পেট ভরে না, ছেলেরই পেট ভরে। শাস্ত্রকার আমাদের দুঃখকে নিজের দুংখ মনে করে বলেছেন। জগতে যত দুঃখ তার প্রতিকার একটাই—হরিপাদপদ্মভজন। এ ছাড়া অন্য কোন প্রতিকার নেই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—শ্রৌতজন্ম, শাস্ত্রাধিকার হলে হরিভজনের অধিকার। হরিপাদপদ্ম নিকটে যাওয়া মানে মনুষ্য দেহ লাভ করা। কারণ চুরাশী লক্ষ দেহের কোনটা দিয়েই হরিভজন হয় না, একমাত্র মনুষ্যদেহই হরিভজনের উপযোগী। আর হরিপাদপদ্ম স্পর্শ মানে হাত

দিয়ে ছোঁওয়া। এখানে হরিপাদপদ্মস্পর্শের অনেকগুলি হাত আছে, যে কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে স্পর্শ করা। কান দিয়ে শোনা, জিহ্বা দিয়ে উচ্চারণ করা, চোখ দিয়ে দেখা, নাসিকা দিয়ে আঘ্রাণ করা, হাত দিয়ে স্পর্শ করা প্রভৃতি। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যারা হরিপাদপদ্ম স্পর্শ করতে পারে, তারাও আম্নায়-বাদী হয়ে পড়ে, অর্থাৎ বেদের ফলশ্রুতি তাদের মুগ্ধ করে। স্বর্গের যে সুখ তা আকাশকুসুমবৎ। আকাশকুসুমে যেমন কারো লোভ হয় না, বস্তু সত্তা নেই বলে, তেমনি স্বর্গসুখেও স্পৃহা হওয়া উচিত নয়। শ্রীল সরস্বতীপাদ বলেছেন—গৌর করুণা কটাক্ষ যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের কাছে স্বর্গাদি সুখভোগ আকাশকুসুমের মত শূন্য বলে, মনে হয়। বেদের ফলশ্রুতি জ্ঞানীদের চিত্তকেও লুব্ধ করে। বলবানেরও ইন্দ্রিয়গ্রাম বিষয়ে লুব্ধ হয়। এইটিকে লক্ষ্য করেই শ্রীচণ্ডী বলেছেন ঃ

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥

মায়াধীশের কটাক্ষ যে লাভ করেছে মায়ার বৈভব তাকে লুব্ধ করতে পারে না। মৃত্যু যে আমাদের একেবারে হয় তা নয়, তিলে তিলে মৃত্যু হয়। গীতাবাক্যে বলা আছে ঃ

সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে। গীতা ২।৩৪

এ অকীর্তিটি কি? মায়ার আসক্তিই হল অকীর্তি। চোর যেমন চুরি করাকে দোষ মনে করে না, আমরাও তেমনি মায়ার আসক্তিকে অপরাধ অকীর্তি বলে মনে করি না। প্রাকৃত রসে

রুচির নামই মৃত্যু—এই মৃত্যুর চর হল আমাদের ইন্দ্রিয়। যার ওপর ভগবৎ করুণা হয়েছে তার কাছে ইন্দ্রিয় কালসর্পের বিষ-দাঁত ভাঙা হয়ে গিয়েছে। গৌরকরুণা হল ওঝা। কিন্তু এই বিষদাঁতভাঙা সাপ দেখে কেউ যদি বনের সাপ ধরতে যায়, তাহলে ভুল করবে। বিশ্ব তখন সুখের হবে—মধুময়ের সঙ্গ করলে জগৎকে মধু দেখা যায়। হরিপাদপদ্ম নিকটে গিয়েও হরিভজন করল না, অর্থাৎ মনুষ্যদেহ পেয়েও হরি না শুনে, হরি না বলে বেদের ফলশ্রুতিতে লুব্ধ হল। গীতাতেও বেদের এই ফলশ্রুতিকে লক্ষ্য করে ভগবান বলেছেন ঃ

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥ গীতা ২।৪২

বেদ যা বলতে চায় তা আমাদের শোনা হয় না। আমরা যদি মনে করি আমরা তো যাগযজ্ঞ করি না, তাহলে এ দলে নই। তা মনে করলে হবে না। যাগযজ্ঞ না করলেও বেদের ফলশ্রুতিতে আমাদের লোভ আছে, আর যাগযজ্ঞের যে মর্যাদা আমরা দিই, হরিনামের মর্যাদা সেরকম দিই না। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেছেন যেখানে হরিনাম হচ্ছে, তার ষোল ক্রোশ দূরে থাকলেও সেই নামের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ করতে হবে। ফলশ্রুতির মোহেই আমরা হরি ভজি না। বেদ ফলশ্রুতি দেখায়,কিন্তু গোবিন্দ ফলশ্রুতি দেখান না। একরাত্রে শ্মশানসিদ্ধ হওয়া যায় কিন্তু তাতে ফল নেই। তার চেয়ে শিশুর মত মায়ের কাছে শরণাগতি নিলে বেশী কাজ হবে। অন্য দেবতার উপাসনায় সিদ্ধিলাভ তাড়াতাড়ি হয়, আবার তাড়াতাড়ি

চলেও যায়। ভগবান বলেছেন: ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা। কর্মজাত সিদ্ধি তাড়াতাড়ি লাভ হবে আবার তাড়াতাড়ি যাবে। অন্য উপাসনায় শান্তি হবে না। ভগবান বলেছেন শেষ পর্যন্ত আমার দরজাতেই আসতে হবে। আমার পাদপদ্ম-উপাসনায় পরিশ্রম কম। ফল হয়ত দেরীতে ফলবে, কিন্তু সে ফল শাশ্বত। এখন প্রশ্ন হতে পারে অন্য দেবতার উপাসনায় ফল যদি শাশ্বত নয়—তাহলে গোবিন্দপাদপদ্ম ছেড়ে মানুষ্য অন্যত্র যায় কেন? যারা তাড়াতাড়ি ফল চায় তারাই অন্যত্র যায়। অন্যত্র যে সুখ সব ঐহিক—গৌরগোবিন্দই একমাত্র পরমার্থদাতা। এই বেদের ফলভোগী যারা তারা বলে এই ফল ছাড়া অন্য কিছু নেই। ভক্তিমার্গকে দৃঢ় করবার জন্য যোগীন্দ্র বলেছেন—তারা জানে না, এমন কর্ম আছে যা বন্ধন ঘটায় না, বরং বন্ধন মোচন করে। এরা নৈষ্কর্মের খবর জানে না। তারা যখন জানে না তখন বুঝা গেল তারা অজ্ঞ। অজ্ঞ যদি তারা জিজ্ঞাসা করে না কেন? তারা স্তব্ধ, অর্থাৎ অনম্র, অবিনীত। তাই নতি স্বীকার করে জিজ্ঞাসা করতে পারে না, আবার তারা মূর্খ অথচ পণ্ডিতম্মন্য। কিছু জানে না, কিন্তু নিজেদের পণ্ডিত বলে মনে করে। বেদের মধুময় বাক্যে তারা লুব্ধ হয়। 'অতঃ অপাম সোমমমৃতা অভূম অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি যত্র নোষ্ণং ন শীতং স্যান্ন গ্লানির্নাপ্যরাতয়ঃ'—ইত্যাদি বেদের শ্রুতিসুখকর বচন—সোমরস পান করে আমরা অমৃতত্ব লাভ করব—চাতুর্মাস্য যাজী ব্যক্তি পুণ্য অর্জন করে অক্ষয় স্বর্গসুখ লাভ করবে, যে

স্বর্গে উষ্ণতা অথবা শীত যাতনা দেয় না, শত্রুপক্ষ কোন বিনাশ সাধন করতে পারে না। উপরন্তু 'অপ্সরাদের সঙ্গে বিহার করব' এইরকম সুখের সংবাদও লাভ করে। মানুষ বাক্য দিয়ে অহোরাত্র কত কথাই বলে কিন্তু সেই বাক্য হরিতে দিয়ে দিলেই হরিপাদপদ্মস্পর্শ করা হল। একটা হাতে স্পর্শের উপায় দিলে মানুষের ভুল হতে পারে। তাই ভগবান পরম করুণা করে অনেকগুলি হাত দিয়েছেন, যে কোন হাত দিয়ে স্পর্শ করলেই হল। মানুষ এত সম্পর্ক করছে, কিন্তু যা ভাববার জন্য জগতে আসা তাই ভাবা হল না। মহাজন বলেছেন :

যা ভাবিলে ভাব নাই তাই ভেবে কাট আই
ভাবিলে যে পাও তা না কর।

হরিপাদপদ্ম ভজনীয় এটি জেনেও যারা ভজে না, তার উপেক্ষার পাত্র। মহাজন প্রেমানন্দদাসজী বলেছেন :

কহ লক্ষ আন কথা তাহে না আলিস জ্ঞান
কি ভার কি বোঝা কৃষ্ণনাম।

আমরা এই দলে—এই দলের লোকদের ভাগবত উপেক্ষা করেছেন।

যারা ফলশ্রুতির লোভে বেদের কর্মে প্রবৃত্ত তাদের সঙ্কল্প ঘোর, অর্থাৎ অভিচারাদি কর্মে প্রবৃত্ত হয়। রজোগুণের বশবর্তী হয়ে তারা দাম্ভিক হয়। দর্প, অভিমান, অহঙ্কার তাদের নিত্য-সঙ্গী। যত দম্ভ অভিমান বাড়ে ততই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়। ততই দুর্গতি। তারা অহিমন্যব অর্থাৎ সাপের মত ক্রোধ-পরায়ণ। হেতু অহেতু নেই—ক্রোধযুক্ত। এগুলি সবই পরমার্থের

বিরোধী বস্তু। তাদের আত্মসুখে অভিনিবেশ অর্থাৎ কর্মে অভিনিবেশ। এরা বেদবাদ অবলম্বন করেও নিজের সুখেরই চেষ্টা করে। এদের পাপ বলা হয়েছে। এরা মূর্তিমান পাপ। এরা অচ্যুতপ্রিয়, অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তকে উপহাস করে। ভক্তি মহারাণীর আসন দীনতায়। প্রাকৃত সম্পদে যদি বাক্স বোঝাই থাকে তাহলে ভক্তি ঢুকবে কোথায়? শ্যামনবঘনের করুণাজল দীনতার গর্তে জমা হবে। বৈষ্ণবগণইঅচ্যুতপ্রিয়—এ ছাড়া আর যারা তারা প্রিয়ও নয়, অপ্রিয়ও নয়। ভগবান বলেছেন:

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। গীতা ৯।২৯

গোবিন্দ এক মুখে দুই কথা বলেছেন—সকলের প্রতি আমি সমান, আবার ভক্ত আমার প্রিয়—এ কথাও বললেন। তাঁকে যারা ভজে না, তারা যদি তাঁর অপ্রিয় হত তাহলে গোবিন্দকে নিন্দা করা যেত। তা কিন্তু ভগবান বলেন নি। তারা তাঁর প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই নয়। রাস্তার লোক যেমন আমাদের প্রিয় বা অপ্রিয় কিছু নয়, অর্থাৎ মমতা থাকে না। ভগবানেরও তেমনি,যারা তাঁকে ভজে না,তাদের প্রতি তাঁর মমতা থাকে না। সমোঽহং বলাতে এখানে উদাসীনতা বুঝাচ্ছে। সূর্যের মত, পর্জন্যের মত। আবার ভক্তের প্রতি পক্ষপাতিত্বে বললেন:

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥

—গীতা ১২।১৯

ভক্ত অনিকেত অর্থাৎ গৃহহীন। গৌরগোবিন্দ খুঁজবার জন্য ঘর ছেড়েছে। এ জগতে নশ্বরদেহ পুত্র হারিয়ে গেলে তাকে

খুঁজবার জন্য যদি ঘর ছাড়তে পারা যায়, তাহলে পরমপ্রিয় গৌরগোবিন্দ হারিয়ে গেলে তাঁদের খুঁজতে ঘর ছাড়া যাবে না কেন? ভক্ত স্থিরমতি—ইষ্টে নিষ্ঠাসম্পন্ন। ভুক্তি-মুক্তি দিয়ে সে নিষ্ঠা ভাঙান যায় না। কৃষ্ণকে ভালবাসলে তিনিও ভালবাসেন, এটি কৃষ্ণের গুণ। যারা ভজে না তাদের ভালবাসলে ভক্তরাই রাগ করবে। ভক্ততুষ্টির জন্যই ভগবানের এই বৈষম্য। যার ভিতরে কৃষ্ণভক্তির আবির্ভাব হয়েছে বিজ্ঞ সাধুগুরুবৈষ্ণব জন দেখলে বুঝতে পারেন। এই ভক্তি যখন পরিপাক দশায় আসে, তখন সাত্ত্বিক বিকার দেখা যায়। তখন সে চিহ্ন আরও স্পষ্ট হয়। অচ্যুতপ্রিয়কে নিন্দা করে কেন? নিন্দা করা স্বভাব যাদের তারা বিনা কারণেই নিন্দা করে। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেছেন—কৃষ্ণ বড় চতুর, এ জগতে কিছু দেবেন না, যদি কেউ মনে করে কৃষ্ণ ভজে প্রাসাদ তৈরী করব, কৃষ্ণ তা দেন না—কৃষ্ণ যদি খুব বেশী দেন তো চোখের জল দেবেন। এ জগতে কিছু দেবেন না—যা দেবেন ঘরে নিয়ে গিয়ে দেবেন। বৈষ্ণবমহিমা অন্বয়মুখে বুঝা যায় না, বৈষ্ণবনিন্দায় ব্যতিরেকমুখে বুঝা যায়। কৃষ্ণভক্ত নিজমহিমা প্রচার করতে চায় না, করে না—তাতে সম্পদ অপহরণ হয়ে যায়। কৃপণের ধনরক্ষার মত অতি গোপনে কৃষ্ণভক্তি সম্পদকে ভক্ত রক্ষা করে। কৃপণ যেমন বাইরে অতি দীনহীন বেশে থাকে, ধন আছে বলে কাউকে জানতে দেয় না, ভক্তও তেমনি নিজেকে আবরণে রাখে, কাউকে জানতে দেয় না। কৃষ্ণভক্তের এ স্বভাব কৃষ্ণই তৈরী করে দেন। যত ভক্তি বাড়বে তত নিজেকে পতিত অভিমান হবে। আর ততই পতিতপাবনের

কৃপা হবে। কৃষ্ণ নিজে ভক্তের দৈন্য পোষণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের দৈন্য রক্ষা করেছেন। ভক্তের কাছে যাতে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা না আসে, সে সম্বন্ধে সাবধান হন। আর যদি বা আসে তাহলে যাতে তার উন্মত্ততা না আসে তার ব্যবস্থা করেন। কৃষ্ণ ইচ্ছা করলে ভক্তকে প্রাকৃত সম্পদে ভূষিত করতে পারেন।

কৃষ্ণ যদি মনে করে ব্রহ্মপদ দিতে পারে
হেন কৃষ্ণ ছাড় কি কারণে

দিতে পারেন, কিন্তু দেন না। কৃষ্ণ বৈষ্ণবকে দারিদ্র্যের মধ্যেই রাখেন। সম্পদ দেন না, দিলে অন্য লোকে তার ঐশ্বর্য দেখে ভাববে কৃষ্ণভজন করলে তো তাহলে প্রচুর সম্পদ পাওয়া যায়—এই মনে করে সকলেই হরিভজন করবে। তাহলে 'হরিভক্তি সুদুর্লভা'—এই বাক্য আর রক্ষা হয় না। আর ভগবানও বলেছেন : যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ। যাকে আমি অনুগ্রহ করি তার ধনসম্পদ্ ধীরে ধীরে হরণ করি। মহাজন বলেছেন :

কৃষ্ণকৃপার হয় এক স্বাভাবিক ধর্ম।
রাজ্য ছাড়ি করায় তারে ভিক্ষুকের কর্ম॥

আমরা যদি কৃষ্ণকৃপার প্রার্থী হতাম তাহলে শাস্ত্রবাক্য শুনতাম। কৃপার যে প্রার্থী হবে, সে অন্য কোন বস্তু প্রার্থনা করবে না। চাতক যেমন মেঘের জলই প্রার্থনা করে, তাই সে সব ছেড়ে মেঘের দিকেই চেয়ে থাকে। আমরা যদি কৃষ্ণকৃপা চাই, তাহলে সব ছেড়ে চাতকের বৃত্তিই অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু আমরা

তো তা করি না। আমাদের কৃষ্ণভজন হল—এ জগতের যে সব সম্পদ আমাদের আছে সব থাক, এর একটিও ছাড়ব না। এর ওপরে যদি কৃষ্ণকৃপা আসে তো আসুক, আপত্তি নেই। আমরা অত বোকা নই যে আগে সব ছেড়ে দেব। তারপর যদি কৃপা না আসে তখন? তাই সব আঁকড়ে ধরে আছি। ভজন ভাঙিয়ে খেতে নেই। হীরে ভাঙিয়ে যে বিচুলি কেনে সে অতি মূর্খ।

অন্য সকল কাজে অবসর মেলে ভগবৎপ্রসঙ্গে অবসর মেলে না, রুচি হয় না। ভগবৎপ্রসঙ্গ যাদের ভাল লাগে, তাদের জোরাল ভাগ্য কিন্তু কথা হল যদি ভাল না লাগে, তাহলে ওষুধের মত পান করতে হবে। মুক্তিকামী মাত্রই হরি ভজবে। কারণ বলা আছে 'মুক্তিমিচ্ছেৎ জনার্দনাৎ'। প্রভাত হলে পাখীরা বাসা ছাড়ে—

ডাকে পাখী না ছাড়ে বাসা।
খনা বলে সেই সে উষা॥

উষাকালে দিক যখন খুব পরিষ্কার হয় নি, একটু একটু অন্ধকার আছে, তখন পাছে পথ ভুল হয় এজন্য পাখী বাসা ছাড়ে না, কিন্তু যখন দেখে বেশ প্রভাত হয়েছে, তখন বাসা ছাড়ে। কৃষ্ণ কথারসিকের অবস্থাও এই বিহঙ্গের মত। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় যখন জীবনের পূর্বদিক ফরসা হয়, তখন সেও 'হা গৌর, হা গোবিন্দ' বলে বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গকে পুরুষার্থ বলা হয়। আসলে পুরুষার্থ বলতে মুক্তিকেই বুঝায়। তবে ধর্ম অর্থ কাম—এই তিনটিকে

যে পুরুষার্থ বলা হয়, সেটি শাস্ত্রকার জল মিশিয়ে বলেছেন—জীবকে ধর্মকাজে প্রবৃত্ত করাবার জন্য। তা না হলে জীবের প্রবৃত্তিই হত না। তারপর কর্মমার্গে অগ্রসর হতে হতে যত জ্বালার অনুভব হবে ততই পরিষ্কার বুঝতে পারবে ধর্ম, অর্থ, কাম—কোনটিই আসলে পুরুষার্থ নয়। একমাত্র মোক্ষ বা মুক্তিই পুরুষার্থ। অন্য যে কোন সাধনে ক্লেশ অধিক, অথচ ফল যা হবে তা অশাশ্বত। ভগবান বলেছেন :

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।

দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥ গীতা ৭।২৩

তবে জীবের প্রবৃত্তি এসব সাধনে হয় কেন? জীব কামনার তাড়নায় তাড়াতাড়ি ফল পেতে চায়, অন্য সাধন ফল তাড়াতাড়ি দেয়—তাই জীবের তাতে সহজে প্রবৃত্তি হয় কিন্তু ভগবানের আরাধনার ফল বিলম্বে ফলে। কিন্তু সে ফলে প্রবঞ্চনা নেই,—সে ফল শাশ্বত ফল।

যোগীন্দ্র এখানে কর্মবাদীর নিন্দা করছেন। পূর্বে বলা হয়েছে, যারা কর্মবাদী তারা কামুক ও দাম্ভিক হয়ে কৃষ্ণভক্তকে উপহাস করে। এখানে কামুকতা ও দাম্ভিকতা পৃথক করে প্রমাণ করা হচ্ছে। তারা গৃহে বসে পরস্পর বলাবলি করে—যারা মৈথুন্য এবং স্ত্রী-উপাসক, তারা অতিথিপরায়ণ হয় না। তারা গৃহে বসে পরস্পর মনের আশা বলে—এর দ্বারা কামুকতা প্রকাশ পাচ্ছে, তাদের দাম্ভিকতা প্রকাশ পাচ্ছে। তারা অন্নদান এবং দক্ষিণা না দিয়ে যজ্ঞ করে, আর মাংস খাবে বলে পশু বধ করে। তারা অতদ্বিদ, অর্থাৎ হিংসা করলে কি দোষ

হয়, তা তারা জানে না—যে দেহের জীবিকার জন্য পশু হিংসা সে দেহটি কার তা আগে বিচার করা দরকার। এ দেহের ওপরে অনেকের দাবী। পিতা, মাতা, মাতামহ, অন্নদাতা, শৃগাল, কুক্কুর, অগ্নি সকলে দাবী করে—এ দেহ আমার। সুতরাং দেহটি এজমাল সম্পত্তি—এজমাল সম্পত্তির খাজনা দিয়ে যেমন লাভ নেই, তেমনি এ দেহরক্ষার জন্য আমরা যে পশুবধ করি এও ঠিক নয়। শুধু যে সাধারণ দেহের জন্য খাজনা দিচ্ছি তা নয়—পাপাচরণ করে খাজনা দিচ্ছি, অর্থাৎ দেনা করে খাজনা দিচ্ছি। প্রকৃতি থেকে আমাদের উৎপত্তি আবার প্রকৃতিতে লয়। ঘট, সরা, হাঁড়ি, কলসী—তার খাঁটি স্বরূপ যেমন মাটি—মাঝখানে কিছুক্ষণের জন্য যেমন নাম রূপ থাকে—এ দেহেরও ঐ একই অবস্থা। আগেও প্রকৃতিতে ছিল পরেও প্রকৃতিতে মিলবে—মাঝখানে কিছু দিনের জন্য নাম রূপ। দেহের আদি এবং অন্ত্য অব্যক্ত—মাঝখানটি ব্যক্ত। জীবিকার জন্য পশুবধ বলা হল কেন? কারণ যজ্ঞের জন্য পশু হিংসার প্রয়োজন নেই। বেদশাস্ত্রে আছে—'যজ্ঞে পশুমালভেত' কিন্তু আচার্য বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রকে নিগম কল্পতরুর গলিত ফল বলেছেন। তাতে বুঝা যাচ্ছে ফলের আশায় যেমন বৃক্ষের যত্ন করা হয়, তেমনি ভাগবত-ফলের আশায় বেদকল্পতরুর পূজা করতে হবে। আমরা তো বুঝি না বেদ এবং শ্রীমদ্ভাগবত সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে অনুশীলন করলে তা বুঝা যাবে। বেদব্যাস নিজে বলেছেন—বেদ অপেক্ষা ভাগবতের প্রাধান্য বেশী কাজেই আমরা যদি বলি তাতে দোষ কোথায়? বেদব্যাসকে না মানলে মহদবজ্ঞা, আর

ভাগবত না মানলে নামাপরাধ—কোন দিকেই এড়াবার উপায় নেই। যোগীন্দ্র বললেন—যজ্ঞে পশুবধের প্রয়োজন নেই, আলভন অর্থে বধ নয়—কিঞ্চিৎ অঙ্গচ্ছেদ, কিন্তু হিংসা, অর্থাৎ প্রাণে বধ করা বুঝাচ্ছে না। যার জন্য পশুবধ হবে তাকেও পাতক লাগবে। পাপ ছাড়া জীব বাঁচতে পারে না। তাহলে শাকপাতা, ফলমূল যে জীবিকার জন্য গ্রহণ করা হয়, তাতেও তো প্রাণিবধ হচ্ছে. কারণ জীবই জীবের জীবন। দেহরক্ষার জন্য প্রাণিবধ করতেই হবে—কিন্তু অস্ফুটচৈতন্য শাক-পাতা-ফল-মূল—তাদের বধ অপেক্ষা স্ফুটচৈতন্য পশু-পাখীবধে পাপ বেশী। যে প্রাণীতে চেতনা যত বেশী, তার আঘাতের অনুভব তত বেশী। আর আঘাতের অনুভব যত বেশী, পাতক তত বেশী—যে প্রাণী যত ব্যথা পাচ্ছে. তত বেশী পাপ হবে। এ জগতেও দেখা যায় যার জ্ঞানবুদ্ধি যত বেশী, তাকে আঘাত করলে দণ্ডও তত বেশী হয়। যে সব পশুকে এখানে হত্যা করা হয়, তারা সেই হত্যাকারীর মৃত্যুর পর শূলে দাঁড়িয়ে আছে—হত্যাকারীকে প্রত্যেকে আঘাত করবে—মাংস শব্দের সেই অর্থ—মাং আমাকে স অর্থাৎ সে আঘাত করবে। এই অর্থটি যদি বুঝা থাকে, তাহলে আত্মকল্যাণে আর কেউ আঘাত করে না—বুঝবার ভুলেই জীব অহিত করে। তাদের হৃদয় দাম্ভিকতায় পূর্ণ, তাই তাদের আরও দুর্গতি। যোগীন্দ্র বললেন—খল জাতস্ময় ব্যক্তি হরিপ্রিয়, অর্থাৎ ভক্তকে অবমাননা করে। সম্পদ ঐশ্বর্য এগুলি তাদের বুদ্ধিকে অন্ধ করে দিয়েছে অর্থাৎ তাদের আর বিবেচনা করতে দেয় না। শ্রী, বিদ্যা, ঐশ্বর্য—এরা তাদের বুদ্ধিকে আঘাত

করেছে—তাই হরিকে এবং হরির প্রিয়জনকে তারা অবজ্ঞা করে। ঈশ্বর-অবজ্ঞা অপরাধ—গর্ব থেকে অপরাধের জন্ম। যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞেশ্বরকেও যজ্ঞের অঙ্গ বলে ধরে নেয়, যজ্ঞেশ্বরকে যজ্ঞের উপকরণ হতে আলাদা করে ভাবতে পারে না—তাতে বিষ্ণু-অপরাধ হয়; বিষ্ণু-বৈষ্ণব দুই অপরাধে বিনাশ হয়। বিষ্ণু-অপরাধের তবু স্খালন আছে, কিন্তু বৈষ্ণব-অপরাধের স্খালন নেই। অপরাধের কি ফল তখনই হয়ত বুঝা যায় না, কিন্তু ভবিষ্যতে জানা যাবে। অজ্ঞজনের অপবাধ বৈষ্ণব গ্রহণ করেন না বটে, কিন্তু কৃষ্ণ তা সহ্য করেন না। বৈষ্ণবচূড়ামণি শিবকে নিন্দা করার ফলে দক্ষপ্রজাপতিকে দণ্ড পেতে হয়েছিল। সতী মা দেবী দাক্ষায়ণী পিতাকে বলেছেন—নিন্দাতে মহান ব্যক্তি কষ্ট না হলেও নিন্দুক পার পায় না। তাঁর চরণের ধূলিকণা কুপিত হয়ে দণ্ড দেবে। মহদ্বিনিন্দুকের তেজ হৃত হওয়াই তাব পক্ষে শোভা। তিনি ক্ষমা কবলেও উপরওয়ালা কৃষ্ণ ছাড়েন না। তাই যথাসম্ভব সাবধান হতে হবে, যাতে অপরাধ না হয়—অপরাধ না হলেই ভাল। যদি মনে করা যায় ভগবানের নাম করলে অপরাধ ক্ষালন হবে। তা হবে না—হবিনামে বৈষ্ণব-অপরাধ ক্ষালন হবে না—বৈষ্ণব-অপবাধ যে আমাদের আছে সেটি স্বীকার্য। কারণ চিত্ত যদি নিবপরাধ হয় তাহলে তার স্বভাব হল—একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণে প্রেমোদয় হবে। তা যখন হয় না তখন—

তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর।
কৃষ্ণ নাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥

বৈষ্ণব-অপরাধ ছাড়া সংসার হয় না। সৌভরি মুনির গরুড়ের প্রতি (বৈষ্ণবের) অপরাধের ফলে সংসার হল। এতদিন তপস্যা অটুট ছিল। এখন তপস্যা ভাঙিয়ে পঞ্চাশ কন্যাকে বিবাহ করে সংসার করলেন, ব্রহ্মানন্দ ছেড়ে মনকে সংসারের পচা আনন্দে ডুবিয়ে দিলেন, এটি বৈষ্ণব-অপরাধের ফল। অপূর্ব দেহেন্দ্রিয়-সংযোগের নামই সংসার। সনাতন প্রভু লীলাস্মরণে হাস্য করেছেন—তাতে খঞ্জ কৃষ্ণদাসের মনে ব্যথা লেগেছে—ভেবেছেন বুঝি তাঁর বিকৃত অঙ্গ দেখে গোঁসাই হেসেছেন—সনাতনের তাতে বৈষ্ণব-অপরাধ ঘটে গেল। ফলে লীলাস্মরণ বন্ধ হয়ে গেল। সনাতন প্রভু আবার অনেক চেষ্টা করে সে অপরাধ ক্ষালন করলেন। মনে মনে ভাবলেন হাস্য, রোদন—এ সব লোকালয়ে করা উচিত নয়। অজ্ঞাত অপরাধ নাম করলে ক্ষালন হয়, কিন্তু জ্ঞাত অপরাধ নামের দ্বারা ক্ষালন হয় না। আমাদের এই অপরাধের মাত্রা তো নিরন্তর বাড়ছে। কর্মবাদীরা তো বৈষ্ণবনিন্দা করেই। এখনকার যুগে একজন হরির প্রিয়, অপর হরিপ্রিয়জনকে নিন্দা করে। বৈষ্ণব-অপরাধ হলেই হৃদয়ে তাপ পেতে হবে। এই তাপই মূর্তিমান হয়ে সুদর্শন চক্র রূপে দুর্বাসা ঋষিকে আক্রমণ করেছিল। আমরা সুদর্শন চক্র দেখতে পাই না বটে কিন্তু তাপ সমানই ভোগ করি। এই বৈষ্ণব-অপরাধের ক্ষমা স্বয়ং ভগবানের কাছেও মেলে না। তাই বৈকুণ্ঠ-নাথ স্বয়ং দুর্বাসাকে বললেন—'ক্ষমাপয় মহাভাগম্'—যার কাছে অপরাধ তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। বেদের তাৎপর্য হরিকথাতে হলেও যারা কর্মবাদী তারা কিন্তু সে তাৎপর্য

বুঝতে পারে না। তাই তারা বিষ্ণু-বৈষ্ণব নিন্দা করে অপরাধী হয়।

বেদের তত্ত্ব পরিস্ফুট থাকলেও তারা জানে না, কারণ তারা ঈশ্বর উপাসনা করে না। তারা বেদবাদী কিন্তু বেদের হার্দ্য বুঝতে পারে না—বেদের বাক্য ব্রহ্মা মণীষা দ্বারা তিনবার পর্যা-লোচনা করে শেষ পর্যন্ত বুঝলেন সব বেদবাক্যের তাৎপর্য এক মাত্র 'রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ'। ভগবানে রতি লাভ। উদ্ধবজীর কাছে ভগবান বলেছেন বেদ আমাকেই খণ্ডন করে আবার আমাকেই স্থাপন করেছে। জগতে সকল বস্তুই আমি—'মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে'। জগতকে আদর করতে বলা হয়েছে কিন্তু অভ্যাস করতে বলা হয় নি। জগৎ যখন ভগবানেরই রূপ তখন জগৎ ত্যাজ্য কেন ? জগতেব যাবতীয় বস্তু তিনি, কিন্তু সকল বস্তু ও সাক্ষাৎ ভগবানে তফাৎ আছে। কারণ শ্রুতি সকলকে খণ্ডন করে সাক্ষাৎ ভগবানকে স্থাপন করেছে। ঘট পেলে মাটিকে হাতে পাওয়া যায়, কিন্তু শুধু মাটিতে ঘট হয় না। ঘট হতে গেলে একজন চেতন কুম্ভকারের দরকার। ঘট পেলে মাটি হাতে পাওয়া যায়, কিন্তু কুম্ভকারকে হাতে পাওয়া যায় না—তেমনি জগতের উপাদানও মাটির মত প্রকৃতি বা বহিরঙ্গাশক্তি। এই প্রকৃতি বা বহিরঙ্গাশক্তি ত্যাজ্য, কিন্তু কুম্ভকারের মত চেতন অন্তরঙ্গা শক্তি ত্যাজ্য নয়—বোধ্য। যেমন চরণ এবং কান দুইটি অঙ্গ—চরণ ছোঁওয়া যায় কান কিন্তু ছোঁওয়া যায় না—তেমনি বহিরঙ্গা শক্তি ভগবানের শক্তি হলেও তাকে স্পর্শ করা উচিত নয়, অন্তরঙ্গা শক্তিকেই ছোঁওয়া উচিত। জীবের বুদ্ধি কর্মফলে

আসক্ত, তাই সৎকথা গ্রহণ করতে পারে না। চিত্তকে স্থির রাখতে হবে—মনে বিষয়তৃষ্ণা থাকলে সে সদুপদেশ গ্রহণ করতে পারে না, সে তখন বিষয়গ্রহণেই ব্যস্ত থাকে। কর্মবাদীর বেদের নানাবিধ ফলে তৃষ্ণা থাকে, তাই বেদের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারে না। ঈশ্বরকে পেতে হলে তাকে অন্য কোথাও খুঁজতে যেতে হবে না—সকল জীবের মধ্যে তিনি অবস্থিত। খুঁজতে হলে দেরী হবে, তাই তিনি করুণা করে নিজের মধ্যেই বসে আছেন। কোনও সময় থাকেন, কোনও সময় থাকেন না —তা নয়, সর্বদা থাকেন। তাহলে তো দোষ আসে—আমাদের দেহের যে দোষ, দুষ্টভাব আছে, তাতে লিপ্ত হয়ে যাবে। না, তা হয় না—যেমন প্রকৃতির কোন গুণ আকাশে লিপ্ত হয় না, আকাশ ব্যাপ্ত হয়েও যেমন নির্লিপ্ত ভগবানও তেমনি। গন্ধ বাতাসে লাগে, কিন্তু আকাশে লাগে না। ভগবান অসঙ্গ, অভীষ্ট—অভি উপসর্গের দ্বারা অতি উত্তম রূপে ইষ্ট বুঝান হল। আত্মীয় অপেক্ষা দেহ প্রিয়, দেহ অপেক্ষা আত্মা প্রিয়, আত্মা অপেক্ষা পরমাত্মা প্রিয়। আত্মার জন্য দেহ ত্যাগ করা যায়, পরমাত্মাই প্রাপ্তব্য সুখ—অন্নের চেয়ে যেমন পরমান্ন বেশি সুস্বাদু। আমরা চাইছি সুখ, কিন্তু পরমাত্মা কোথায় আছেন তা জানা নেই। যদি প্রশ্ন হয় কেন প্রতি প্রাণীতে তো পরমাত্মা আছেন, কিন্তু পরমাত্মা শুধু আছেন বললে তো হবে না, তাকে জানতে হবে। শ্রুতি বললেন :

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

—শ্বে. উপনিষদ্

এ জানার উপায় ভিন্ন। মন্থন করতে জানলে যেমন দুধ থেকে নবনীত তোলা যায়—এই মন্থনই হল সাধন। হাত ধরলে দেহ পাওয়া যায় কিন্তু মন পাওয়া যায় না। কারণ মন হাতের চেয়ে সূক্ষ্ম, তার বল বেশী, তাই তাকে ধরা যায় না। পরমাত্মা মনের চেয়ে আরও সূক্ষ্ম, তাই তাকে পেতে হলে ভিন্ন উপায়। যাকে পেতে চাই সেই হল আরাধ্য। কেমন করে পাওয়া যাবে—এর নামই সাধন। যাকে পেতে চাই তাকে নির্ণয় করে রাখতে হবে—অন্ন জল পাওয়ার জন্য যেমন চেষ্টা দরকার তেমনি গোবিন্দকে আরাধ্য জানতে পারলে, গোবিন্দ-পিপাসা জাগলে, নির্ণয় হলে, জানতে বাসনা হবে। উপায় হল ভজন—এই ভজন জেনে নিতে হবে। ভজন পরে করলেও চলবে, কিন্তু গৌরগোবিন্দ যে ভজনীয় এটি আগে জেনে নিতে হবে। আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করি বটে, কিন্তু পিপাসা জাগে নি। ভজন করতে দেরী হয় না—ভজনীয় আগে বুঝে নিতে হবে। জল প্রয়োজন এটি জানার দরকার। কণ্ঠে পিপাসা তীব্র। এই রকম তীব্র পিপাসা গোবিন্দে জাগাতে হবে। তৃষ্ণাই নিষ্ঠা—তৃষ্ণার জল না পেলে যেমন বাঁচা যায় না, তেমনি কৃষ্ণ না পেলে বাঁচা যায় না—এমন অবস্থা করতে হবে। আমাদের যা সাধন—ও কিছু নয়—এমন অবস্থা হবে, যে চোখের জল শুকাবে না। তৃষ্ণা যদি নির্ণয় হয়ে যায় তাহলে চেষ্টা আপনিই হবে। সবাই চাইছে পরমাত্মাকে কিন্তু ভুল জায়গায় হাত দিচ্ছে। আর অন্ধকারে যদি খোঁজা যায় তাহলে আরও বিপদ। শুধু দংশনের জ্বালাই সহ্য করতে হয়। জগতের কোন বস্তুতেই আমাদের প্রকৃত শাশ্বত আনন্দ

হয় না। তা যদি হত, তাহলে তা ছেড়ে অন্যত্র আমাদের চেষ্টা যেত না। তাই বুঝা যায় আনন্দ পাওয়া হয় নি, যা পাওয়া গেছে তা আনন্দের কল্পনা মাত্র। যে অবস্থা চলে গেছে তাকেই আমরা সুখ বলে মনে করি, বর্তমানকে সুখ বলে ভাবতে পারি না। ভগবৎসম্পর্ক না হলে সুখ হয় না। জগতের সব সুখ শুধু শিল্পীর রং আর কাগজ—এতে বস্তু বলে কিছু নেই। এ জগৎ হল গোবিন্দের মাধুরীর ছবি। জীবের সুখ বলে যে বস্তুটি হারিয়ে গেছে, যেখানে হারিয়েছে সেইখানে হাত দিলে পাবে। চুরাশী লক্ষ যোনি ঘুরছে, কিন্তু এ সুখের সন্ধান মেলে নি। বিস্মৃত কণ্ঠমণির মত কেউ যদি দেখিয়ে দেয়, তাহলে পাবে। এই দেখিয়ে দেওয়ার লোক শ্রীগুরুদেব। জীব সুখবস্তুটি হারিয়েছে এক জায়গায়, কিন্তু খুঁজছে অন্যত্র। মহাজন বলেছেন:

শ্রীকৃষ্ণভজনমৃতে ন সুখং কদাপি।

'কৃষ্ণকৃপা বিনা কভু সুখ নাহি হয়'—সারথির হাতে যেমন ঘোড়া চালাবার জন্য চাবুক থাকে, তেমনি ঈশ্বরের হাতে দণ্ড আছে। হরি না ভজলে তিনি দণ্ড দেন, তাই তিনি নিয়ন্তা। সকল বেদ তাঁরই গান করেছেন। ভগবানও বলেছেন:

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্।

—গীতা ১৫।১৫

ঘট বললে যেমন মাটি বাদ দিয়ে নয়, তেমনি গোবিন্দকে বাদ দিয়ে কোন দেবতা নন। যেখানেই পা ফেলা যাক, মাটির যেমন ব্যভিচার হয় না, তেমনি কোন দেবতাই স্বতন্ত্র নন।

সব বেদ ভগবানকেই বলছেন, কেউ সাক্ষাৎ বলেন আবার কেউ বা পরম্পরায় বলেন। যারা অবুধ অর্থাৎ আসলে পণ্ডিত নয়, কিন্তু পণ্ডিত নামধারী নিজেদের পণ্ডিত বলে মনে করে তারা নিজেদের কামনার কথায় এত ভরপূর থাকে যে, বেদের এই আসল তাৎপর্য তাদের কানে পৌঁছায় না। বেদ যে পরমেশ্বরকে বলছেন তা কানে শোনে না। নিজেদের সাংসারিক কথা দিয়ে সাধুর হরিকথাকে তারা চেপে রাখে। সাধু হরিকথা বলতে আরম্ভ করলেও তার কথাকে চেপে দিয়ে নিজেদের মনোরথানুকূল কথা বলে।

এ জগতের সুখভোগের প্রকার ব্যবায়, আমিষ ভোজন এবং সুরাপান জীবের নিত্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এর জন্যে কোনও বিধি অর্থাৎ শাস্ত্রের বিধান নেই। নিমিরাজের পক্ষ থেকে শ্রীধরস্বামিপাদ প্রশ্ন করেছেন,—'ননু ব্যবয়াদীনামপি ঋতৌ ভার্যামুপেয়াৎ হুতশেষং ভক্ষয়েৎ ইত্যাদিনা বিহিতত্বাৎ কিমেবং নিন্দতে,—ব্যবায় প্রভৃতির বিধান তো রয়েছে, তাহলে যোগীন্দ্র একে নিন্দা করলেন কেন? কোন বস্তু নিন্দনীয় বিচার করলে পাওয়া যাবে। যে বস্তুর জন্য হরিকথা বাধা পড়ে, তাই নিন্দা। হরি-সম্পর্ক থেকে দূরে নিয়ে গেলে গুণও দোষ হয়। আর হরি-সম্পর্ক ঘটালে দোষও গুণে পরিণত হয়। ভগবানের বাক্য আছে: মন্নিমিত্তে কৃতং পাপং ধর্মায় কল্পতে। আমার জন্য পাপ করলেও সেটি ধর্মের কারণ হয়ে থাকে। আরও বলা আছে:

অরিমিত্রং বিষং পথ্যমধর্মং ধর্মতাং ব্রজেৎ।
সুপ্রসন্নে হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্যয়ঃ॥

ভগবান প্রসন্ন হলে শত্রু মিত্রে, বিষ অমৃতে, অধর্মও ধর্মে পরিণত হয়, আর ভগবান যদি প্রসন্ন না থাকেন তা'হলে বিপরীত দেখা যায় অর্থাৎ বন্ধু শত্রুতে, অমৃত বিষে, ধর্ম অধর্মে পরিণত হয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে ব্যবায়, আমিষভোজন এবং সুরাপান এ তিনটি ছাড়া আর কি কিছু নিন্দনীয় নেই। তার উত্তরে বলা যায় এই তিনের মধ্যেই সব। তৃণাচ্ছাদিত কূপের মত তারা বিপজ্জনক। স্ত্রী-পুরুষের যে মিলন হৃদয়গ্রন্থি—পরাবরদর্শনে এই হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়। মর্মস্থানের স্ফোটক আবৃত করে রাখলে সারবার আশা নেই। চিকিৎসক শাণিত ছুরি দিয়ে তার চিকিৎসা করলে তা ভাল হয়ে যাবে চিরদিনের মত। তেমনি আমাদের হৃদয়ের যত মালিন্য আছে শাস্ত্র, সাধু, গুরু, বৈষ্ণব সুচিকিৎসকের মত শাণিত ছুরি দিয়ে তার চিকিৎসা করলে আমরা চিরদিনের মত নিরাময় হয়ে যাব, কামনা মালিন্য আর আমাদের থাকবে না, রোগ দূর হবে। প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হলে ভব নাশ পায়, এ নাশ হল আত্যন্তিক নাশ। ভগবৎদর্শনের আগেই হয়ত মায়ার বন্ধন নাশ হয়েছে, কিন্তু সে বন্ধনমুক্তি তখনও স্বীকৃতি পায় নি ; প্রেম হলে তবে এ বন্ধনমুক্তি স্বীকৃতি পাবে। হৃদয় ভাঁড় হতে বাসনা ঘি আর কিছুতেই যেতে চায় না। গৌরগোবিন্দকে প্রেমভরে আস্বাদ করলে তবে মায়াবন্ধন মুক্তি স্বীকৃতি পাবে। অর্থাৎ তাকে আর কখনও মায়া স্পর্শ করবে না। শ্রীশুকদেব সাধকজগৎকে সাবধান করেছেন—চরণ দিয়েও কখনও দারুনির্মিত স্ত্রীমূর্তি স্পর্শ করবে না। আমাদের যে রাশিকৃত মায়া জমে আছে তাই সারান যায় না।

এর ওপরে আর এতটুকু কুপথ্যও করা চলবে না। কপিল ভগবান মাতা দেবহূতিকে বলেছেন,—'দেখ দেখ মা, মায়ার বল দেখ।' নিমিরাজ প্রশ্ন করলেন—ব্যবায়াদি যদি নিন্দনীয়ই হয়, তাহলে আবার তাদের জন্য শাস্ত্রবিধান কেন? ভাগবত সর্বদা সত্য কথা বলেন, শ্রীমদ্ভাগবত বললেন—এগুলি বিধিপর্যায়ে পড়ে না। কারণ বিধি যদি হত তাহলে না করলে প্রত্যবায় হত, কিন্তু এগুলি না করায় প্রত্যবায় নেই—তাই বিধি নয়। লোকে ব্যবায়াদির শাস্ত্রবিধি নেই। কারণ স্বাভাবিক রাগবশে এগুলির নিত্য প্রাপ্তি আছে। স্ত্রীসঙ্গ রাগত নিত্যপ্রাপ্তি আর আমিষভোজন এবং সুরাপান কুলপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত। কাজেই এদের বিধি বলা চলে না। বিধি কাকে বলে? অপ্রাপ্তপ্রাপণো বিধিঃ। তিনটি বিধির মধ্যে অপূর্ব বিধিই বিধির মধ্যে গণ্য। আচ্ছা, যদি রাগতপ্রাপ্তি-হেতু অপূর্ববিধি না হয় তাহলে নিয়মবিধি হোক। নিয়মবিধি কাকে বলে? বহুত্র প্রাপ্তৌ সঙ্কোচনং নিয়মঃ। যেমন ধান থেকে তুষ বাদ দেওয়া সম্পর্কে নখের দ্বারা বিদলন প্রভৃতি অন্য উপায় থাকলেও অবহন্যাদেব করে নিয়মবিধি করা হল, অর্থাৎ অবহননই করবে—অন্য কিছু করবে না। অপূর্ব, নিয়ম এবং পরিসংখ্যা এই তিনটি বিধির মধ্যে অপূর্ববিধিই একমাত্র বিধি—এইটিই পাকা বিধি, যেমন ভগবানের বাক্যে বলা আছে:

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ ব্যবসিতো হি সঃ। গীতা ৯।৩০

অপূর্ববিধিরই গৌরব, অর্থাৎ এটি পালন করতেই হবে, না করলে দোষ হবে। তবে যে 'ঋতৌ ভার্যামুপেয়াৎ', 'হুতশেষং

ভক্ষয়েৎ'—এখানে উপেয়াৎ এবং ভক্ষয়েৎ-বিধির মত চেহারা—এটি কেন? এটি নিয়মবিধিও নয়। শ্রীস্বামিপাদ বললেন—নিয়মবিধি অনুজ্ঞামাত্র। নিয়মবিধি হলে তবে তো তা পালনীয় হবে। তবে নিন্দা কেন? এটি নিয়মবিধিও নয় কারণ নিত্যপ্রাপ্ত হয়েই আছে। এটি পরিসংখ্যা। কর্তব্য বলে বোঝায় না—ছেলে যখন বায়না ধরে আমড়া খাওয়ার জন্য তখন মা বলেন—একটু খাও; কিন্তু এ কথা থেকে এটি বুঝায় না যে মা তাকে খাওয়ার বিধান দিচ্ছেন। কারণ মায়ের ইচ্ছা ছেলে যেন না খায়। নেহাৎ ছেলে কিছুতেই ছাড়বে না বলে অগত্যা বলেন একটু খাও। তেমনি জীব সন্তান বায়না ধরেছে ব্যবায় আমিষভোজন এবং সুরাপান করবে। তাই শ্রুতি মাতা বললেন এই এই বিষয়ে কর কিন্তু শ্রুতির আসল উদ্দেশ্য জীব ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তি মার্গে যাক। প্রবৃত্তিকে সঙ্কোচ করবার জন্যই পরিসংখ্যা বিধি বলা হল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ বললেন,—বেদের এই বিধান কেন হল? জীব যদি স্ত্রীমাংসমদ্যাদি ছাড়া থাকতে না পারে, তাহলে বিবাহবিষয়ে ব্যবায়, যজ্ঞে আমিষসেবা, সৌত্রামণিতে সুরাগ্রহণ এইরকম অনুজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। একে বিধি বলা যায় না, শাস্ত্রের তাৎপর্য হল নিবৃত্তিতে। 'ঋতৌ ভার্যামুপেয়াৎ' এটি যদি বিধি হত, তাহলে সন্ন্যাসধর্ম থাকত না। মনুস্মৃতির বাক্য অনেকে প্রমাণ হিসাবে তোলেন—প্রবৃত্তিসূচক বাক্য, কিন্তু পরবর্তী অংশ লক্ষ্য করে কথা বলতে হবে—নিবৃত্তিস্তু মহাফলা। প্রবৃত্তির কথা যা বলা হয়েছে তার তাৎপর্য হল নিবৃত্তিতে। অর্ধেক অংশ প্রমাণ হিসাবে নিয়ে অপরাধ ত্যাগ করলে তো চলবে না—

এতে অর্ধকুক্কুটির ন্যায় করা হবে। সন্ন্যাস বলতে ত্যাগের ধর্মই বুঝায়। মহাকবি ভবভূতি তাঁর উত্তরচরিত নাটকে প্রসঙ্গ তুলেছেন। ভগবান বাল্মীকির আশ্রমে যখন বশিষ্ঠদেব, রাজর্ষি জনক প্রভৃতি অতিথি হয়েছেন, তখন বশিষ্ঠকে সমাংসে মধুপর্ক এবং রাজর্ষি জনককে নির্মাংস মধুপর্ক দেবার ব্যবস্থা হল। স্ত্রীগমনের কথা শাস্ত্রে থাকলেও কামনা না থাকলে অভিগমন না করলে দোষ নেই। শ্রীমদ্ভাগবত মীমাংসা করলেন— পশু আলভনে হিংসা অর্থাৎ প্রাণে বধের প্রয়োজন নেই অঙ্গচ্ছেদ করলেই চলবে। সুরাগ্রহণে ঘ্রাণগ্রহণ করলেই চলবে। পুত্র উৎপাদনের জন্যই স্ত্রীসঙ্গ করতে হবে, ভোগবিলাসের জন্য নয়। কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তি এটি না বুঝে, এই বিশুদ্ধ ধর্ম না জেনে, কেবল আত্মসুখের জন্য এগুলি প্রয়োগ করে। পরমাত্মাকে অভীষ্ট বলা হল। হরি না পাওয়ার কষ্ট হরি না পেলে মিটবে না। ব্রহ্মাও নিজে আচরণ করে দেখালেন, গোবিন্দভজন ছাড়া সুখ হয় না। আরও একটি অনর্থ আছে। প্রাকৃত ধনসম্পদ দিয়ে ধর্মযাজন করলে পরমার্থ পাওয়া যায়, ধনকে ধর্মে না লাগিয়ে জগতের কাজে, অর্থাৎ বিষয়ভোগে লাগালে তাতে আত্মজ্ঞান হয় না। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে, জীব অর্থকে দেহসুখে লাগায় কেন? কারণ তারা অত্যন্ত পরাক্রমশালী মৃত্যুকে দেখতে পায় না। মৃত্যু সম্বন্ধে চেতনা না থাকায় সাহস তাদের বেড়ে গেছে। সেইজন্য ধনকে ধর্মের কাজে লাগায় না।

যারা অভিচার দ্বারা পরের শরীরের প্রতি বিদ্বেষ করে তারা এক হিসাবে পরমাত্মা হরিকেই বিদ্বেষ করে, সুতরাং এর ফলে

মায়ার বন্ধনে পুনরায় অধঃপতিত হয়। যাঁরা তত্ত্ব অনুভব করেছেন তাঁরা স্বয়ং উত্তীর্ণ হন, আর যারা অজ্ঞ অর্থাৎ তত্ত্ব অনুভব করেননি, তারা তত্ত্বজ্ঞের কৃপায় সংসার থেকে উদ্ধার পায়। আর যারা তত্ত্বজ্ঞও নয় আবার অজ্ঞও নয়—অজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ—এই দুই-এর মাঝামাঝি, তাদেরই অধঃপতন হয়। যারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে নি, অথচ পশুর মত অজ্ঞও নয়, কেবল ধর্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গসাধনে তৎপর, অথচ হরিকথাশ্রবণে অবসর নেই, এই নশ্বর দেহকেই চিরস্থায়ী জ্ঞান করেছে, তারা নিজেরা নিজেদের হত্যা করে, অর্থাৎ জন্মমরণ পরম্পরারূপ সংসার প্রাপ্ত হয়। এর থেকে কখনও উদ্ধার লাভ করে না। অতএব সেই আত্মঘাতী অশান্ত, বিফলমনোরথ, অকৃতকৃত্য ব্যক্তি কর্মকেই জ্ঞান মনে করে অবসন্ন হয়। ভগবান বাসুদেবে পরাঙ্মুখ। এই সব ব্যক্তি কত কষ্ট স্বীকার করে গৃহসম্পদ, মান-মর্যাদা, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-আত্মীয় রচনা করে, কিন্তু পরিণামে এই সব ত্যাগ করে, ইচ্ছা না থাকলেও তারা অজ্ঞান অন্ধকারে প্রবেশ করে।

অষ্টম যোগীন্দ্র শ্রীচমস এইভাবে অভক্তের গতি নিরূপণ করলে মহারাজ নিমি এইটি ভাল করে বুঝতে পারলেন যে, ভগবানের অবতার ছাড়া জীবের উদ্ধারকাজে আর কেউ সমর্থ নয় এবং ভগবানের পাদপদ্মে বিশুদ্ধা ভক্তিই জীবের একমাত্র কর্তব্য। এই বিচার করে মহারাজ নিমি নবম যোগীন্দ্র শ্রীকরভাজন ঋষিকে নবম প্রশ্ন বা শেষ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করলেন।

নবম প্রশ্ন

মহারাজ নিমি নবম প্রশ্ন করছেন—কোন কালে ভগবানের কি বর্ণ এবং কিরূপ আকারে ও কি কি নামে তিনি অবতীর্ণ হন এবং কোন বিধি অনুযায়ী মানুষ তাঁর পূজা করে—এটি আপনি নবম যোগীন্দ্র কৃপা করে বলুন। এর উত্তরে করভাজন ঋষি বললেন—করভাজন, অর্থাৎ করই হয়েছে ভাজন অর্থাৎ পাত্র যাঁর, অর্থাৎ যিনি সংগ্রহী নন। তাঁর পক্ষেই ভগবানের স্বরূপ অনুভব করা সম্ভব।

কৃতযুগ অর্থাৎ সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ এবং কলিযুগ—এই চারি যুগেই ভগবান কেশব নানা বর্ণ, নানা আকার ধারণ করে আবির্ভূত হন এবং মানুষের দ্বারা নানা বিধিমতে পূজিত হন। সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, চতুর্বাহু, জটিল, বল্কলবসন, দণ্ডকমণ্ডলু ও কৃষ্ণসারমৃগের চর্ম, যজ্ঞসূত্র, অক্ষমালাধারী ব্রহ্মচারীবেশে অবতীর্ণ হন। সত্যযুগের প্রভাবে তখনকার মানুষেরা শান্ত, নির্বৈর, সুহৃদ এবং সমদর্শী ছিল—অর্থাৎ তারা পরের দুঃখে দুঃখী এবং পরের সুখে সুখী ছিল। দেবতার আরাধনায় তাদের উপকরণ ছিল—তপস্যা, অর্থাৎ ধ্যান এবং শম দম। মন এবং বুদ্ধিকে সংযত করার নাম শম আর বাহ্য ইন্দ্রিয়কে সংযত করার নাম দম। এখন প্রশ্ন হতে পারে ব্রহ্মার সৃষ্ট জীব কেমন করে শম-দমের অধিকারী হবে? ভগবান তাই সহজ উপায়টি বললেন—'শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ'। বুদ্ধি যদি ভগবানে নিষ্ঠা

লাভ করে তাকে শম বলা হয়, আর যে কোন ইন্দ্রিয়-সংযমের নাম দম। সত্যযুগের ভগবানকে নানা নামে অভিহিত করা হত। হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম, যোগেশ্বর, অমল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত, পরমাত্মা ইত্যাদি। কলিযুগের মত এমন হরিনাম তখন ছিল না—শুধু ডাকা হত এই এই নামে। সত্যযুগে ধর্ম চতুষ্পাদ অর্থাৎ নিখুঁত। যাজন করলে ফল পুরোপুরি লাভ হত।

ত্রেতাযুগে ধর্ম একপাদ কমে গিয়ে ত্রিপাদ হল, অর্থাৎ নিখুঁত ধর্মযাজন হলেও ফল পাওয়া যাবে চার ভাগের তিন ভাগ। মানুষের চিত্ত ও বল ভেঙে গেছে। মনোবলের ওপরে ধ্যান কাজ করে, ধর্মবলের ওপরে মনোবল প্রতিষ্ঠিত। ধর্মবল ছাড়া মনোবল হয় না—'ধর্মঃ রক্ষতি ধার্মিকম্'। ধর্ম ছাড়া যাদের মনোবল দেখা যায়—তা ক্ষণিক, এ অসুরের বল—এ বলের দ্বারা সাধনের কাজ হয় না। এ বলের দ্বারা পরপীড়ন হতে পারে মাত্র। ত্রেতা যুগে ভগবান রক্তবর্ণ, চতুর্বাহু, মেখলাত্রয়ধারী, পিঙ্গলকেশ, বেদময়শরীর এবং স্রুক্ স্রুবাদি উপলক্ষিত যজ্ঞমূর্তিরূপে অবতীর্ণ হন। ভগবান পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র ত্রেতাযুগের লীলাবতার—তিনি যুগাবতার নন। কারণ যুগাবতারের কাজ হল যুগধর্ম প্রচার করে চলে যাওয়া। যুগাবতার সেই যুগের উপাসনাপদ্ধতি নিজে আচরণ করে শিক্ষা দেন। সেই যুগের লোকেরা সেই যুগাবতারকেই ভজে। ত্রেতাযুগে যুগাবতারের যাজ্ঞিক মূর্তি—মনোবল তখন কমে গেছে—তাই সত্যযুগের মত তপস্যা হল না। ত্রেতাযুগের মানুষের সত্যযুগের উপাসকের মত অত বিশেষণ নেই, তারা

ব্রহ্মবাদী, স্বর্গবাদী নয়। আর এ যুগে মানুষ স্বর্গবাদীও নয় —ইহলোকবাদী। তখন ধর্মিষ্ঠ ব্রহ্মবাদী মানুষেরা সর্বদেবময় সেই হরিকে ত্রয়ীবিদ্যা অর্থাৎ বেদত্রয়োক্ত কর্মের দ্বারা পূজা করতেন এবং বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, সর্বদেব, উরুক্রম, বৃষাকপি জয়ন্ত, উরুগায় ইত্যাদি নামে কীর্তন করতেন। বৃষাকপি নামের অর্থ—বর্ষতি কামান্ আকম্পয়তি ক্লেশান্—যিনি জীবের কামনা পরিপূরণ করেন এবং দুঃখ নিবারণ করেন।

দ্বাপর যুগে ভগবান শ্যামবর্ণ। স্বামিপাদ অর্থ করেছেন— অতসীকুসুমবৎ পীতবসনধারী, চক্র প্রভৃতি আয়ুধধারী,দক্ষিণবক্ষে শ্বেত রোমরাজি—এরই নাম শ্রীবৎসচিহ্ন, করচরণে পদ্ম প্রভৃতি চিহ্নধারী এবং বক্ষে কৌস্তুভমণি শোভিত। সকল ভগবানের বিশেষণ শ্রীগোবিন্দে বর্তমান। দ্বাপরে যজ্ঞ হয় না, দ্বাপরযুগে ধর্ম দ্বিপাদ—দ্বি অপর=দ্বাপর, অর্থাৎ ধর্ম নিখুঁত যাজন করলেও ফল পাওয়া যাবে অর্ধেক। দ্বাপর যুগের মানুষের পরিপূর্ণ মনোবল নেই। বিষ্ণুধর্মোত্তরগ্রন্থে বলা আছে— দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলৌ শ্যামঃ প্রকীর্তিতঃ—কলিতে ভগবান শ্যামবর্ণ অথচ যোগীন্দ্র বললেন—দ্বাপরে ভগবান শ্যামঃ ···। দীপিকাদীপনটীকাকার এই বাক্যের ওপর বিচার করেছেন— যে দ্বাপরে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত ঠিক তার পরবর্তী কলিযুগে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব। অন্য কলিতে শ্যামবর্ণের অবতার। কৃষ্ণকে বললেই সব বলা হবে। তাঁর মধ্যেই সব অবতার আছেন। দ্বাপর যুগে কারা এই অবতারকে উপাসনা করবে? তার উত্তরে যোগীন্দ্র বললেন,—যাদের

মহারাজার লক্ষণ আছে, অর্থাৎ ছত্রচামরাদিযুক্ত, তারা বেদ এবং তন্ত্রের দ্বারা তাঁর উপাসনা করবে। যারা পরতত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু তারাই অর্চনা করবে। জিজ্ঞাসা মানে এখানে অনুভব করা। অনুভব না হলে প্রকৃতপক্ষে জানা হল না। মধু যে মিষ্টি তা গ্রন্থে পড়লে বুঝা যায় না, জিহ্বায় পড়লে জানা যায়। মধু ইন্দ্রিয়-গোচর হলে তবে বুঝা যাবে মিষ্টি কি না। কেউ যদি ভগবৎতত্ত্ব চোখে দেখে তবে তার কথা সত্য। তাই যোগীন্দ্র বললেন,—পরং জিজ্ঞাসবঃ। দ্বাপরের যে আরাধনা তা স্বর্গাদি কামনার জন্য নয়, ঈশ্বর জানার জন্য আরাধনা। দ্বাপরে যে প্রণামমন্ত্র তা কৃষ্ণের গা ঘেঁসা।

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥
নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্বভূতাত্মনে নমঃ॥ ভা. ১১।৫।২৯-৩০

বাসুদেবকে নমস্কার, সঙ্কর্ষণকে নমস্কার, ভগবান প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে নমস্কার—নারায়ণ, ঋষি, মহাত্মা, পুরুষ, বিশ্বব্যাপী, বিশ্বেশ্বর এবং সর্বভূতাত্মাকে নমস্কার। হে পৃথ্বীনাথ, এই বলে দ্বাপরযুগের লোকেরা জগদীশ্বরের স্তব করতেন। তিনি বিশ্বেশ্বর, অর্থাৎ সকল ঈশ্বরের যিনি ঈশ্বর। মহাজন বলেছেন —'তুমি না দেখিলে জীবের নাহি স্থিতি গতি।' তারপর যোগীন্দ্র বললেন:

নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু। ভা. ১১।৫।৩১

কলিতে বেদ নেই—শুধু তন্ত্রের প্রাধান্য। মহারাজ নিমি তো

কথা শুনছেনই, আবার যোগীন্দ্র 'শৃণু' বললেন কেন? একি তাঁর মুদ্রাদোষ না কি? আবার 'শৃণু' বলবার কারণ কি? অন্য কলিতে ভগবান শ্যাম, কৃষ্ণ অবতারের ঠিক পরবর্তী যে কলি তাতে গৌর-অবতার—এই গৌর-অবতার প্রচ্ছন্ন হয়ে এসেছেন। তাই প্রচ্ছন্ন করে বলতে হবে কলির উপাস্য প্রচ্ছন্ন। তাই তার প্রমাণবাক্যও প্রচ্ছন্ন—তাই আগে যে কান দিয়ে মহারাজ শুনছিলেন, তা দিয়ে শুনলে আর চলবে না। কানকে আরও গাঢ় করে শুনতে হবে। সেই জন্য যোগীন্দ্র আবার 'শৃণু' পদ উল্লেখ করে রাজাকে অবহিত করলেন। তন্ত্র শব্দের দ্বারা একই বাক্যের দুই প্রকার অর্থ বুঝায়। কলিযুগের যুগাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচ্ছন্নবাক্য যোগীন্দ্র বললেন:

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ভা. ১১।৫।৩২

কলিযুগের উপাস্য এবং উপাসক এই শ্লোকে নিরূপিত হয়েছে। যিনি নিজে যুগধর্ম আচরণ করে প্রচার করেন, তিনিই যুগাবতার। দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র এসেছেন, তাই আর অন্য অবতারের প্রয়োজন হল না—যুগাবতারের কাজ কৃষ্ণ নিজেই করেছেন। স্বয়ং ভগবানের কোন কর্তব্য নির্দেশ নেই। ভগবান নিজেই বলেছেন:

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। গীতা ৩।২২

লীলাবতারেরও কোন কর্তব্য নেই। নৃসিংহ ভগবান হিরণ্যকশিপু বধের জন্য আবির্ভূত নন—ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদকে আনন্দ দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য—এটি ভগবানের নিজের প্রয়োজন

—ভক্তের সুখবিধান করা—কাজেই এটি কোন প্রয়োজনের মধ্যে পড়বে না। গুণাবতার পুরুষাবতার ও যুগাবতারের কর্তব্য আছে। স্বয়ং ভগবানের আবার তিনটি স্বরূপ পূর্ণতম, পূর্ণতর, এবং পূর্ণ। তার মধ্যে পূর্ণতম স্বরূপ শ্রীনন্দনন্দনে যুগাবতারের কাজ হয় নি। পূর্ণতর মথুরারাজের স্বরূপেও যুগাবতারের কাজ হয়নি। যুগাবতারের কাজ হয়েছে দ্বারকাধীশ স্বরূপে, অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপে। কাজ নিয়ে বা নিজের প্রয়োজনে কারও কাছে গেলেও যেমন যাওয়ামাত্রই, তাকে কাজের কথা বলা যায় না, সময় বুঝে বলতে হয়, তেমনি কৃষ্ণও সময় বুঝে যুগধর্ম আচরণ করেছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, তিন যুগেই দেখা গেল যিনি যুগধর্ম প্রচার করলেন তাঁকেই আরাধনা করা হয়েছে। কলিযুগেও সেই একই পন্থা। কলির যুগাবতারই প্রচার করলেন যুগধর্ম।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

তাহলে পাওয়া যাচ্ছে যিনি যুগধর্ম প্রচার করলেন, তাঁকেই উপাসনা করতে হবে। অর্থাৎ যিনি হরিনাম দিয়েছেন, তাঁকেই ভজতে হবে। 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং'—এই শ্লোকে স্বামিপাদ অর্থ করলেন—কৃষ্ণ হয়েছে বর্ণ যাঁর, কৃষ্ণ শব্দের দ্বারা এখানে ইন্দ্রনীলমণির মত উজ্জ্বলবর্ণকে বুঝাচ্ছে। এ কাল রুক্ষ কাল নয়, উজ্জ্বল কাল। অথবা ত্বিষা কৃষ্ণম্, অর্থাৎ কৃষ্ণাবতারম্—কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণম্ দুবার কৃষ্ণ বলবার তাৎপর্য হল, কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যম্। কলিযুগের পূজার উপকরণের কোনটিরই শুদ্ধি নেই, তাই এই যুগের পূজা সংকীর্তন-প্রধান। ভগবানের নামোচ্চারণ ছাড়া কোন দ্রব্য শুদ্ধ হয় না। কলিযুগে যারা

সুমেধা তারাই নামোচ্চারণের দ্বারা উপাস্যের আরাধনা করবে। অন্যান্য যুগের মত এখানে শুধু মানুষেরই অধিকার দেওয়া হয় নি—কলিযুগে অধিকারী ব্যাপক নয়। সবাই ভজতে পারবে না, যাদের মেধা ভাল কেবল তারাই ভজবে—তারাই সুমেধা। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ সুমেধা শব্দের অর্থ করেছেন—যারা এই শ্লোকের অর্থ বুঝতে পারে তারাই সুমেধা।

প্রহ্লাদজী স্তুতিপ্রসঙ্গে নৃসিংহ ভগবানকে বলেছেন :

ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেব ঝষাবতারৈর্লোকান্
বিভাবয়সি হংসি জগৎ প্রতীপান্।
ধর্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ
যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥ ভা. ৭।৯।৩৮

হে ভগবন্; তুমি যুগানুরূপ ধর্ম প্রচার কর—নিজপাদপদ্মে জগৎকে উন্নীত কর। জগৎকে সমৃদ্ধিশালী কর। বিভাবয়সি, অর্থাৎ বিশেষরূপে ভাবিত কর। চিন্তাগ্রস্তকে বিশেষরূপে চিন্তা করাও। কি বিশেষ চিন্তা? এ চিন্তা পরশমণির চিন্তা—সেই চিন্তায় ভাবিত করাও। এ জগতের উন্নতি বলতে আমরা যা বুঝি তার বৃদ্ধি হতে হতে সম্রাটপদ, তারপর ইন্দ্রপদ, ব্রহ্মার পদ, মুক্তিপদ এরও পরে। হরিভক্তি সেই সম্পদপ্রাপ্তিতে চিত্তকে বিভাবিত কর। আবার তুমি হংসি জগৎপ্রতীপান্ লোকান্। বিরোধী লোকেদের তুমি বিনাশ কর। দেহের মধ্যেও দেখা যায়—দেহাবয়ব যদি প্রতিকূল হয়, তাহলে তাকে ত্যাগ করা চলে। ভগবান নিজেও এটি উল্লেখ করেছেন—'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। প্রহ্লাদ বলেছেন যুগে যুগে তুমি অনুবৃত্ত হও। চার

যুগের চারটি ধর্ম—তাকে তুমি রক্ষা কর। ভগবানের বাক্যও এর সঙ্গে মিলল—'সম্ভবামি যুগে যুগে।' ভগবান চারযুগেই আসেন, কিন্তু কলৌ ছন্নঃ—কলিযুগে তুমি প্রচ্ছন্নভাবে অবতীর্ণ হও। প্রহ্লাদ 'যদভব' এখানে অতীত কালের ক্রিয়া দিয়েছেন—পূর্ব পূর্ব কলিকে লক্ষ্য করে। কলিতে তুমি প্রচ্ছন্নভাবে আস। তাই শাস্ত্র তোমাকে ব্যক্ত করে বলতে পারে না। শাস্ত্রও তাই ঢাকা দিয়ে কথা বলেছে—তোমাকে ত্রিযুগ বলে উল্লেখ করেছে। কলিতে যে ঢাকা-দেওয়া ভগবান এটি প্রহ্লাদের বাক্য থেকে পাওয়া গেল। শাস্ত্র তার ঢাকা খোলেন নি, তাই শাস্ত্র ভগবানকে ত্রিযুগ বললেন। ঘোমটা দিয়ে যে চলে তার ঘোমটা খুলে দেওয়া শালীনতা নয়। তাই শাস্ত্র ঘোমটা খোলে নি। কলিযুগের ভগবান সকলের কাছে দুর্বোধ এইটিই বুঝা যাচ্ছে এবং তার প্রমাপক বাক্যও দুর্বোধ—প্রমাপক বাক্য প্রচ্ছন্ন। তার অর্থ কি? অর্থাৎ বাক্যটি অর্থান্তরের দ্বারা আচ্ছাদিত। স্বামিপাদ ভিতরের অর্থ বললেন না, বাইরের অর্থই বললেন। শ্রীজীবপাদ বলছেন,—যে দ্বাপরে কৃষ্ণভগবান আবির্ভূত, তার পরবর্তী কলিযুগে গৌর-অবতার। সেই গৌর-অবতারের কথাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে। অন্য কলির যুগাবতার এখানে বলা হয় নি। ব্রহ্মার প্রতিদিনে স্বয়ং ভগবান একবার করে আসেন।

ব্রহ্মার একদিনে তিহ একবার।
অবতীর্ণ হইয়া করেন প্রকট বিহার ॥

শ্রীজীবপাদ অকৃষ্ণ পদে অর্থ করেছেন—গৌর। 'অকৃষ্ণ' পদে গৌর বলা হল কেন? গর্গাচার্যের বাক্য আছে:

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

—ভা. ১০।৮।১৩

সত্যযুগে ভগবান শুক্ল অর্থাৎ শুভ্রবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ এবং পরিশেষে কলিযুগ ও গৌরবরণ (পীতবরণ) অবশিষ্ট আছে; তাই অকৃষ্ণ পদে গৌর বরণটিই কলিযুগের যুগাবতারের পক্ষে প্রযোজ্য হয়েছে। যদি বলা যায় পীতবর্ণের অন্য কোন ভগবান বলব তবু গৌর স্বীকার করব না। গৌরই যে কলিযুগের যুগাবতার এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক গ্রন্থে কলিরাজ ও তাঁর সখা অধর্মের কথোপকথনপ্রসঙ্গে বলা আছে। ভগবত্তার অন্যতম অসাধারণ ধর্ম হল সর্বান্তঃকরণকে আকর্ষণ করতে পারে। গৌররূপসম্বন্ধে মহাজন বলেছেন ঃ

সকলজনের মন করিবারে আকর্ষণ
বিধাতা কি পাতিয়াছে ফাঁদ
একবার যেই হেরে সে আঁখি ফিরাতে নারে
মন উন্মাদন গোরাচাঁদ।

কলিরাজ বলছেন,—গৌর যে ভগবান, তার আর একটি প্রমাণ হল তার কাছ থেকে আমার ভয় আছে। তাতে বুঝা গেল গৌর জীব নন—কারণ জীবের কাছ থেকে কলির ভয় হয় না। আর তা ছাড়া গৌর-ভগবানই কলির যুগধর্ম শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্তন প্রচার করেছেন, তাই তিনিই যুগাবতার। যিনি যুগধর্ম প্রচার করলেন, তাঁরই আরাধনা করতে হবে, প্রতি যুগেই তাই করা হয়েছে, এইটিই নিয়ম। গর্গাচার্যের বাক্যে 'আসন্' বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য

—এখানে 'আসন্' অতীতকালের ক্রিয়া প্রয়োগ কেন? পীতবর্ণ তো পরে হবে—এ তো দ্বাপরযুগের কথা—তখনও তো গৌর-অবতার হন নি। শুক্লরক্তসম্বন্ধে অতীত হতে পারে, কিন্তু পীতসম্বন্ধে অতীত কেন? তার উত্তরে শ্রীজীবপাদ বলেছেন—প্রাচীন অবতারকে অপেক্ষা করে এখানে অতীতকালের ক্রিয়া বসান হয়েছে। যে দ্বাপরে কৃষ্ণ-ভগবান তার পরবর্তী কলিতে গৌর-অবতার। তাই শ্রীজীবপাদ বলেছেন,—'শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ এবায়ং গৌরঃ ইত্যায়াতি'। কৃষ্ণাবির্ভাবের বিশেষ স্বরূপ হলেন গৌর।

গৌর আবির্ভাবকে শ্রীজীবপাদবললেন—কৃষ্ণাবির্ভাববিশেষঃ। কৃষ্ণের সঙ্গে তাহলে গৌরেরসম্বন্ধ আছে। কিরকম সম্বন্ধ? কৃষ্ণ যদি দুধ হন, গৌর তাহলে ক্ষীর। কৃষ্ণের পরিপাকদশা গৌর—পরিণতি স্বরূপ। কৃষ্ণ কৃষ্ণই,আর কৃষ্ণ যখন বিশেষ তখন তিনিই গৌর। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই বিশেষটি কি? গৌরসুন্দর এতই দুর্বোধ্য যে তাঁকে বুঝা যায় না। গৌরের দুটি দিক: (১) রসের দিক—ভগবত্তার দিক—জীবের কাছে দুর্বোধ্য, (২) করুণার দিক—করুণাগ্রহণের অধিকারী নির্বাচন করা হয় নি, বরং দীন দুঃখীই এই করুণাগ্রহণে বেশী অধিকারী। যে যত দুঃখী, যত পতিত সে তত তাঁর করুণাগ্রহণে সমর্থ। কলির জীব সবচেয়ে বেশী দুঃখী। গৌর এসেছেন কলিযুগে, তাই কলিজীবকে কিছু দিতে হবে। কলিজীব ভগবানকেই বুঝতে পারে না, তা আবার রসের ভিয়ানে গৌর হয়েছেন। তাঁকে বুঝবে কেমন করে? জীব যত পতিত হবে তত সে করুণার পাত্র হবে। শ্রীচক্রবর্তিপাদ বলেছেন

—গৌর দুর্বোধ, তাই কৃষ্ণকে আমরা ভগবানের যে আসনে বসিয়েছি—পাঁচশ বছর হয়ে গেছে—গৌরকে আজও আমরা ঠিক কৃষ্ণের জায়গায় বসাতে পারি নি। গৌর স্বয়ং ভগবান হয়েও সম্পূর্ণ অচেনা হয়ে এসেছেন। নিজের অস্ত্র শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করে আসেন নি। যাঁরা গৌরকে বুঝেছেন, তাঁরা তাঁর চরণে একান্তভাবে আশ্রয় নিয়েছেন। রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর চরণ ধরে কেঁদেছেন। রামানন্দ রায় বিস্মিত হয়ে বলেছেন ঃ

পহিলে দেখিনু তোমার সন্ন্যাসী স্বরূপ
এবে দেখি তোমার শ্যাম গোপরূপ।
তার আগে দেখি স্বর্ণপঞ্চজালিকা
তার গৌরকান্তে তোমার সর্ব অঙ্গ ঢাকা।
আমি তোমায় চিনেছি হে।

রামানন্দ অত্যন্ত গবেষণা করে গৌরস্বরূপ উদ্ধার করেছেন—তাঁদের হৃদয়ে গৌর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের কাছে তিনি সম্পূর্ণ অচেনা। তাই আমরা তাঁকে আজও বুঝতে পারি নি, তিনি দুর্বোধ। তাই যোগীন্দ্র বললেন—যারা সুমেধা তারাই কলিতে গৌর উপাসনা করবে। দ্বাপরে বা ত্রেতায় উপাসনার অধিকারী শুধুমাত্র মানুষ, কলিযুগে কিন্তু শুধু মানুষ হলেই গৌর উপাসনা করবে তা বলা হয় নি। কলিতে গৌর-উপাসককে বাছাই করে নেওয়া হয়েছে। পাতলা দুধ খেয়ে যে হজম করতে পারে না, তার ক্ষীর কেমন করে হজম হবে? অথচ ক্ষীর হজম করতে গেলে যেমন পাতলা দুধ খাইয়ে ক্ষীর ভোজনের শক্তি

করিয়ে নেওয়া হয় পরে ক্ষীর খেয়ে সে হজম করতে পারে, তেমনি গৌরের করুণা ধরে থেকে থেকে তার স্বরূপ আস্বাদন হয়ে যাবে। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ গৌরস্বরূপের যে কথাটি বললেন—'কৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এব অয়ং গৌরঃ'—এটি অত্যন্ত ছোট তুলিতে অতি বড় ছবি আঁকা হয়েছে।

কৃষ্ণাবির্ভাববিশেষকে যদি বুঝতে হয় তাহলে প্রথমে কৃষ্ণাবির্ভাব বুঝতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কৃষ্ণাবির্ভাব কেন? কৃষ্ণকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝা যায় না। শ্রুতি বললেন—'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। অচিন্ত্য বলতে প্রকৃতির অতীতকে বুঝায়—বুদ্ধি দিয়ে প্রকৃতিকেই বুঝা যায় না। তাহলে প্রকৃতির অতীতকে কেমন করে বুঝা যাবে? কঠোপনষিদে যমরাজ নচিকেতাকে বললেন—'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া'। কৃপাপ্রাপ্ত যে মতি তাকে তর্কের দ্বারা দূরে সরিয়ে দিও না। আবার বলা হয়েছে 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।' প্রকৃতিজাত মেধাদ্বারা আত্মবস্তু লাভ হয় না, কৃপালব্ধ মতিই আত্মাকে পাইয়ে দেবে। নিজে বরণ করলে বরণ করা হয় না। তিনি যাঁকে বরণ করেন, তার দ্বারাই গ্রাহ্য হন—'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'। কৃষ্ণ যদি সঙ্কল্প করেন এই জীবটি আমাকে বুঝুক, এ জীবটি আমার হোক, তবে সেই জীব তাঁকে বুঝতে পারে—নতুবা পারে না। ব্রহ্মাও বলেছেন—একমাত্র কৃষ্ণকৃপাতেই কৃষ্ণতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়।

কৃষ্ণেররসের দিক, ভগবত্তার দিক অনেক প্রকারের। তাঁর

মধ্যে মধুর রসের দিক আবার বহু প্রকারের। অন্যান্য ভগবানের মধুর রস একমাত্র তাঁদের নিজ নিজ লক্ষ্মীতেই পর্যবসিত। সব ভগবান অপেক্ষা গোবিন্দস্বরূপে চারটি গুণ বেশী--রূপমাধুর্য, প্রেমমাধুর্য, লীলামাধুর্য এবং বেণুমাধুর্য। শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণ-লীলার মাধুরী দেখান হয়েছে—সব ভগবানেরই নিজ নিজ লীলার মাধুরী আছে। সব ভাগবান অপেক্ষা আবার রামচন্দ্রে লীলামাধুরী বেশী। ভগবান হয়েও যখন ভগবান মানুষের মত কাজ করেন, তখন তাঁকে ভগবান বলে বুঝা যায় না—তখনই তাঁর লীলার মাধুরী ফোটে। রামচন্দ্র মর্যাদাপুরুষোত্তম। তিনি যে ভগবান, এ তাঁর মনেই নেই—পাষাণময়ী অহল্যার ওপরে পদক্ষেপ করতে বলায় রামচন্দ্র তাতে চরণ অর্পণ করতে পারছেন না। পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র যাঁর চরণ শিববিরিঞ্চিও ধ্যান করেন, তিনি পাষাণে পা দিতে পারছেন না। এইটিই লীলার মাধুরী —প্রতি ক্ষণে ক্ষণে সৌজন্য মর্যাদা, রামচন্দ্রের লীলা তাই এত জনরঞ্জন করে। রামচন্দ্রের শালীনতা অতি সুন্দর—সকলকে মর্যাদা দিয়েছেন। নররূপে অবতার, তাই মানুষের সঙ্গে সজাতীয়তা আছে, অনুকরণ করা চলে। কৃষ্ণচন্দ্র লীলা-পুরুষোত্তম, ইনি কড়াপাকের ভগবান। তাই মানুষের নাগালের বাইরে। রামচন্দ্রের সঙ্গে গুহক চণ্ডাল সখ্য করেছে, কিন্তু সে সখ্য মর্যাদাকে অতিক্রম করতে পারে নি। ব্রজের শ্রীদাম-সুদাম কৃষ্ণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে, কিন্তু সে সখ্যে কৃষ্ণের মর্যাদা তারা রাখে নি–এঁটো ফল খাইয়েছে, কাঁধে চড়েছে, কাঁধে চড়িয়েছে, বলেছে :

তুমি কোন বড়লোক তুমি আমি সম।

তাই কৃষ্ণচন্দ্রের রসভোগের পরিপাটি আরও সূক্ষ্ম,আরও সুন্দর। এইরকম সব রসেই। গুহক চণ্ডাল রামামিতে বলে ডেকেছেন পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্রকে কিন্তু সে ডাকে সম্ভ্রম নষ্ট হয় নি। কৃষ্ণচন্দ্র রসরাজ—তাই একই রসকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভোগ করেছেন। ব্রজের সখা শ্রীদাম-সুদাম, আবার অর্জুন এবং উদ্ধবও তাঁর সখা। উদ্ধব ও অর্জুনের প্রেম কিন্তু ব্রজের সখার মত ঘন নয়। তাঁদের কৃষ্ণতে ভগবত্তার বোধ আছে। বাৎসল্য রসের রসিক বসুদেব, দেবকী এবং নন্দ যশোদা,—কিন্তু রসভোগের তারতম্য আছে। দেব পিতামাতা কশ্যপ-অদিতি, রামচন্দ্রের জনকজননী দশরথ-কৌশল্যা—সকলেই বাৎসল্যরস আস্বাদন করেছেন, কিন্তু প্রত্যেকের আস্বাদন ভিন্ন ভিন্ন। বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণে বাৎসল্যেও ভগবত্তার বোধ আছে, কিন্তু নন্দ-যশোদার বাৎসল্যে ভগবত্তার বোধ তো নেই-ই, এমন কি 'ঐশ্বর্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে'—আর মধুর রসের হিল্লোলের তো কথাই নেই। মধুর রসকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে—স্বকীয়া এবং পরকীয়া। পরকীয়ার প্রেম স্বকীয়া অপেক্ষা তীব্র। ব্রজবালারা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি—বস্তুত তারা পরকীয়া নয়, কারণ শক্তি এবং শক্তিমান অভিন্ন। শক্তি কখনও পরকীয়া হতে পারে না, কিন্তু স্বকীয়ভাবে রাখলে লীলার পুষ্টি হয় না। এইজন্য লীলাশক্তি যোগমায়া শ্রীগোবিন্দের সুখবিধানের জন্য রাধা প্রভৃতি ব্রজরামাগণকে পরকীয়া করে দাঁড় করিয়েছেন। আসলে তাঁরা পরকীয়া নন, কিন্তু ভাব

তাঁদের পরকীয়া ; কারণ তাতে আকর্ষণ বেশী বাড়বে। সাধন হল গোবিন্দে আকর্ষণ—এইটিই কাম্য, এই ব্রজরামাদের গোবিন্দের প্রতি আকর্ষণ সবচেয়ে বেশী। এ জগতেও দেখা যায়—একজন হয় ত বাহাত্তর ঘণ্টা সাঁতার কাটছে বা সাইকেল চড়ছে। তাকে দেখলে অন্যেও চেষ্টা করবে। এখানেও তেমনি গোবিন্দে আকর্ষণের সবচেয়ে বেশী পরিমাণ ব্রজরামাদের। তাই দেখে সাধক চেষ্টা করবে গোবিন্দে কতটা আকর্ষণ দিতে পারে। ব্রজরামাদের গোবিন্দপ্রীতি স্বাভাবিক, কারণ শক্তিমানের প্রতি শক্তির অনুরাগ স্বাভাবিক। তারা ঘরের লোক, তাদের গোবিন্দে আকর্ষণের জন্য পরকীয়ার পোশাক পরাবার দরকার ছিল না। ব্রজরামা যে নিত্যকান্তা এ বোধ যোগমায়ার আছে, তবু লীলার পুষ্টির জন্য যোগমায়া কষ্ট করে ব্রজরামাদের পরকীয়া করে সাজিয়ে রেখেছেন। কারণ নিত্যকান্তা মনে থাকলে আকর্ষণ হয় না, স্বকীয়া হলে মিলনে বাধা পায় না। আর বাধা না পেলে বেগ বুঝা যায় না, অনুরাগ কতখানি, তা বাধা পেলে বুঝা যায়—বাধাই হল অনুরাগের ওজন। সাধককেও সব বাধা ত্যাগ করে 'হা গৌর' বলে 'হা গোবিন্দ' বলে বেরুতে হবে। এইটি সাধকজগৎকে দেখাবার জন্যই ব্রজরামা আজ পরকীয়া সেজে এত বাধার সম্মুখীন হয়েছে। মধুর রস দুই প্রকার—স্বকীয়া এবং পরকীয়া। প্রাকৃত জগতের ব্যবহার, লীলা প্রাকৃতের অনুকরণ। পরকীয়া রমণী দুই প্রকার—পরোঢ়া এবং কন্যা। পরোঢ়ার পক্ষে স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী বাধা এবং কন্যার পক্ষে পিতামাতা বাধা। এই বাধা অতিক্রম করে 'হা গোবিন্দ'

বলে ছুটেছে, সাধককেও তাই করতে হবে। স্বকীয়া হলে আকর্ষণে বাধা নেই। ওজন না করলে অনুরাগের পরিমাণ বুঝা যায় না। বাধার সম্মুখীন হয়েও ব্রজরামা গোবিন্দানুরাগিণী—এতেই গোপীর মহিমা উজ্জ্বল। কারণ রাধাতেও অনুরাগ—কৃষ্ণেতে রসপরিপাটির মেলা। এরই বিশেষ স্বরূপ হলেন গৌর।

কৃষ্ণ অবতারের যা বৈশিষ্ট্য তাই দিয়ে গৌর-অবতার। কৃষ্ণ স্বরূপে যা অসম্পূর্ণ গৌরস্বরূপে তাই সম্পূর্ণ, কৃষ্ণস্বরূপে যা অনভিব্যক্ত গৌরস্বরূপে তাই অভিব্যক্ত। কৃষ্ণস্বরূপে তাঁর আস্বাদন, প্রয়োজন সবই অসম্পূর্ণ, গৌরে তা সম্পূর্ণ। মাধুর্যও কৃষ্ণস্বরূপে অসম্পূর্ণ। কৃষ্ণরূপ ভুবনমোহন, তাঁর রূপের বর্ণনায় শাস্ত্র মুখর হয়ে আছে। যে রূপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

যে রূপের এক কণ
ডুবায় সব ত্রিভুবন
নরনারী করে আকর্ষণ।

কৃষ্ণরূপ আত্মপর্যন্ত সর্বচিত্তহর, অর্থাৎ কৃষ্ণরূপে কৃষ্ণ নিজেই মুগ্ধ।

বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ

গোপবালারা কৃষ্ণরূপের প্রশংসা করেছেন, ভীষ্ম কৃষ্ণরূপের স্তুতি করেছেন—কৃষ্ণের স্বরূপবিচারে রূপ একটা দিক—এই রূপের বিশেষ হলেন গৌর। কৃষ্ণরূপ যদি দুধ হয়, গৌররূপ তাহলে ক্ষীর। তাই গৌররূপদর্শনে কৃষ্ণেরও লোভ জেগেছে। কৃষ্ণের আর একটি বৈশিষ্ট্য—সেটি লীলার বৈশিষ্ট্য—প্রেমদান-লীলার বৈশিষ্ট্য। প্রেমদান কাজই ভগবৎস্বরূপের বিশেষ

কাজ। অসুরমারণে ভগবৎমহিমা স্থায়ী হয় না। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর অবশ্য বলেছেন ঃ

সন্ত্ববতারা বহবঃ সর্বতো ভদ্রাঃ।

কিন্তু কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি।

অন্য অবতারকে সম্মান করে, প্রণাম করে দূরে সরিয়ে রাখলেন, কিন্তু প্রেমদাতা বলে কৃষ্ণকে আদর করলেন। প্রেমকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলা হয়েছে। ভগবানের যত যত দান আছে তার মধ্যে প্রেমদান হল শাশ্বত ফল। যে আশ্রম প্রেম পাওয়ার শিক্ষা দেয় বা যে এই আশ্রম গ্রহণ করেছে তাকে পঞ্চমাশ্রমী বলা হয়। ভক্তি লাভ হলে পুরুষার্থ পাওয়া শেষ হল। ভগবান প্রেমের অধীন, প্রেম পেলেই ভগবানকে পাওয়া যাবে। ভক্তি হলেন পুরুষার্থশিরোমণি। যে প্রেম দিয়ে ভগবানকে বাঁধতে পারা যায়, তা যে ভগবান দান করেন, সেই ভগবানই সকলের চেয়ে বড়। যত যত ভগবান এসেছেন, জীবের কল্যাণ সবাই করেছেন, কিন্তু কৃষ্ণ যা দান করলেন সেই প্রেম দিয়ে জীবের অবিদ্যাব্যাধি চিরতরে নির্মূল করলেন। কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রূপ এবং প্রেমদান এই দুটিই প্রধান। শ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে বন্দনা করেছেন ঃ

জয়তি নিজপদাব্জপ্রেমদানাবতীর্ণো
বিবিধমধুরিমাব্ধিঃ কোঽপি কৈশোরগন্ধিঃ।
জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা
হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ॥

নিজ পাদপদ্মে প্রেমদানই ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান। এই প্রেম

পেলে বৈকুণ্ঠসম্পদও তুচ্ছ হয়ে যায়। যে কোন রকমে মনের বা ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ যদি কৃষ্ণে করা যায় তাহলে অনাদি অবিদ্যা কোশ নষ্ট হয়ে যায়—এর নাম মুক্তি। এই মুক্তিদাতৃত্ব কৃষ্ণে স্বাভাবিক, কিন্তু বৈশিষ্ট্য প্রেমদাতৃত্বে। তীব্র অগ্নিকে যেমন করে হোক স্পর্শ করলে যেমন দাহ হবেই, সেই রকম যেমন করে হোক কৃষ্ণ স্পর্শ করলে মুক্তি হবেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে মুক্তি সুলভ কিন্তু প্রেম দুর্লভ। কারণ মহাজনের পদে আছে :

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥

প্রেমভক্তি কৃষ্ণ একেবারেই দেন না তা নয়, কিন্তু যতক্ষণ না দিয়ে পারেন। যখন দেখেন ভক্ত কিছুতেই অন্য কিছু নিচ্ছে না, তখন অগত্যা ভক্তি দেন। শিশুকে ভুলাবার জন্য মা চুষিকাঠি হাতে দেন। শিশু চুষিকাঠি চুষে দেখে যে এতে সার বস্তু কিছু নেই, তখন তা ফেলে দিয়ে কাঁদতে থাকে। যখন কিছুতেই থামে না, তখন মা তাকে স্বরূপোত্থ স্তনদুগ্ধ দান করেন। গোবিন্দও জীবসন্তানকে মায়ার বৈভব চুষিকাঠি দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন। কোন ভাগ্যবান যখন বুঝতে পারে এ মায়ার বৈভবে কোন আনন্দ নেই, তখন আর সে মায়ার বৈভবে ভোলে না। গোবিন্দ যখন ভাল করে বুঝে নেন, একে মায়ার বৈভব দিয়ে আর ভোলান যাবে না তখন তাকে নিজ পাদপদ্মে প্রেম-মধু লীলারস আস্বাদন দান করবেন। প্রেমদাতৃত্ব কৃষ্ণে আছে বটে কিন্তু নিত্যপরিকরে সেটি সীমাবদ্ধ। প্রেমদাতৃত্বের বেশী সুনাম গৌরে।

কৃষ্ণের রূপই তো ভুবনমোহন। তার থেকে বেশী রূপ আবার কেমন করে সম্ভব? ব্রজে ছিলেন কাঁচা কৃষ্ণ আর নদেয় হলেন বিশেষ কৃষ্ণ। কৃষ্ণ রূপ ছাড়া বাজারে আর রূপ নেই। এই কৃষ্ণরূপের পাশাপাশি আর একটি রূপ আছে সেটি হল রাধারূপ। এই রাধারূপ কৃষ্ণকেও মুগ্ধ করে। কৃষ্ণরূপ—রাধারূপ কেউই কম নয়। কৃষ্ণরূপ দেখতে দেখতে রাধা মুগ্ধ হন, অর্থাৎ কৃষ্ণরূপের কাছে রাধা পরাজয় স্বীকার করেন। আবার রাধারূপ দেখতে দেখতে কৃষ্ণ মুগ্ধ হন, অর্থাৎ রাধারূপের কাছে কৃষ্ণ পরাজিত হচ্ছেন। ব্রজে কিন্তু এই হারজিতের মীমাংসা হয় নি। কৃষ্ণরূপের বলবত্তা কোথায়? রাধা যে সে রূপে মুগ্ধ হয়েছেন, এইটিই কৃষ্ণের বলবত্তা। আবার রাধারূপ কৃষ্ণকে মুগ্ধ করেছে। উদ্ধবজী বলেছেন :

> নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
> স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
> রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
> লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীনাম্॥
>
> —ভা. ১০।৪৭।৬০

গোপবালাদের প্রতি গোবিন্দের প্রেমের কি তুলনা আছে। শ্রীরাসোৎসবে তাঁদের কণ্ঠ, কৃষ্ণ গোপীপ্রেমের খরস্রোত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য, নিজে থেকে আলিঙ্গন করেছেন—এ অনুরাগের কণাও স্বয়ং লক্ষ্মী বা অন্য কোন দেববধূ লাভ করতে পারেন নি।

কৃষ্ণরূপ ও রাধারূপ জগতে দুটি অতুলনীয় রূপ। কৃষ্ণরূপ

বর্ণনায় শাস্ত্র মুখর হয়ে আছে। রাধারূপ বর্ণনার স্থান আর শাস্ত্রে নেই। রাধারূপসাগর এবং কৃষ্ণরূপসাগর দুই সাগর মিলে গৌর হয়েছে। দুই ভাই পৃথক পৃথক থাকলে বল কমে যায়, কিন্তু যখন একসঙ্গে থাকে তখন বল বাড়ে, তেমনি দুইরূপসাগর একীভূত হয়েছে গৌরস্বরূপে। তাই এই রূপের প্লাবনে জগৎ ভেসে গেছে। গৌরের রূপের বন্যা সীমা লঙ্ঘন করেছে—আবার প্রেমদান লীলাতেও গৌরের বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণ দাতা বটে, কিন্তু তাঁর দানে দোষ আছে। কারণ উপযুক্ত পাত্রে দান হয় নি—অন্তঃপুরে নিজ পরিকরের মাঝে দান হয়েছে। পতিতকে যদি কৃষ্ণ কৃপা করতেন তাহলে তাঁর দাতা নাম সার্থক হত। বিল্বমঙ্গলঠাকুর বললেন—লতাতে পর্যন্ত প্রেমদান করেছেন, কিন্তু সে তো বৃন্দাবনের লতা—এ লতা প্রেমময়ী লতা, এ লতা যে কি বস্তু তা তো দেখতে হবে। বৃন্দাবনের লতা আসলে লতা নয়—যাত্রায় লতা সেজে আছে, সবই রাধারাণীর নিজের স্বরূপ। বৃন্দাবনভূমি, শ্রীযমুনা, পশু-পক্ষী, বৃক্ষলতা পুষ্প পল্লবরূপে রাধা নিজেকে বিছিয়ে দিয়েছেন গোবিন্দসেবার জন্য। সাধারণ লতা যদি বৃন্দাবনের লতা হত, তাহলে ব্রহ্মা এবং উদ্ধবের মত ব্যক্তি সে লতা হবার জন্য প্রার্থনা জানাতেন না এবং তা হতে পারলে নিজের সৌভাগ্য বলে মনে করতেন না। বৃন্দাবনভূমি ব্রহ্মার সৃষ্টির বাইরে, তাই তো ব্রহ্মার এত কাতর প্রার্থনা—যদি নিজের সৃষ্টি হত তাহলে তো আর প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল না। বৃন্দাবনের সবই ব্যাপক রাধা! কৃষ্ণ যে বৃন্দাবনের লতাতে প্রেমদান করেছেন—এ হল যাত্রার

দান, ঘরে ঘরে দান—সম্পত্তি যার তারই রইল। তার কিছু হানি হল না। পতিতকে যদি দান করা যায় তাহলে সেই দানেরই মর্যাদা। কাজেই দান কাজটি কৃষ্ণস্বরূপে অনভিব্যক্ত—ভাল করে ফোটে নি; একান্ত পতিত যখন রাধাপ্রেমে নাচবে তখনই না দান সম্পূর্ণ হবে। এ দান সম্পূর্ণ হয়েছে গৌরস্বরূপে। গৌরস্বরূপে কেমন করে সম্ভব হল? ভগবান যেমন অনাদি-সিদ্ধ ভক্তও তেমনি অনাদিসিদ্ধ। ঠাকুরমশাই বলেছেন:

নিতাইএর চরণ সত্য—তাঁহার সেবক নিত্য

বিদুর প্রশ্ন করেছেন মৈত্রেয় ঋষিকে—মহাপ্রলয়ে ছত্র-চামর ভগবানের ধরে থাকে কে? অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে সেবা করে কে? প্রলয়ের ওপরে আর কোন বিপদ নেই, কিন্তু তখনও ভক্তের চ্যুতি হয় না। তাই ভগবানের নাম অচ্যুত, কারণ ভগবানের চ্যুতি নেই—এ কথা খুব বড় কথা নয়, কিন্তু ভগবানের ভক্তের চ্যুতি নেই বলেই ভগবানকে অচ্যুত বলা হয়। তা'হলে দেখা যাচ্ছে যেমন ভগবান সেব্য, নিত্য, তেমনি সেবক নিত্য। তার মানে হল প্রেম নিত্য আছে—ভগবান, ভক্ত এবং প্রেম—এই তিনে নিয়ে সংসার, যেমন মাতা, পিতা এবং সন্তান—এই তিনটি নিয়ে সংসার পূর্ণ হয়। সন্তান যেমন মাতা বা পিতা কারো একার নয়—দুইএর মিলনে সন্তানের উৎপত্তি, প্রেমসন্তানও তেমনি অনাদিসিদ্ধ—এও তেমনি। ভগবান বা ভক্ত কারো একার নয়—ভক্ত ও ভগবানের মিলনে প্রেমের উৎপত্তি। মাতা এবং পিতা উভয়েরই সন্তান, তবু যেমন সন্তান মাকেই বেশী ভালবাসে, তেমনি ভগবান এবং ভক্ত উভয়ের মিলনে প্রেম-

সন্তানের জন্ম হলেও প্রেম ভক্তাবলম্বী। প্রেম ভগবানকে স্পর্শ করে মাত্র, কিন্তু নিত্যসিদ্ধ পরিকরকে আশ্রয় করেই প্রেম বেঁচে থাকে। পিতা ভগবান, মাতা ভক্ত এবং সন্তান হল প্রেম।

শ্রীগোবিন্দের চিরকালের প্রতিজ্ঞা আছে
'আমি চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।
এই ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥

ঘরে ধরে দানে গোবিন্দের নাম হয় নি। গোবিন্দ তাই এবারে সঙ্কল্প করেছেন পতিত জীবকে প্রেমদান করবেন। গরীবকে খাওয়াতে পারলে তবে তো খাওয়ানোর গৌরব। কিন্তু প্রেম তো গোবিন্দের একার নয়। তিনি তো মায়ের অনুমতি ছাড়া সন্তানকে দান করতে পারেন না। মাকে অনুনয় করতে হবে দানের জন্য। যেমন হাড়াই পণ্ডিতের কাছে তাঁদের একমাত্র সন্তান নিত্যানন্দকে (কুবের) ভিক্ষা করেছেন। শঙ্করারণ্য সন্ন্যাসী, কিন্তু হাড়াই পণ্ডিত একা তো তাঁকে দিতে পারেন না ; কারণ ছেলে তো তাঁর একার নয়। তাই মা পদ্মাবতীর অনুমতি চাইলেন। মা সন্ন্যাসীর ভিক্ষা এবং স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুক চেপে পুত্রদানের অনুমতি দিলেন। ঠাকুরাণী হলেন ভক্তশ্রেষ্ঠ, ঠাকুরাণীর অনুমোদন পেলে তবে গোবিন্দ প্রেমদান করতে পারেন। যে আধারে প্রেম থাকবে তাকে রাধারাণীর মত করে নেবে। লৌহপাত্র যেমন পরশমণি বহন করে না, পরশমণির স্পর্শে লোহার স্বরূপ আর লোহা থাকে না, সে সোনা হয়ে যায়, তেমনি প্রেম স্পর্শমণির স্পর্শে কৃষ্ণও গৌর হয়ে যাবেন। কৃষ্ণ

আর কৃষ্ণ থাকবেন না—কৃষ্ণ-আধার যদি প্রেমস্পর্শমণি বহন করে, তাহলে প্রেম স্পর্শমণির ভাণ্ডারী রাধারাণীর স্বরূপই কৃষ্ণ পাবেন—তাঁর নিজের স্বরূপ আর থাকবে না, অর্থাৎ কৃষ্ণ রাধা হবেন, অর্থাৎ গৌর হবেন। প্রেমদান লীলাব পরিপূর্তি গৌরে। অতএব শ্রীজীবপাদ যে গৌর অবতার সম্বন্ধে বললেন--'শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ অয়ং গৌরঃ'--এ কথাটি বড় সুন্দর। জল যদি সীমাবদ্ধ থাকে তা'হলে দানে কার্পণ্য থাকে, কিন্তু প্লাবন এলে ভেসে যায়। গৌরস্বরূপে রূপের এবং প্রেমের সাগরে বান ডেকেছে তাই বাধ ভেঙে গেছে, জগৎকে ভাসিয়ে নিয়েছে। গৌররূপের এমনই বন্যা যে তা জগন্নাথকেও বিস্মিত করেছে। ব্রজলীলায় রাধা কৃষ্ণের রূপে ও নটনমাধুরীতে মুগ্ধ হয়েছেন, আবার কৃষ্ণচন্দ্র রাধার রূপে এবং নটনমাধুরীতে মুগ্ধ হয়েছেন—দু'জনে দু'জনের নাচ দেখেছেন ও মুগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু যুগলে একসঙ্গে নাচলে কি মাধুরী হয় তা তাঁরা দেখেননি। যুগলের নটনমাধুরী উপভোগ করেছেন সখী ও মঞ্জরীর দল। আজ গৌরস্বরূপে যুগলের নটনমাধুরী দেখে জগন্নাথ (কৃষ্ণ) বিস্মিত হয়েছেন। গৌরস্বরূপে কৃষ্ণের সে বাসনা পূরণ হয়েছে। জগন্নাথ যুগল নটনমাধুরী গৌরে দর্শন করে পথে যেতে যেতে রথের ওপর বিস্মিত হয়ে থেমে গেছেন, কারণ গৌরস্বরূপে যুগলনটনমাধুরী অব্যভিচারে রয়েছে। এই গৌরস্বরূপের বৈশিষ্ট্য বুঝাতে গিয়ে যোগীন্দ্র বললেন :

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।

শ্রীজীবপাদ বলেছেন—বিশেষণ দিয়ে 'কৃষ্ণবর্ণং' শ্লোকে

গৌরসুন্দরকে বলা হয়েছে। 'কৃষ্ণবর্ণম্' এই শব্দের দ্বারা বুঝাচ্ছে —কৃষ্ণ দুটি অক্ষর যাঁর নামে আছে। তার প্রয়োজন কি? তিনি যে কৃষ্ণ এটি বুঝাবার জন্য। অন্য কোন নামে কি এ রকম প্রমাণ আছে? আছে। রুক্মী শব্দেব অর্থ লক্ষ্মী, তাই বুঝা গেল রুক্মিণী মানে লক্ষ্মী।

নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই॥

অথবা কৃষ্ণকে যিনি বর্ণনা করেন—কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে, অর্থাৎ কৃষ্ণ গান যিনি সর্বদা করেন। শুধু গান করেন না, 'তাদৃশস্বপরমানন্দবিলাসস্মরণোল্লাসবশতয়া স্বয়ং গায়তি পরমকারুণিকতয়া চ সর্বেভ্যোঽপি লোকেভ্য স্তমেবোপদিশতি যস্তম্।' এখানে 'তাদৃশ' শব্দের অর্থ কি? 'তাদৃশ' অর্থে সেই প্রকার। কোন প্রকার? সেই প্রকার বললে তো অধরা বস্তু হল নিজ পরমানন্দ বিলাসস্মরণের উল্লাসবশে গান করেন। তাদৃশ কি? মাদনাখ্য মহাভাববতী রাধা আর রসরাজ কৃষ্ণ দুজনের মিলনে যে পরমানন্দ তার স্মরণের উল্লাস। শ্রীউজ্জ্বলে লক্ষণ আছে—পূর্বরাগ থেকে আরম্ভ করে সম্ভোগসমৃদ্ধিমান পর্যন্ত সর্বভাব যেখানে যুগপৎ বর্তমান, তাকেই মাদনাখ্য মহাভাব বলা হয়। সকল ভাবের সার হল মাদনাখ্য মহাভাব। এ ভাব শুধু রাধাতেই বিরাজমান। এই মাদনাখ্যমহাভাববতী রাধারাণীকে দর্শন করে কৃষ্ণ যে আনন্দ পান, সেই আনন্দকে উল্লেখ করে গোস্বামিপাদ বললেন—'তাদৃশ' আনন্দ স্মরণে উল্লাস। এই

মাদনাখ্য মহাভাব রাধা ছাড়া অন্য কোথাও যায় না—'কৃষ্ণের যতেক বাঞ্ছা রাধাতেই রহে'—

কথা আছে ঋণে শুচি—কে কি রকম শুদ্ধচিত্ত, ঋণশোধে বুঝা যায়। যে ঋণ শোধ করে সে শুদ্ধচিত্ত, আর যে ঋণ শোধ করে না সে শুদ্ধচিত্ত নয়। গোবিন্দ কোথাও ঋণ রাখেন না। মাদনাখ্য মহাভাববতী রাধারাণীর ঋণের পরিশোধ করা কিন্তু গোবিন্দের পক্ষে সম্ভব হল না। যে রসে দিয়ে যে গোবিন্দকে যেমনভাবে ভজছে, গোবিন্দ সেই রসে তেমনি ভাবে তাকে ভজলে তবে তো প্রতিদান দেওয়া হল। কিন্তু মাদনাখ্য মহাভাবময়ী রাধা—এ ভাব একমাত্র রাধাতেই আছে। এ মাদনাখ্য মহাভাব তো গোবিন্দ পান নি, কাজেই তিনি কেমন করে রাধারাণীর ভজনের প্রতিদান দেবেন? সেইজন্য কৃষ্ণের পক্ষেও ঋণ শোধ করা সম্ভব হল না—'ঋণী হতে হয় ভাগবতে কয়।' গোপী মহাজন, কৃষ্ণ খাতক। রাধা প্রভৃতি ব্রজরামা বললেন—'আচ্ছা, আজই শোধ করতে না পার, সময় নাও।' কৃষ্ণ বললেন, 'সময় নিয়েও লাভ নেই—দেবতাদের পরিমিত পরমায়ু পেলেও এ ঋণ শোধ করতে পারব না। শুধু সময় নিলেই তো হবে না—ঋণশোধের মাল তো চাই, আমার তো মাল নেই। তাই সময় পেলে কি হবে?' দেনা যখন খাতক শোধ করতে পারে না, তখন মহাজন আবার ঋণ দিয়ে ব্যবসা চালু করিয়ে তার কাছ থেকে আগেকার ঋণ শোধ করিয়ে নেন। এখানেও গোপী মহাজন, কৃষ্ণ খাতককে বললেন—যদি ঋণ শোধ করতে না-ই পার তাহলে আবার ঋণ নাও। পতিতের কাছে

আচণ্ডালে কৃষ্ণ নাম দাও তবে তোমার ঋণ শোধ হবে। কৃষ্ণ যে ঋণ নিয়েছেন—তার চিহ্ন দিয়ে দিয়েছেন রাধারাণী তাঁর ভাব ও কান্তি দিয়ে। ঋণের চিহ্ন ছাপ দিয়েছে—কৃষ্ণ নিজে আজ কৃষ্ণ বলে কাঁদেন। এইটিই 'তাদৃশ' শব্দের অর্থ। সেই স্মরণোল্লাসে গৌরঃ গায়তি। মাদনাখ্য মহাভাববতী রাধার ঋণ শোধ করতে হলে গোবিন্দেরও মাদনাখ্য মহাভাব চাই। তাই রাধার ভাবকান্তি নিয়ে শোধ করলেন। রাধার ভাবকান্তি ভিক্ষা করে পান নি বলে চুরি করেছেন। গোবিন্দের চুরি করা অভ্যাস আছে; চুরি করা তাঁর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে—পূতনার প্রাণ চুরি থেকে চুরির আরম্ভ। যে শিশুকাল থেকে চুরি করতে আরম্ভ করেছে, যার চোর অপবাদ আছে, সে যদি কোনও রকমে সাধুর সাধুত্ব কোনও দিন চুরি করতে পারে, তাহলে তার এত দিনের চোর অপবাদ সব ঢেকে যায়। তেমনি গোবিন্দের এত দিনের চুরির অপবাদ আজ রাধারাণীর ভাবকান্তি চুরি করায় ঢেকে গেল। গোবিন্দ আজ গৌর হওয়ায় তাঁর সব অপবাদ ঢেকে গেল। কৃষ্ণ যিনি বর্ণনা করেন এবং করান। পরম করুণা পরবশ হয়ে বর্ণনা করান। অথবা তিনি অকৃষ্ণ, অর্থাৎ গৌর কিন্তু ত্বিষা, অর্থাৎ কান্তির দ্বারা কৃষ্ণ উপদেষ্টা। অর্থাৎ যে গৌর দেখে সে কৃষ্ণ বলে কাঁদে। কৃষ্ণ অঙ্গ দর্শনে কোন কিছু কাজ হয় না—কারণ কৃষ্ণ আনন্দময় হলেও গা বেঁধে যান, নিজের স্বরূপকে (আনন্দময়) আবৃত করে যান।

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ। গীতা ৭।২৫

কংস, শিশুপাল কৃষ্ণকে দর্শন করেছেন কিন্তু তাঁর আনন্দময়

স্বরূপকে ভোগ করতে পারেন নি। কৃষ্ণস্বরূপ আবৃত, কিন্তু রাধাস্বরূপ আবৃত নয়। রাধারাণী শক্তি—শক্তি সর্বদা উলঙ্গ, অনাবৃত। শক্তিমান উলঙ্গ নয়, আবৃত। শক্তির ওপরে যদি আবরণ পড়ে তাহলেই অসুবিধা হয়। গোপবালাদের বস্ত্রহরণে তাই দোষ হয় নি, গোপবালারা শক্তি, অনাবৃতত্বই তো তাদের স্বরূপ। রাধারাণী কৃষ্ণের শক্তি, তাই তাঁর স্বরূপে কোন আবরণ নেই। এই রাধার আবরণে শ্যাম আবৃত। এই শ্যামেরই নাম গৌর। রাধা আধার, শ্যাম আধেয়। শ্যাম এবং রাধা এমন ভিয়ানে গৌর হয়েছেন—যে শ্যাম থেকে রাধাকে পৃথক করা যাচ্ছে না। শ্যামের ওপরে রাধার আবরণ—এই রাধাস্বরূপ জীব সহজে গ্রহণ করতে পারবে; কারণ সজাতীয়তা আছে। হ্লাদিনী শক্তি রাধা আর হ্লাদিনীর বৃত্তি জীব। তাই জীব যত সহজে রাধাস্বরূপ গ্রহণ করতে পারে এমন শ্যামস্বরূপ পারে না। গৌরের অঙ্গকান্তি কাজ করেছে—অঙ্গকান্তি আঠার মত জড়িয়ে ধরেছে। কান্তি যেন কথা বলল। শরীরের অঙ্গ হস্ত পদাদি, উপাঙ্গ হল নেত্রাদি—এরাই কলির যুগাবতারের অস্ত্র, অসুরবিনাশ কাজ যা দিয়ে হয়। আর পার্ষদ বলা হয় যারা কাছে থাকে, গৌর মানুষের অসুর ভাব বিনাশ করেন, অঙ্গ হলেন —নিতাই, অদ্বৈত, গদাধর। উপাঙ্গ শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্ত। বিষ্ণুধর্মোত্তরগ্রন্থে বলা হয়েছে—'প্রত্যক্ষরূপধৃক্ দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।' অবিশ্বাসীর কাছে শাস্ত্র মিথ্যা, বিশ্বাসীর কাছে সত্য। অপ্রকট লীলাতেও নারদ দ্বারকায় কৃষ্ণকে দর্শন করেছেন 'কোনও কোনও ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।' এ

বাক্যের যাথার্থ্য দেখিয়েছেন। ভগবান নারদকে বললেন—'কি করব নারদ, শাস্ত্র তো কলিযুগে আমাকে যেতে বারণ করেছে।' নারদ জীবের দুর্গতি দেখে কৃপালু হয়ে বললেন—'ভগবান হয়ে তোমাকে যেতে শাস্ত্র নিষেধ করেছে ঠিকই, কিন্তু ভগবান হয়ে যাবার দরকার নেই—ঢাকা দিয়ে চল।' গোবিন্দ ভাবলেন এই সুযোগে গৌর হব, রাধার প্রেম আস্বাদন করতে যাব, ঋণ শোধ করতে যাব, প্রেমদান করতে যাব। নারদ বললেন—'প্রভু, তুমি তো প্রেম আস্বাদন করতে যাবে, তাহলে আমরা কি তোমার সঙ্গসুখে বঞ্চিত হব?' ভগবান বললেন 'না, নারদ—তুমি আমার সঙ্গছাড়া হবে কেন? তুমি শ্রীবাসরূপে থাকবে।' যোগীন্দ্র বললেন—যারা সুমেধা তারাই নামযজ্ঞের দ্বারা যুগাবতারের আরাধনা করবে। ভক্তির অন্য অঙ্গও থাকবে, কিন্তু কীর্তনই প্রধান হবে—আরাধনা কিন্তু হবে শ্রীগৌর সুন্দরেরই।

পতিতপাবন সুদুর্লভ প্রেমদাতা শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর কলিযুগে আবির্ভূত হয়েছেন বলে কলিজীব এবং কলিযুগ দু'জনেই তাঁকে পেল। কাজেই গৌরভগবানের মধ্যে সব অবতারই মিলিত হয়েছেন। অন্যান্য অবতারের কাজ একা গৌরের দ্বারাই সিদ্ধ হয়েছে। রাধাকৃষ্ণ মিলিত মূরতি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। রাধা যত ঘন করে কৃষ্ণকে ভেবেছেন এমন করে আর কেউ ভাবে নি। গোবিন্দ সুখী হবেন এই ভাবনা রাধার। গোবিন্দভাবনায় রাধা তন্ময়। রাধারাণী ধ্যানে এমন করেই কৃষ্ণকে ভেবেছেন যে সম্মুখের দর্পণে রাধার শ্রীমুখের জায়গায় কৃষ্ণবদন প্রতিবিম্বিত

হয়েছে। এই ধ্যানেতেই রাধা কৃষ্ণ হয়েছেন, আবার কৃষ্ণ এই ধ্যানেতে রাধা হয়েছেন। রাধা গোবিন্দ ভাবতে ভাবতে গোবিন্দ হয়েছেন। সেই গোবিন্দ বিবর্ত গোবিন্দ—তাব 'গো' নেওয়া হয়েছে, আবার গোবিন্দ রাধা ভাবতে ভাবতে বাধা হয়েছেন। সেই বিবর্ত রাধার 'রা'—এই দুই-এ মিলে নাম গোবা। প্রথম যে গোবিন্দের 'গো' তিনি আসলে রাধাভাবে গোবিন্দ. আবার যে রাধাব 'রা' তিনি আসলে গোবিন্দভাবে বাধা। 'গোরা' নামে বাধাগোবিন্দ মূর্তিমান—অক্ষর মূর্তিমান। গৌরস্বরূপে এই ভোগ-বিবর্তমিলন—এরই নাম বিবর্তবিলাস। সেই পর-মানন্দস্মরণস্বরূপ গোবাব সেই স্বরূপের ভোগ, সেই ভোগে নিজেব আনন্দে গান, অতি ভোজনে আপনি যেমন উদ্গার ওঠে। আবার শুধু নিজে গান কবে তৃপ্তি হচ্ছে না, পরম করুণা করে অন্যকে দিয়ে বর্ণনা করাচ্ছেন। অনাদিকালের বিমুখ জীব, কৃষ্ণ বলবে না, হাতে পায়ে ধরে, গললগ্নীকৃতবাসে তাদের কৃষ্ণ বলাচ্ছেন। শ্রীজীবপাদ বলেছেন—'অথবা স্বয়মকৃষ্ণং গৌবং ত্বিষা স্বশোভা বিশেষেণৈব কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ। যদ্দর্শনেনৈব সর্বেষাং কৃষ্ণঃ স্ফুরতি।' অর্থাৎ গৌর দেখলেই কৃষ্ণ বলতে ইচ্ছা করে। অখিললোকসাক্ষী গৌর, কিন্তু মহাজন বলেছেন যার যেমন ভাব সে তেমনি দেখে। পদকর্তা বলেছেন :

কোই কহত গোরা জানকীবল্লভ
শ্রীরাধার প্রিয় পাঁচবাণ।
(ঠাকুর) নরহরির মনে আন নাহিক জানে
আমার গদাধরের প্রাণ॥

ঠাকুর নয়নানন্দ বলছেন—আমি অনুমানের ধার ধারি না, আমি যা দেখি তাই তো বলি—গৌরে শ্রীকৃষ্ণরূপেরই প্রকাশ। 'তস্যৈবাবির্ভাববিশেষঃ', বিশেষ কেন? কিছু বিশেষ আছে। কৃষ্ণ হলেন কাঁচারসের কৃষ্ণ; আর গৌরকৃষ্ণ হলেন পাকারসের কৃষ্ণ। নিবিড়তম অবস্থা গৌর—দুই খণ্ড গালা তাপসংযোগে এক হয়ে মিশে গেছে। মাতা ও পুত্র আলাদা আলাদা থাকে, কিন্তু বাৎসল্যরস দু'জনকে এক করে দেয়। মধুর রস তেমনি রাধাগোবিন্দের মিলন করিয়েছে। মধুর রসে রাধাগোবিন্দের মিলিত স্বরূপই গৌরস্বরূপ—এ মিলন নিত্যমিলন, রাধাগোবিন্দে-ও মধুর রসে মিলন। গৌরসুন্দরের অঙ্গ এবং উপাঙ্গই অস্ত্র এবং পার্ষদ—উপাঙ্গ মানে ভূষণ, অঙ্গই ভূষণ—তাঁর অন্য ভূষণের প্রয়োজন নেই। গৌরসুন্দরের এমনই প্রভাব, যে অন্য অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। অঙ্গই অস্ত্রের কাজ করেছে। মহাজনী পদ আছে ঃ

রামাদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে
অসুরেরে করিল সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিল প্রাণে কারে না মারিল
চিত্তশুদ্ধি করিল সবার॥

গৌর অবতারে অঙ্গই তাঁর পার্ষদ—পার্ষদ বলা হয় তাকে যে অত্যন্ত কাছে থাকে। অন্য কোন পার্ষদ নেই—গৌর একক চলেছেন। শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ বললেন ঃ

কলৌ সঙ্কীর্তন যজ্ঞে কৃষ্ণ আরাধন।
সেই সে সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥

বহুজনে মিলে কৃষ্ণগুণগান করার যে সুখাস্বাদন তারই নাম

সঙ্কীর্তন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্রিত জন যারা তারাই সঙ্কীর্তন করে। তাই গৌরসুন্দর সঙ্কীর্তনে সুখী। সঙ্কীর্তনই প্রতিপাদ্য বস্তু। গৌর-অবতারের সম্বন্ধে পদ আছে :

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তঃ শান্তিনিষ্ঠাপরায়ণঃ॥

পরম বিদ্বৎশিরোমণি সার্বভৌম ভট্টাচার্যও দেখিয়েছেন :

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

মহাপ্রভুর ঈশ্বরস্বরূপ, তাই সার্বভৌমের সাধ্বস আছে, অথচ সন্ন্যাসী গৌরে ঝোঁক আছে, গৌর দেখে দেখে মনে হচ্ছে তাহলে গোপীনাথ যা বলেছিল তাই না কি? বেদান্তের সিদ্ধান্ত গৌররূপে মূর্তিমান। ভট্টাচার্য প্রথমে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্তি দর্শন করলেন। পরে দেখলেন দ্বিভুজ মুরলীধর নবকিশোর নটবর। তারপর দেখলেন ষড়ভুজ মহাপ্রভু—অঙ্গকান্তি কিন্তু পীত—তাৎপর্য হল গৌর আমার সর্বাবতারী। ভট্টাচার্য বলেছেন 'গাঢ়ং গাঢ়ং'—একটি গাঢ় সুন্দর বস্তুতে সুন্দর-ভাবে চিত্ত আসক্ত হবে। আর দ্বিতীয় গাঢ়—চিত্তভৃঙ্গ চঞ্চল-স্বভাব। তার চাঞ্চল্য দূর করবার জন্য অপর গাঢ় পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। কলিযুগে যারা সুমেধা, অর্থাৎ শাস্ত্র থেকে অথবা সাধু-গুরুবৈষ্ণব মুখে জেনে যারা দৃঢ়নিশ্চয় করতে পেরেছে গৌরই কলিযুগের একমাত্র উপাস্য দেবতা, তারাই গৌর উপাসনা করবে—অন্যে নয়। এখন কৃষ্ণ বলতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—তা না হলে অর্থ-

সঙ্গতি হয় না। কারণ কলিযুগে তো কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন নি—কৃষ্ণই রাধাভাবকান্তি অঙ্গীকার করে গৌররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

যে কলিতে গৌর আবির্ভাব এবং যে কলিতে অন্য পীতবর্ণ যুগাবতারের আবির্ভাব—এই দুই কলি আলাদা। গৌর ভগবানই সন্ন্যাসী হয়েছেন, অন্য কোন ভগবান সন্ন্যাসী হন নি। কারণ সন্ন্যাস না হলে রাধাপ্রেম ভোগ করা যাবে না। রাধাপ্রেম শব্দের তাৎপর্য হল—কৃষ্ণের জন্য যে প্রেম, অর্থাৎ ভালবাসা আছে। এ ভালবাসা লোক দেখিয়ে বাইরে প্রকাশের নয়, গোপনে গোপনে ভালবাসা। বাইরে প্রকাশ করলে বাদিনীর ভয় আছে। কুতুকী কৃষ্ণ রাধার এই গোপন ভালবাসা ভোগ করতে চান। তা না হলে রাধাকে ভালবেসে কৃষ্ণের যে সুখ তা তো কৃষ্ণের আছেই, কিন্তু কৃষ্ণ শুধু তাতে সন্তুষ্ট নন। রাধার হৃদয়ের কৃষ্ণপ্রেম—এ তো বাইরের জিনিস নয় যে হাতে তুলে নেবেন—এ হৃদয়ের জিনিস। কৃষ্ণের পক্ষে পাওয়ার উপায় কি? রাধাভাব অঙ্গীকার করা ছাড়া উপায় নেই। কৃষ্ণ তাই অনেক চেষ্টা করে, রাধা হয়েছেন। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ প্রার্থনা করেছেন—চৈতন্যাকৃতি যে দেব, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আমাদের অতিশয় কৃপা করুন। কৃষ্ণ শুধু কৃপা করেছেন। কিন্তু কলিযুগে চৈতন্যদেব অতিশয় কৃপা না করলে আমাদের উদ্ধারের কোন উপায় নেই। জিনিস হাল্কা হলে তোলা সহজ, কিন্তু ভারী হলে তোলা কঠিন। কারণ সেও তখন তাকে আকর্ষণ করে। আমরা কলিজীব ভবসাগরে আসক্তির সাগরে, পাপের সাগরে, পাপের

ভারে এমন করে ডুবেছি যে এখানে শুধু কৃপায় উদ্ধার হবে না, অতিশয় কৃপা চাই।

গোবিন্দ এমন ঘন করে রাধারাণীকে ভেবেছেন, অর্থাৎ পরকীয়াকে ভেবেছেন যে তাঁর স্বকীয় কৃপণতা স্বভাব সরে গেছে, যদিও তত্ত্বতঃ রাধারাণী কৃষ্ণের শক্তি, পরকীয়া নন— সম্পূর্ণ স্বকীয়া, কিন্তু বিধানে লোকসমাজে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ তো বলতে পারবেন না যে রাধা আমার। সে দিক দিয়ে রাধা গোবিন্দের পরকীয়া—তাই শ্রীগোবিন্দ আজ ভগবৎস্বরূপে নয়, ভক্তস্বরূপে আবির্ভূত হলেন। জীবের দুঃখ ভক্ত যত বোঝে ভগবান তত বুঝতে পারেন না। ভক্ত জীবের দুঃখ দেখতে পারেন না। ভগবান গৌররূপে ভক্তরূপে এসে প্রেমরত্ন কলিজীবকে আচণ্ডালে দান করলেন। এ দান না পেলে কলির জীবের গতি ছিল না। কলিযুগে অন্য কোন উপাস্য নেই। শাস্ত্রযুক্তিতে, বিচারে গৌর উপাসনাই কলিযুগের একমাত্র উপাসনা। সত্যযুগের তপস্যা, ত্রেতাযুগের যাগযজ্ঞ। দ্বাপরযুগের অর্চনা দামী সাধন হলেও কলিযুগের বাজারে সে মুদ্রা অচল, যেমন বাদশাহী আমলের টাকা এখন আর বাজারে চলে না। কলিযুগে হরিনামসঙ্কীর্তনই একমাত্র বাজারের চল মুদ্রা। শ্রীশুকদেব এই কলির প্রশংসা করেছেন। গৌর-উপাসনা করলে অন্যান্যযুগে যা লাভ হত তা তো লাভ হবেই, আরও বেশী লাভ হবে ভগবানে প্রেম। কলিযুগে আর অন্য ধর্মের প্রয়োজন নেই, তাতেই সব পাওয়া যাবে। কলিযুগের একমাত্র উপাস্য গৌর। তাঁর সেবার একমাত্র উপচার হল হরি-

সঙ্কীর্তন। কলিতে সব ধর্মই চলছে—সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, পাশুপত, শৈব কিন্তু মজা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন মত অবলম্বন করলেও সকলেই জানে যে কলিতে হরিনাম সঙ্কীর্তন ছাড়া মুক্তি নেই। মায়ের (কালী, দুর্গা প্রভৃতি) বা বাবার (আশুতোষ) যে কোন উপাসনা করলেওহরিনামকরতেই হবে। আর হরিসঙ্কীর্তন করতে গেলেই এই কীর্তন যাঁরা দিয়েছেন, কৃতজ্ঞতায় ভরপূর হয়ে তাঁদের নামও করতেই হবে। যেমন ক্ষেতে ধান, যব, গম, কলাই ছোলা, আলু, পটোল যে যে ফসলই ফলাক না কেন সকলেরই যেমন এক সুবৃষ্টিরূপ কারণের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেই হয় তেমনি সব উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন ফসল হতে পারে, কিন্তু গৌরের প্রেমবন্যাবর্ষণকে সকলেরই অপেক্ষা করতে হবে। তাঁর প্রেমের সুবৃষ্টি হলে তবে যে যে ফসল ইচ্ছা ফলাতে পারে। বৃষ্টি মেঘ থেকে আসে। এই প্রেমবর্ষণও গৌরমেঘ থেকে আসবে। কলি-যুগে গৌরমেঘই হল সেই মেঘ। আমরা যাকে কৃপা মনে করি তা ঠিক কৃপা নয়, যেমন মায়ের মন্দিরের কাছে যেতেই মায়ের মন্দিরের দ্বার খুলে গেল। আমরা তাকেই কৃপা মনে করি। এটি কৃপা সত্য, কিন্তু শুধু এইটুকুতে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না—আরও পেতে হবে। এই ভারতের মাটিতে বসে মায়ের সঙ্গে ছেলের মত কথা বলেছেন, খেলা করেছেন, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরম-হংসদেব—সাধকভক্ত শ্রীরামপ্রসাদ মাকে দিয়ে বেড়া বেঁধে নিয়েছেন ; তেমনি করে মায়ের সঙ্গ পেতে হবে। তবে তো সম্পূর্ণ কৃপা পাওয়া হল।

গৌরহরি ছাড়া এমন উত্তম এবং মিষ্টি মাধুর্যমণ্ডিত

ভগবান আর নেই। লীলামাধুর্য, বেণুমাধুর্য, রূপমাধুর্য এবং প্রেমমাধুর্য—এই চারটি গুণে শ্রীগোবিন্দ অন্যান্য ভগবৎস্বরূপ হতে উৎকৃষ্ট—এই চারিটি গুণের সমতা বা আধিক্য অন্য কোথাও নেই। গৌরস্বরূপে সেই গোবিন্দ তো আছেনই, আবার শুধু তিনি একা নন, তিনি নিজ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন 'কিশোরীদাস মুই পীতবাস'। তাই শ্রীগোবিন্দ অপেক্ষা রাধার মহিমা আরও বেশী। তাহলে জীব কাকে ভজবে? রাধাকৃষ্ণ দু'জনেই উপাস্য, দু'জনকে উপাসনা করলে তবে সম্পূর্ণ পাওয়া যাবে। এই রাধাগোবিন্দের আবার কাঁচা-পাকা অবস্থা আছে। রাধার কৃষ্ণের প্রতি প্রেম কেমন এইটি জানবার জন্য কৃষ্ণের অভিলাষ। সকল রসের মধ্যে মধুর রস সবচেয়ে উত্তম। আবার মধুর রস কোন অবস্থায় বেশী উত্তম? মিলনে না বিরহে? রস-বিচারক বলেন বিপ্রলম্ভ, অর্থাৎ বিরহ ছাড়া মিলনের সুখাস্বাদন হয় না। বিরহ থাকলে তবে মিলন সুন্দর, কিন্তু মিলিত অবস্থায় যদি বিরহ থাকে তবে সেই মিলনই সবচেয়ে সুন্দর। শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপ এই মিলনে বিরহের স্বরূপ। শ্রীপাদ রামদাস বাবাজীমহারাজের বাণী ঃ

নিত্যমিলনে নিত্যবিরহ—মধুর গৌরাঙ্গ দেহ।

এই স্বরূপই রসের চরম অবস্থা তাই বিচার অনুসারেও সকলের একমাত্র গৌর-উপাসনা করাই কর্তব্য।

শ্রীকরভাজন ঋষি যে কলিযুগের উপাস্য দেবতা শ্রীগৌরসুন্দরের উপাসনার বিধান দিলেন—'যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তন প্রায়ৈঃ' এখানে 'প্রায়' শব্দের দ্বারা অন্যান্য ভক্তি অঙ্গকে,

শ্রবণাদিকে রক্ষা করা হল। অর্থাৎ কলিযুগের উপাস্য দেবতার উপাসনা করতে গেলে অন্যান্য যে কোন উপকরণ থাকে থাকুক কিন্তু প্রধান উপকরণ সঙ্কীর্তন। যোগীন্দ্র এ বিধান দিয়েছেন —কাজেই এ বিধানের নড়চড় নেই।

সর্বশাস্ত্রমুকুটমণি শ্রীমদ্ভাগবত কলিযুগের উপাস্য দেবতা সম্বন্ধে উপদেশ করতে গিয়ে বললেন,—গৌর পীত (অকৃষ্ণ) এবং তিনি কৃষ্ণ বর্ণনা করেন। কৃষ্ণ আজ নিজে কৃষ্ণ বর্ণনা করেন। গৌরভগবান শুধু বৈষ্ণবের ভগবান নন, তিনি কলিযুগের অবতার, অর্থাৎ কলিযুগের সকল কলিজীবের উপাস্য। শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব সকলের উপাস্য। সকলের প্রাণের ঠাকুর। কলিজীব সকলেই গৌরনাম করবে—তবে কেউ কম কেউ বেশী। এই গৌর-পূজার উপকরণ কি? তুলসীচন্দন তাঁর শ্রীচরণে দিলে আপত্তি নেই, কিন্তু পূজার উপকরণ প্রধান হল সঙ্কীর্তন। এই আরাধন করবে যারা সুমেধা। সঙ্কীর্তনই কলিযুগের ধর্ম :

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

এই হরিনাম প্রচার করেছেন শ্রীমন্মহাপ্রভু। কলিযুগে বুদ্ধ ভগবানও আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু তিনি সঙ্কীর্তন প্রচার করেন নি। তাই তাঁকে যুগাবতার বলা যাবে না। হরিনাম যিনি দিলেন, সেই গৌরনাম ছাড়া হরিনাম করা যায় না। সুমেধা বা সুমেধার চরণাশ্রিত যারা তারাই গৌর আরাধনা করে।

যোগীন্দ্র-এর পরে ভগবান রামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে স্তুতি

করেছেন। ভগবান রামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র দু'জনেই ধ্যানের যোগ্য। সে সম্বন্ধে কাল-দেশ-নিয়মের বিধিগণ্ডি নেই। তাই গৌরসুন্দর ষড়্ভুজমূর্তিতে রামচন্দ্র এবং কৃষ্ণচন্দ্রকেই নিয়েছেন--অন্য কোন লীলাবতারকে নেন নি। রামচন্দ্র মর্যাদাপুরুষোত্তম, কৃষ্ণচন্দ্র লীলাপুরুষোত্তম আর গৌরসুন্দর হলেন প্রেমপুরুষোত্তম। রামচন্দ্র প্রথম প্রেমের সাধনার প্রকাশ। একটু একটু করে অগ্রগতি হতে হতে গৌর অবতারে সে সাধনা সে প্রেমের তপস্যা সম্পূর্ণ। লীলাবতারের মুখ্য কাজ নিজের আস্বাদন, সেটি সম্পূর্ণ করে জগতের কাজ করেন। আর যুগাবতারের মুখ্য কাজ হল জগতের উদ্ধার। রামচন্দ্র লীলাবতার তাই নিজ কার্যই তাঁর মুখ্য। প্রেমের তপস্যার বীজ উপ্ত হয়েছে রামচন্দ্রে—ক্রমে কৃষ্ণ-অবতারে তার অঙ্কুর বেরিয়েছে, আর গৌর-অবতারে সেই অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হয়ে ফল ফুলে সুশোভিত হয়েছে। কৃষ্ণ নিজে যখন পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করেন এবং জগতের সকলকে আস্বাদন করান তখনই তিনি প্রেমপুরুষোত্তম। বিদ্যার্থী যেমন একটির পর একটি শ্রেণীতে ওঠে তেমনি ভগবান রাম-অবতার থেকে ধাপে ধাপে প্রেমের শ্রেণীতে উঠেছেন। এখন এই প্রেম রোজগারের উপায় কি সাধকের পক্ষে? সাধককে প্রেম লাভ করতে হলে নিঃসঙ্গ হতে হবে--বিষয় ছাড়তে হবে। নিঃসঙ্গ শুধু এ জগতের স্ত্রী, পুত্র অর্থ, আত্মীয় স্বজন নয়—মান, যশ, লাভ পূজা, প্রতিষ্ঠা, পরকাল স্বর্গাদি পর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে। তবে হবে নিঃসঙ্গ। এ সাধনা, প্রেমের তপস্যা, ভগবানের আরম্ভ হল রামচন্দ্র অবতার থেকে। রামচন্দ্রের

কিছুরই অভাব ছিল না—তারপর প্রেমের সাধনায় নিঃসঙ্গ হবার জন্য একে একে পিতা, রাজ্য, এমন কি প্রাণপ্রিয়া জানকীকে পর্যন্ত ছাড়তে হল। লোকানুরঞ্জনের জন্য সীতাত্যাগ —এ কোন কথা নয়, কারণ ভগবানের পক্ষে লোকাপেক্ষা কতটুকু? ভগবান রামচন্দ্র ইচ্ছা করলেই প্রজার হৃদয়ের পরিবর্তন করতে পারতেন। কিন্তু করেন নি, কারণ সীতাত্যাগ না করলে প্রেমসাধনা হয় না, তাই ত্যাগ। এ ত্যাগে ব্যথা লাগে নি তা নয়, ব্যথায় বুক তাঁর ভেঙে গিয়েছিল। জনস্থানের অরণ্যে প্রতি তরুলতার কাছে সীতার নাম করে কত কেঁদেছেন, বলেছেন—'হে অযোধ্যাবাসী, এখানে আমি সীতার শোক সংবরণ করতে পারছি না। তার জন্য রোদন করছি বলে আমাকে স্ত্রী-বশ বলে মনে করো না। তোমরা আমাকে ক্ষমা করো।' রামচন্দ্র যে নিজে ভগবান এটি ভুল হয়ে গেছে। ভগবান মনে থাকলে আর প্রেম-আস্বাদন হবে না। কৃষ্ণের যদি মনে থাকে আমি কৃষ্ণ তাহলে আর কৃষ্ণ বলে কাঁদা হবে না। তাই নিজের স্বরূপটি ভুলতে হবে। এই ভুল প্রথম আরম্ভ হয়েছে রাম-অবতারে। এই ভুল সম্পূর্ণতা লাভ করেছে গৌর-অবতারে। তাই গৌর 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' বলে কেঁদে আকুল। রামচন্দ্র লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় সীতাকে ফিরিয়ে আনলেও রাখতে পারলেন না—আবার বিসর্জন দিতে হল। রামচন্দ্রের জানকীত্যাগ প্রেমের সাধনার জন্য—ত্যাগ না হলে প্রেমসাধনা হয় না। দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণ ভগবান—তাঁর প্রেমের সাধনায় রাধারাণী গোপবালাদের ত্যাগ করতে হয়েছে। ব্রজ ছেড়ে দ্বারকায় এসেছেন কৃষ্ণ, প্রেমের

ধ্যানে নিঃসঙ্গ তপস্বীর জীবন যাপন করেছেন। মহিষীগণ আছেন বটে, কিন্তু তাঁরা কৃষ্ণের মন ভরাতে পারেন নি, রাখতে হয় তাই রেখেছেন। তাঁর মনের ধ্যানে জেগে আছে ব্রজের গোপবালারা। বাইরে ত্যাগ করতে হয়েছে—তা না হলে প্রেমের সাধনা হবে না বলে। ব্রজত্যাগী দ্বারকার কৃষ্ণ রাধা-প্রেমের ঋষি। প্রেমের ধ্যানে নিমগ্ন দ্বারকার এই ঋষি পূর্ণ ঋষিত্ব লাভ করেছেন গৌরস্বরূপে। গৌরে প্রেম ধন্য। প্রেমের সাধনার চরম শ্রেণীতে উঠেছেন গৌর ভগবান—তাঁর প্রেমের ধ্যান, তপস্যা সম্পূর্ণ হয়েছে। গৌরসুন্দর দুবার বিয়ে করেছেন। তাঁর ত্যাগ শুধু বাইরের ত্যাগ নয়, মনেও ত্যাগ, সম্পূর্ণ ত্যাগ—সন্ন্যাস নিয়েছেন। রামচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রও ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু ফেরে পড়ে। মন থেকে তাঁদের ত্যাগ করতে পারেন নি—রামচন্দ্র সীতাদেবীকে এবং কৃষ্ণচন্দ্র রাধারাণীকে নিয়ত স্মরণ করেছেন, কিন্তু এ ত্যাগ পাকা ত্যাগ হয় নি। মনে ত্যাগ না হলে সাধন সম্পূর্ণ হয় না। গৌরের ত্যাগ সম্পূর্ণ ত্যাগ, সন্ন্যাস—পাকা ত্যাগ হয়েছে। সন্ন্যাসের পরে গৌরের রাধাপ্রেম আস্বাদন সম্পূর্ণ হয়েছে। ত্রেতায় রাম, দ্বাপরে শ্যাম—এই কলিতে গৌরাঙ্গ নাম যেন ধান চাল ভাত—ধান খাওয়া যায়—চাল তার চেয়ে একটু ভাল করে খাওয়া যায়, আর ভাত একেবারে সুপক্ক, সুন্দর আস্বাদন করা যায়। শ্রীশ্রীবৈষ্ণববন্দনায় বলা হল:

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপাময়।
সর্ব-অবতার সর্বভক্ত-জনাশ্রয়॥

গৌর আধারে রামকৃষ্ণ—তিনি সর্ব অবতারের আশ্রয়—যে অবতারে যত ভক্ত গৌর অবতারে সব এসে মিলেছে। যে ভগবান যত বেশী ভক্তকে আয়ত্তে রাখতে পারেন তাঁর ভগবত্তা তত বেশী। কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং ভগবান হলেও নিজ স্বরূপে থেকে রামনিষ্ঠ হনুমানজীকে আয়ত্তে আনতে পারেন নি। যদুনাথ ডাকছেন বলায় হনুমান গরুড়কে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু রঘুনাথ ডাকছেন বলায় হনুমানজী কাছে এসেছিলেন। তা'হলে কৃষ্ণকে রামরূপ ধারণ করে রুক্মিণী দেবীকে সীতা এবং বলদেবকে লক্ষ্মণ করে হনুমানের মন ভোলাতে হয়েছিল, কিন্তু সেই হনুমান গৌর অবতারে মুরারি গুপ্ত হয়ে এসেছেন। গৌরকে কিন্তু রামরূপ ধারণ করতে হয় নি, গৌররূপেই তিনি মুরারি গুপ্তের মন মজিয়েছেন। এইটিই গৌর-অবতারের বৈশিষ্ট্য। প্রহ্লাদের অবতার বিরিঞ্চি, শিব সকলেই গৌরপরিকররূপে এসেছেন—গৌরমাধুর্যে সকলেই লুব্ধ হয়েছেন। অন্য কোন অবতারই এ পর্যন্ত পরকীয়া রস আস্বাদন করতে পারেন নি। গৌর সেই পরকীয়া রস আস্বাদন তো করেছেনই উপরন্তু তাঁর মধ্যে যে সব অবতার আশ্রয় পেয়েছেন তাঁদেরও পরকীয়া রস আস্বাদন করিয়েছেন। এইটিই হল গৌরসুন্দরের অবতারগণের প্রতি দয়া। নিজ ভোগ্য তাঁদের ভোগ করিয়েছেন—এইটিই দয়ার চরম প্রকাশ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে অবতারগণ যে রস আস্বাদন করেছেন কেমন করে বুঝা গেল। গৌর-অবতারে কলির পতিত জীব পর্যন্ত পরকীয়া রস আস্বাদন করল, আর অবতার-গণ পাবেন এ আর কোন কথা। মহাজনের বাণী ঃ

ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি—
কবে বা ছিল এ রঙ্গ।

দ্বারকায় কৃষ্ণ রয়েছেন আর ব্রজে রয়েছেন গোপীরা—এতে প্রেম পুষ্ট হচ্ছে। দ্বারকায় ব্রজবিরহী কৃষ্ণ বাস করছেন—এ বাস গোবিন্দের বনবাস। সাধক ঘর ছেড়ে বনে যায়, রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্মযুগল ধ্যান করে। কৃষ্ণ ব্রজ ছেড়ে আজ দ্বারকায় এসেছেন। এটি তাঁর বনে আসাই হল। ধ্যান হল রাধা-প্রেমের স্বরূপ—রাধাপ্রেমের ধ্যানে কৃষ্ণ তন্ময়। প্রেমের বলবত্তায় কৃষ্ণে প্রেমের পাক ধরেছে, ব্রজে কাঁচা কৃষ্ণ, দ্বারকায় প্রেমের পাকের বরণ ধরেছে। ফল প্রথমে কাঁচা থাকে, তার পর পাকের বরণ ধরে, পরে সুপক্ক হলে বোঁটা থেকে খসে পড়ে মাটিতে। দ্বারকায় প্রেমে পাক ধরতে ধরতে যখন সেই পক্ক অবস্থা সুপক্ক দশাতে পরিণত হল তখন আর কৃষ্ণ সেখানে থাকতে পারলেন না। রাধাপ্রেমের ধ্যানে তন্ময় সুপক্ক গৌর-স্বরূপে নদীয়ার মাটিতে খসে পড়লেন। এত উত্তম ভগবান, এত বড় ভগবান, এত মিষ্টি ভগবান আর হয় না। কৃষ্ণের সামর্থ্যের চেয়ে প্রেমের সামর্থ্য অনেক বেশী। রস এবং তত্ত্ব যে দিক দিয়েই বিচার করা যাক না কেন, প্রেমের সামর্থ্য সকলের চেয়ে বেশী। কৃষ্ণ নিজেই প্রেমের অধীন। প্রেমই সর্বোপরি তত্ত্ব। কারণ তত্ত্বশিরোমণি কৃষ্ণচন্দ্রকেও প্রেম অধীন করে। বেণু, রূপ, লীলা, প্রেম—এই চারটি মাধুর্যে কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্র তাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—কৃষ্ণ ভজ। কৃষ্ণ ভজতে গেলে কাকে ধরতে হবে? যেমন জগতে দেখা যায় কোন বড়

লোককে কাজের জন্য ধরতে হলে সে যেখানে থাকে, যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে, তাকে দিয়ে ধরলে কাজ হয়, তেমনি কৃষ্ণ-ভজনের জন্যও দেখতে হবে তিনি কোথায় থাকেন, কার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা দেখা গেল রাধার কুঞ্জে কৃষ্ণ থাকেন। তাঁর সঙ্গেই কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠতা, তাই কৃষ্ণকে বশীভূত করতে হলে রাধারাণীর পাদপদ্ম ভজতে হবে। গোস্বামিপাদগণ সেইজন্য উপদেশ দিলেন—রাধা কৃষ্ণ উভয়ে মিলিত হয়ে রসের পাকে, প্রেমের পাকে, রাধাপ্রেম হিঙ্গুলে, অন্তর বাহির রাঙান যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু—তাঁকেই ভজ, গৌরসুন্দরই কলিযুগের একমাত্র উপাস্য।

এই গৌর-ভগবান প্রায়শঃ কলিজীবকে রামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র ভজনের উপদেশ করেছেন ঃ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্॥

তাই যোগীন্দ্র পরবর্তী দুটি শ্লোকে যথাক্রমে কৃষ্ণচন্দ্র ও রামচন্দ্রের স্তুতি করেছেন ঃ

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং
শিববিরিঞ্চিনুতংশরণ্যম্।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

—ভা. ১১।৫।৩৩

হে মহাপুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র, তোমার চরণারবিন্দ আমি বন্দনা করি। তোমার চরণযুগল সর্বদা ধ্যানের যোগ্য। পরমায়ু যতক্ষণ আছে তোমার নাম জিহ্বায় উচ্চারণ করতে হবে। পরশমণি পেয়ে যেমন কেউ তা লোহাতে ঠেকিয়ে সোনা করে নিতে দেরী করে না, তেমনি মনুষ্যজীবনরূপ পরশমণি পেয়ে ভগবানের নাম উচ্চারণ রূপ সোনা ফলাতেও দেরী করা উচিত নয়। কৃষ্ণপাদ-পদ্মের ধ্যান সকল পরিভব, অর্থাৎ তিরস্কারকে নষ্ট করে। তিরস্কার শব্দের অর্থ তিরঃ করোতি, অর্থাৎ আবরণ করে। একে তো জীবের ওপর মায়ার আবরণ আছেই, তার ওপর ইন্দ্রিয়, দেহ, আত্মীয়-কুটুম্ব, দেশ, সমাজ, ইহলোক-পরলোক সকলের লাঞ্ছনা। ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য এড়িয়ে কৃষ্ণদাস বলে নিজেকে ভাববার অবসর তো হয় না—এইটিই হল লাঞ্ছনার চরম। গীতায় ভগবান বলেছেন এই ইন্দ্রিয় দুষ্পূর—কিছুতেই একে পূরণ করা যায় না। যতই ইন্ধন যোগান যাক—এর ক্ষুধা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না, এ মহাশনো মহাপাপ্মা—এর বিরাট ক্ষুধা। এই ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা মিটিয়ে স্বরূপচিন্তা জীবের হয়ে ওঠে না। মায়ার আবরণে জীব এতই ঢাকা পড়ে গেছে যে সে কৃষ্ণ বলতে পারে না। চারিদিকে মায়ার চর মাঝখানে জীব রয়েছে যেন রাবণের ঘরে সীতার বাস। সেখানে যেমন চেড়ি লক্ষ্য রাখে, পাহারা দেয়, যাতে সীতার কাছে রামের লোক পোঁছুতে না পারে বা রামের কোন সংবাদ সীতা পেতে না পারে, তেমনি মায়ার রাজ্যে কৃষ্ণদাস জীবের বাস। চারিদিকে মায়ার চেড়ি পাহারা দিচ্ছে যাতে রামের খবর তার কাছে না পোঁছোয় বা রামের কোন লোক

তার কাছে না আসে। রামকে ভুলতে হবে, রাবণকে ভজতে হবে—এই যেমন সীতার প্রতি চেড়িদের আদেশ, এখানেও তেমনি কৃষ্ণকে ভুলতে হবে, মায়াকে ভজতে হবে। এই হল মায়ার আদেশ জীবের প্রতি। তবু চেড়িদের মাঝ থেকেও যেমন হনুমানজী সীতার কাছে রামের খবর পৌঁছে দিয়েছিলেন, তেমনি রামদাস শ্রীহনুমানজীর মত শ্রীগুরুপাদপদ্ম এই মায়ার রাজ্যে আমাদের কাছেও কৃষ্ণ-সংবাদ, গৌর-সংবাদ পৌঁছে দেন। মানুষকে যদি গোরুর খাদ্যবিচুলি খাইয়েঅনাদিকাল থেকে রাখা যায়, তাহলে এর চেয়ে বড় তিরস্কার আর কি আছে? মায়া জীবকে মড়ার কয়লা প্রাকৃত খাদ্য খাইয়ে অনাদি কাল থেকে রেখেছে। জীব নিত্যকৃষ্ণদাস—তার খাদ্য হল কৃষ্ণপ্রেমসেবা। খাদ্যাভাবে তার মরে যাওয়াই' উচিত, কিন্তু গোবিন্দের অংশ—অমৃতের অংশ বলে মরে না। কৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যান করলে কৃষ্ণ তা জানতে পারেন। তখন ধীরে ধীরে মায়ার তিরস্কার কমতে থাকে। তাই প্রতিদিন ধ্যান করতে হবে এবং এই ধ্যান যত গাঢ় হবে, ততই মায়ার তিরস্কার কমবে। অর্থাৎ যতই কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধ্যান করা যাবে, ততই সংসারের তাপ কমে যাবে। স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়স্বজন গৌরগোবিন্দ বলতে দেয় না। তারা চায় গৌরগোবিন্দের জন্য না ভেবে আমাদের জন্য ভাবুক—এরা ছলে গৌরগোবিন্দ ভুলায়। মমতায় বেঁধে রাখে। আবার দেখা যায় স্ত্রী-পুত্র না থাকলেই যে মুক্ত তাও নয়। কারণ—

অর্থেঽহ্যবিদ্যমানেঽপি সংস্থতি র্ন নিবর্ত্ততে।

বিষয় থাক আর না থাক—তা তো হরি বলার হেতু নয়, অর্থাৎ

বিষয় থাকলে যে হরি বলা যায় না তা নয়, আবার বিষয় না থাকলেই যে হরি বলা যায় তাও নয়। হরিভক্তের দয়া হলে তবে হরি বলা যায়—নতুবা নয়। প্রাকৃত তরঙ্গকেও ত্যাগ করা যায় না, প্রাকৃত তরঙ্গ থামবার পরে হরি বলব—এ মনে করলে হবে না, যেমন সাগরের তরঙ্গ থামলে স্নান করব—এ যেমন সম্ভব নয়। হরিতুষ্টিঃ পরো ধর্মঃ। হরিতুষ্টিতে লেগে থাকতে হবে। তা'হলেই সব সমাধান হয়ে যাবে। হরির কাজে লেগে থাকলে ক্রমশঃ সব অনুকূল হবে। সকলকে তুষ্ট করতে গেলে হরিভজন হয় না। সুমধুর হরিভজন যে ভুলিয়ে দেয়, সেই তিরস্কার করে। এ গেল এ জগতের তিরস্কার, আবার ও জগতের তিরস্কার আছে, যমের তিরস্কার। কৃষ্ণপাদপদ্মের ধ্যানে এ সব জ্বালার নিবৃত্তি হয়ে যায় চিরতরে। কৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যানের মুখ্য ফল তিরস্কার-নাশ নয়—এটি আনুষঙ্গিক ফল, মুখ্যফল হল অভীষ্ট দান করে। এ চরণ পরম পবিত্র তীর্থস্থান। তীর্থ গঙ্গার উৎপত্তিস্থল শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম। এ পাদপদ্ম শিববিরিঞ্চি পর্যন্ত ধ্যান করেন। ধ্যেয় বস্তুর মাধুর্য যদি সসীম হয়, তা'হলে স্তুতি শেষ হয়ে যায়। কিন্তু কৃষ্ণপাদপদ্মমাধুর্য অসীম। তাই এর স্তুতি শেষ হয় না। হে প্রণতপাল—প্রণতিমাত্রে পালনের ভার নেন—ভৃত্যের আর্তিকে হনন করেন। অর্থাৎ ভৃত্য সেবা করলে তবে দয়া করব—এই সেবার অপেক্ষা নেই, কিন্তু যে নিজেকে ভৃত্য বলে অভিমান করে তারই আর্তি নাশ করেন। ভৃত্যের অভিমানই তোমার দয়া আহরণ করে। কৃষ্ণ পালন করেন, অর্থাৎ ইহকাল পরকাল রক্ষা করেন। কৃষ্ণপাদপদ্মই ভবসাগর উত্তীর্ণ হবার

একমাত্র নৌকা। ভবসাগর পার হবার পক্ষে তোমার চরণ ছাড়া আর দ্বিতীয় উপায় নেই। এ সংসার হল সাগর, বিষয়বাসনা হল সে সাগরে জল—সাগরের মত অনন্ত ভোগতৃষ্ণা। আবার এ সাগরে হাঙর কুমীরের মত কাম-ক্রোধাদি রিপু আছে। যাঁরা কৃষ্ণপাদপদ্মকে ভেলা করতে পারেন তাঁরা অনায়াসে এই ভবসাগর উত্তীর্ণ হতে পারেন। যাঁরা কৃষ্ণপাদপদ্মকে ভেলা করেছেন, তাঁদের কাছে ভবসাগর গোষ্পদ হয়ে গেছে। কাজেই তাঁদের আর তরণীর দরকার হয় নি, তাঁরা অনায়াসে ভরসাগর পার হয়ে গেছেন। ভেলা এ পারে রেখেই তাঁরা চলে গেছেন। তার তাৎপর্য হল—ভক্তি মার্গ সম্প্রদায় তৈরী করে তাঁরা চলে গেছেন—এই মার্গ অবলম্বন করেই পরবর্তীরা অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হবে। অর্থাৎ কৃষ্ণ বললেই সাগর পার হওয়া যায়—অন্য কোন উপায় গ্রহণের দরকার হয় না। ভগবৎশরণার্থীর কাছে ভবসমুদ্র গোষ্পদমাত্র। যেমন অগস্ত্যের কাছে সাগর গণ্ডূষমাত্র। এখানে শ্রীযোগীন্দ্র কৃষ্ণপাদপদ্মের স্তুতি করেছেন এবং এই বাক্যটি শ্লেষের দ্বারা গৌরপক্ষেও লাগবে। কৃষ্ণপাদপদ্ম এবং গৌরপাদপদ্ম দুইই অশেষ কল্যাণ গুণরাজির আশ্রয়।

পরের শ্লোকটিতে শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি করা হয়েছে :

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং ধর্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্ বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥
—ভা. ১১।৫।৩৪

ভগবান রামচন্দ্র পিতৃ-আদেশে রাজ্যসম্পদ (রাজ্যলক্ষ্মীকে) পরিত্যাগ করে বনে গিয়েছিলেন। রামচন্দ্র ধর্মিষ্ঠ ছিলেন, তাই

পিতৃসত্যরূপ ধর্মরক্ষার জন্য তিনি রাজ্য ত্যাগ করে অরণ্যে গিয়েছিলেন। যদি প্রশ্ন হয় রাজ্যে কি কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, কিংবা রাজ্যের সম্পদ বোধ হয় হ্রাস পেয়েছিল তাই রাজা রাজ্য পরিত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু এ কারণ দুটির কোনটিই ঘটে নি। এ রাজ্য সুদুস্ত্যজ, অর্থাৎ যাকে কিছুতেই ত্যাগ করা যায় না—এ রাজ্যলক্ষ্মী দেবতাদেরও বাঞ্ছিত। রামচন্দ্র প্রিয়া সীতার ঈপ্সিত মায়ামৃগের পিছনে ছুটেছিলেন—এই মহাপুরুষ রামচন্দ্রের চরণ বন্দনা করি।

এখানে শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি করা হচ্ছে। পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য বনগমন আর দয়িতা সীতার অভিলষিত সোনার হরিণের অনুধাবন—এ দুটি গুণ বর্ণনায় রামচন্দ্রের কি এমন বিশেষ গুণ প্রকাশ পেল? ভগবৎস্বরূপের দুটি মহিমা আছে—ভগবান স্বাত্মারাম হবেন। অর্থাৎ তিনি পূর্ণকাম আপ্তকাম—নিজের সম্বন্ধে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই—তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীউদ্ধবজীর বাক্য ঃ

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥

—ভা. ৩।২।২১

স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ত্রিলোকের অধীশ্বর এবং পরমানন্দস্বরূপ সম্পত্তি দ্বারা সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হয়েছেন। এতএব তাঁর সমান অথবা তাঁর চেয়ে বেশী আর কোথাও নেই। লোকপালগণও

তাঁর চরণে নিজ নিজ মস্তকের মুকুট স্পর্শ করে পূজোপহার দিয়ে স্তুতি করেন।

ভগবানের এই আপ্তকামত্ব মহিমাই রামচন্দ্রের রাজ্য পরিত্যাগে ফুটেছে। ভগবানের দ্বিতীয় মহিমা ভক্তের জন্য সাপেক্ষতা। ভক্তের বিন্দুমাত্র প্রয়োজনে তিনি বনহরিণের পেছনেও ছুটতে পারেন। বনহরিণ সোনার হরিণ ঠিকই, কিন্তু অযোধ্যার রাজভাণ্ডারের স্বর্ণরাশি যাঁকে লুব্ধ করতে পারে নি, সোনার হরিণের সামান্য সোনা তাঁকে লুব্ধ করবে কেমন করে? সোনার লোভে রামচন্দ্র মায়ামৃগের পেছনে ছোটেন নি নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রেয়সী সীতার অভিলাষে ভক্তবাঞ্ছাপূরণের জন্যই তাঁর এই অভিনব অভিযান। ভগবানের দুটি অপূর্ব মহিমাই শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতিতে সার্থক হয়েছে।

যোগীন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে যে প্রথম স্তুতিবাক্যটি উচ্চারণ করলেন, এটি গৌরস্বরূপেও প্রযোজ্য। গৌরচরণারবিন্দও সর্বদা ধ্যানের যোগ্য। শ্রীমৎরূপগোস্বামিপাদ বলেছেন ঃ

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্বাণৈর্গিরিশ পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ আরও বলেছেন ঃ

হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

শ্রীগোস্বামিপাদের আশীর্বাদ ও প্রার্থনা—শ্রীশচীনন্দন আমাদের

হৃদয়গুহায় নিত্য বিরাজমান থাকুন। সিংহ (হরি) গুহায় থাকলে সেখানে যেমন মদমত্ত হস্তী কোন আক্রমণ করতে পারে না, তেমনি শচীনন্দন হরি (ভগবান) জীবের হৃদয়গুহায় থাকলে কামাদি ষড়্‌রিপু কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। শ্রীল নরোত্তমঠাকুরমশাই বলেছেন ঃ

শুনিয়া গোবিন্দরব আপনি পলাবে সব
সিংহরবে যেন করীগণ।

মহাজনবাক্য আছে ঃ

শয়নে গৌর স্বপনে গৌর
গৌর নয়নতারা।
জীবনে গৌর মরণে গৌর
গৌর গলার হারা॥

অর্থাৎ গৌরকে শয়নে-স্বপনে, নিদ্রা-জাগরণে, উঠতে-বসতে খেতে-শুতে সবসময়ই ভাবনা করতে হবে। প্রাণমন ভরপূর হয়ে থাকবে গোরারসে—এই রকম অবস্থা হলে তবে মুখে ভুক্তাবশেষ উদ্গার 'গোরা' 'গোরা' ধ্বনি নিরন্তর ধ্বনিত হবে। শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম যেমন শিববিরিঞ্চির ধ্যানের বস্তু শ্রীগৌর-পাদপদ্ম তেমনি আচার্য অদ্বৈত, যিনি সদাশিবস্বরূপ এবং ঠাকুর হরিদাস যিনি ব্রহ্মাস্বরূপ তাঁদের দ্বারা নিত্য পূজিত। শ্রীগৌরচরণ সুখসেব্য—শ্রীগৌরসুন্দর মহান্যাসীচূড়ামণি—অকাতরে এবং নির্হেতুকভাবে জীবকে তিনি চির-অনর্পিত প্রেমসম্পদ দান করেন।

এইভাবে প্রথম স্তুতিবাক্যটি গৌরস্বরূপে প্রযোজ্য হল।

দ্বিতীয় শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতিবাক্যটিও শ্রীগৌরস্বরূপে ব্যাখ্যা করা যাবে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ কৌশলে যোগীন্দ্রের রামচন্দ্রের স্তুতিবাক্যটি গৌরপক্ষে ব্যাখ্যা করেছেন, কারণ কলিযুগের উপাস্য দেবতা বলা হয়েছে শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর। তাই স্তুতি যখন করতে হবে তখন সেই উপাস্য দেবতার স্তুতি করাই বিধেয়। কিন্তু স্তুতি যখন করা হল তখন দেখা গেল একটি শ্লোক শ্রীকৃষ্ণপক্ষে এবং পরেরটি শ্রীরামচন্দ্রপক্ষে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্র সর্বাবতারী বলে তাঁর স্তুতি করা হয়েছে, আর ভগবান রামচন্দ্রের স্তুতি করা হয়েছে, কারণ ত্রেতাযুগে যখন নবযোগীন্দ্রের সঙ্গে নিমিরাজার প্রসঙ্গ হয় তখন শ্রীরামচন্দ্র প্রকট লীলায় আছেন। কারণ প্রকটকালের অবতারের স্তুতি না করলে তাতে প্রত্যবায় দোষ ঘটে। তাই শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি এখানে সমীচীন হয়েছে।

এখন রামচন্দ্রের স্তুতিবাক্যটি গৌরপক্ষে আলোচনা করা হচ্ছে। শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপুরুষ, তাঁর চরণারবিন্দ পরম শ্রদ্ধাভরে বন্দনা করি। স্বীয় ঈশ্বরতাসূচক চিহ্ন দীর্ঘভুজগ্রীবাদি অবয়ব-বিশিষ্ট তিনি—তাই তিনি মহাপুরুষ। শ্রীগৌরচন্দ্র ধর্মিষ্ঠ—তিনি যুগধর্মপালক—তিনি রাজ্যলক্ষ্মীরূপ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পরিত্যাগ করে অরণ্যে (চতুর্থ আশ্রম—তুরীয় সন্ন্যাস আশ্রমে) গমন করেছিলেন। এই রাজলক্ষ্মী কেমন? দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে শ্রীগৌরসুন্দর 'লক্ষ্মী' বলে সম্বোধন করতেন। এই লক্ষ্মীস্বরূপা বিষ্ণুপ্রিয়া অসুদুস্ত্যজা এবং সুরেপ্সিত রাজ্য অর্থাৎ প্রাণ যদি বা ত্যাগ করতে পারা যায়, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে কিছুতেই ত্যাগ

করতে পারা যায় না। কারণ গৌরসুন্দর শক্তিমান, তাঁর শক্তি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী—শক্তি এবং শক্তিমান কিছুতেই ভিন্ন ভাবে অবস্থান করতে পারে না, যেমন অগ্নি এবং তার দাহিকা শক্তি সর্বদা অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে। এই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সুরদিগের, অর্থাৎ দেবতাদিগেরও ঈপ্সিত, অর্থাৎ দেবতারাও তাঁকে সম্পদ-রূপে লাভ করতে অভিলাষ করেন। দেবতাদেরও অভিলষিত-রূপে যে দেবী শোভা পান, তাঁকেও পরিত্যাগ করে গৌরসুন্দর অরণ্যে প্রবেশ করেছিলেন। এখানে তাহলে প্রশ্ন হতে পারে—তবে কি সংসারের জ্বালায় উৎপীড়িত হয়ে গৌরসুন্দর গৃহত্যাগ করেছিলেন? না, তা নয়। কারণ তিনি যে ধর্মিষ্ঠ, ধর্মিষ্ঠ কখনও ধর্মপত্নীকে ত্যাগ করে না। তাহলে এ ত্যাগ কিসের জন্য? নবদ্বীপবাসী এক ব্রাহ্মণ গৌরসুন্দরকে বলেছিলেন—'তুমি সংসারসুখে বঞ্চিত হবে'। ব্রাহ্মণের এই অভিশাপ যাতে বৃথা না হয় এই জন্য গৌরসুন্দর এ অভিশাপ অঙ্গীকার করেন। ব্রাহ্মণের হৃদয়ে বসে গৌরসুন্দরই এ বাক্য উচ্চারণ করিয়েছিলেন। তা না হলে এক সামান্য ব্রাহ্মণের পক্ষে ভগবানকে অভিশাপ দেওয়া কি সম্ভব? অবশ্য মহাপ্রভুর পক্ষে এ অভিশাপবাক্য অনুকূল হয়েছিল। তিনি সংসার ত্যাগ না করলে, কলিযুগের পতিত জীবের জন্য তাঁর করুণা প্রলেপ কেউ লাভ করতে পারত না। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে গৌরভগবান দয়িতয়েপ্সিত মায়ামৃগের পিছু পিছু ছুটেছিলেন। এখানে মায়ামৃগ-শব্দে মায়াপদের দ্বারা ভগবৎ বিস্মৃতিকারক বস্তুকে বুঝাচ্ছে। সেই মায়াকে যারা অন্বেষণ করে—মায়াং মৃগ্যতি—

তারাই মায়ামৃগ, অর্থাৎ সংসারাবিষ্ট জন। পতিতপাবন গৌর-সুন্দর সেই বিষয়াবিষ্ট জীবের উদ্ধারের জন্য তাদের অনুধাবন করেছেন। যার দয়া আছে তাকে বলা যায় দয়ী—দয়ীর ভাব দয়িতা। দয়ালুতা হেতু অভিলষিত কলিজীব এরাই দয়িতয়েপ্সিত। গৌরসুন্দর এই কলিহত জীবকে নিজের স্পর্শ দান করে আলিঙ্গনছলে কৃপা করেন। সংসারসাগর হতে পতিত জীবকে তুলে নিয়ে তাকে কৃষ্ণপ্রেমসাগরে ডুবিয়ে দিলেন।

এইভাবে শ্রীনবম যোগীন্দ্র করভাজন ঋষি মহারাজ নিমির সভায় চারটি যুগ—সেই যুগের ধর্ম এবং যুগাবতারপ্রসঙ্গ উল্লেখ করলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি—এই চার যুগের জীব সেই সেই যুগের যুগাবতারকে যুগধর্মদ্বারা আরাধনা করে সর্ব-কল্যাণ লাভ করে। এখানে কল্যাণবস্তুটিকে শ্রীযোগীন্দ্র শ্রেয়ঃ পদের দ্বারা উল্লেখ করেছেন। শ্রেয়ঃ বলতে পারমার্থিক মঙ্গল বুঝায়। ভগবানের পাদপদ্মে উন্মুখতাই জীবের পারমার্থিক মঙ্গল। চারটি যুগের মধ্যে কলিযুগই শ্রেষ্ঠ। কারণ গুণ যাঁরা বিচার করতে জানেন এবং সার যাঁরা গ্রহণ করতে পারেন—সেই সব মনীষীজনও এই কলির প্রশংসা করে তাকে আশ্রয় করে থাকেন। কারণ এই কলিযুগে জীব যা সাধন করে তার পাওনা অন্য যুগের জীবের সাধনের চেয়ে বেশী। কলিযুগের যে প্রশংসা যোগীন্দ্র করলেন—এটি মহারাজ নিমির কোন প্রশ্নের উত্তর নয়, এটি প্রশ্নের অতিরিক্ত। কলির গুণ হল একমাত্র শ্রীনাম সঙ্কীর্তনের দ্বারা সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। এখানে অন্য কোন সাধনের অপেক্ষা নেই। এই সঙ্কীর্তন যুগধর্মরূপে একমাত্র

কলিতেই প্রচারিত। তাই কলিযুগ ধন্য। শ্রীল নরোত্তম দাস বলেছেন :

প্রণমহ কলিযুগ সর্বযুগসার।
হরি নাম সঙ্কীর্তন যাহাতে প্রচার ॥

এই সংসারে জীব অনবরত ভ্রমণ করছে। কলিযুগে তাদের পরম লাভ যদি একমাত্র শ্রীনামসঙ্কীর্তনকে অবলম্বন করতে পারে, তাহ'লে পরম শান্তি লাভ হবে এবং সকল সংসারদুঃখের হাত হতে নিষ্কৃতি পাবে। নামসঙ্কীর্তনই সকলের চেয়ে বড় সাধন। কারণ সঙ্কীর্তন অন্যনিরপেক্ষ। অন্য যে কোন সাধনই ফলদান করতে গেলে সঙ্কীর্তনরূপ সাধনকে অপেক্ষা করে, কিন্তু সঙ্কীর্তনই একমাত্র ফলদানে অন্য কিছুকে অপেক্ষা করে না। এই সঙ্কীর্তন সাধন পরমশান্তি দান করে। শান্তি বলতে ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধি। এই বুদ্ধি ধ্যানাদির দ্বারা পাওয়া যায় না—ভগবন্নিষ্ঠাই সর্বোৎকৃষ্টা শান্তি। ভগবৎসম্বন্ধী যা কিছু তার নামই পুণ্য, শান্তি—এরই নাম ভক্তি। ভগবদ্বিরোধী যা কিছু তাই পাপ। ভগবন্নিষ্ঠা যখন লাভ হয়, তখন আনুষঙ্গিক ভাবে পাপ সংসারের নাশ হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকে বলেছেন :

সংকীর্তন হইতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম ॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥

সংসারনাশ বলতে সমূলে বিনাশ বুঝতে হবে, অর্থাৎ সংকীর্তনের

দ্বারা যে ভগবদ্বহির্মুখতা হয় এবং তার ফলে যে পাপ, অর্থাৎ ভগবদ্বিরোধী সংসারের নাশ হয়—সে সংসারের আর পুনরাবর্তন হয় না। সঙ্কীর্তন চিত্তশুদ্ধি করায় এবং সর্বভক্তির উদ্গম করায়। সর্বভক্তি বলতে নবধা ভক্তি বুঝতে হবে। দুর্বল জীবের সর্ব অঙ্গ যাজন করবার সামর্থ্য নেই। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন—এই নবধা অঙ্গের এক অঙ্গ যাজন করতে গেলেই দুর্বল জীব অন্য অঙ্গ যাজন করবার আর ক্ষমতা পায় না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন এই সর্ব অঙ্গ যাজনের শক্তি দান করে।

শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্তন সর্বসাধন শকতি দিয়ে
শ্রীকৃষ্ণ অনুশীলন করায়।

শ্রীকৃষ্ণভজনে যদি কৃষ্ণপ্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হয়, তা'হলেই সংসার নাশ হয়। অন্নব্যঞ্জন প্রভৃতি সুখাদ্য প্রস্তুত হলেও তার আস্বাদন না হওয়া পর্যন্ত প্রাণে আনন্দ আসে না। তেমনি কৃষ্ণপ্রেমে কৃষ্ণ-আস্বাদ যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ সেই পরা আনন্দের অনুভূতিও হয় না বা সংসারের নাশও হয় না। যেমন কোন দরিদ্র ব্যক্তি যদি দৈবক্রমে প্রচুর ধনের অধিকারী হয়, তাহলেও সঙ্গে সঙ্গে তার দারিদ্র্য দূর হচ্ছে না—কিন্তু ধন দ্বারা যখন সুখ-বিলাস ভোগ করবে তখন তার দারিদ্র্য ধীরে ধীরে বিনাশ পাবে। ধনের আস্বাদ যতদিন না পাচ্ছে ততদিন দারিদ্র্যের নাশ যেমন হয় না, তেমনি কৃষ্ণভজন করলেও যতদিন না প্রেমে কৃষ্ণ-আস্বাদন হয়, ততদিন পর্যন্ত পাপ সংসারের নাশ হয় না, প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হলে তবে ভবনাশ পায়।

অতএব সর্বশাস্ত্র মন্থন করে দেখা যাচ্ছে—শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীতনই চরম সাধ্য, চরম অবলম্বনীয়। এই সঙ্কীর্তনই কলিযুগের একমাত্র সাধন, তাই কলিযুগ বুধগণের প্রণম্য ও প্রশংসনীয়। কলিযুগের এমনই প্রশংসা যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—তিন যুগের জীব এই কলিতে জন্মগ্রহণের জন্য বাসনা করে। কারণ কলিতে তারা নারায়ণপরায়ণ হতে পারবে। নারায়ণের ওপরে কলিজীবের এতই নিষ্ঠা যে এমনটি আর অন্য যুগের জীবের সম্বন্ধে দেখা যায় না। সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায় যাগযজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চনাদ্বারা মানুষ ভগবানের ওপরে যতখানি নিষ্ঠা লাভ করতে পারে তার চেয়ে বহুগুণে বেশী পারে কলিযুগে শ্রীনামসঙ্কীর্তনের দ্বারা। শাস্ত্রে আছে, নাম সঙ্কীর্তনদ্বারা ভগবৎপাদপদ্ম লাভ হয়, কিন্তু সেটি কেবল মুখস্থ বুলি বললে তাঁকে লাভ করা যাবে না—নিজ জীবনে ভজনের দ্বারা প্রতিনিয়ত আচরণ করতে হবে। নিজে নামসঙ্কীর্তন করলে যে আনন্দের অপূর্ব অনুভূতি হবে সেটি শাস্ত্র পাঠের ফলে যে আনন্দ হয়, জানা গিয়েছে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী। আচরণ না করলে শাস্ত্রবাক্যের সত্যতা নির্ণয় করা যায় না। কলিপুষ্পে এই সংকীর্তনমধু লক্ষ্য করেই ভ্রমরবৃত্তি মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিরাজকে দমন করেছিলেন—বিনাশ করেন নি। কলিতে ভগবন্নিষ্ঠা সকলের চেয়ে বেশী, যেটি অন্য কোন যুগে হয় নি। এখন প্রশ্ন হতে পারে কলির ভগবন্নিষ্ঠা ভগবান কৃতযুগের (সত্যযুগ) প্রজাদের দান করেন নি কেন? এর উত্তর শ্রীজীবগোস্বামিপাদ টীকায় দিয়েছেন। অর্থাৎ সত্যযুগের প্রজারা ধ্যান, তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা ভগবানে যে নিষ্ঠা লাভ

করেন নি, কলিযুগে সংকীর্তনদ্বারা কলিজীব সে নিষ্ঠা লাভ করেছে। কাজেই কলির জীবকে বলা হয়েছে মহাভাগবত। স্কন্দপুরাণের বচন ঃ

মহাভাগবতা নিত্যং কলৌ কুর্বন্তি কীর্তনম্।

মহাভাগবতগণ কলিযুগে নিত্যই কীর্তন করে থাকেন। কলিযুগের জীবের এই ভগবন্নিষ্ঠা ও কীর্তনমাহাত্ম্য ভগবান সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে প্রকাশ করেন নি। কারণ সে সব যুগে মানুষের ধ্যান, তপস্যা, যজ্ঞ,অর্চনা করবার সামর্থ্য ছিল। তাদের সামর্থ্য থাকা অবস্থায় যদি তাদের কাছে জিহ্বা এবং ওষ্ঠের স্পন্দনমাত্রে সাধন হয় বলা যায় তাহলে তারা কিছুতেই শ্রদ্ধা করে গ্রহণ করত না। সেই সেই যুগের মানুষ ধ্যানাদি সামর্থ্যের দ্বারা ঐশ্বর্যশালী। তাদের কাছে দীনৈক-কৃপাতিশয়শালী ভগবান আদরে বাঁধা পড়েন না। কলিযুগের নিষ্ঠার আধিক্যে ভগবানকে আপন করা যায়। ভগবান দীনবন্ধু—দীনজনেই তাঁর করুণা বেশী।

কলির জীবের অপূর্ব নিষ্ঠার কথা শুনে সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের মানুষেরও কলিযুগে জন্ম নিতে বাসনা হল। কলিযুগে মানুষ নারায়ণপর হবে, অর্থাৎ ভগবানে অতিশয় প্রেম লাভ করবে। মুক্ত সিদ্ধ সকলেরই এই ভক্তিসাধনের ফলে পরা শান্তি লাভ হয়। কলিতেই ভক্তের সংখ্যা, বৈষ্ণবের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ওপর তাঁর ভক্তগণের অসীম নিষ্ঠা দেখা যায়। তাই কলিজীব নিষ্ঠার একটি উদাহরণ। মহারাজা প্রতাপরুদ্র গড়গড়িয়া ঘাটের সঙ্গে সম্বন্ধ

করতে চেয়েছিলেন, কারণ ঐ ঘাটে শ্রীমন্মহাপ্রভু পার হয়েছিলেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত টোটা গোপীনাথের সেবা ছেড়ে প্রাণপ্রিয় গৌরসুন্দরের সঙ্গলাভের জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—'কোটি গোপীনাথসেবা তোমার পাদপদ্ম দর্শন।' গৌরভক্ত গেয়েছেন ঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান এই জপ এই লব নাম॥

যোগীন্দ্র মহারাজ নিমিকে বললেন—মহারাজ, ক্বচিৎ ক্বচিৎ অর্থাৎ গৌড়দেশে,উড়িষ্যাদেশে এবং দ্রবিড়দেশে বহু বহু নারায়ণ-পর লোক জন্মগ্রহণ করবে। ত্রেতাযুগে বসে নবযোগীন্দ্র কলির জীবের সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। গৌড়দেশে বৈষ্ণবতার অপেক্ষায় গৌরসুন্দরের আবির্ভাব এ থেকে ধ্বনিত হচ্ছে। যে দ্রবিড়দেশে তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, পয়স্বিনী, কাবেরী, মহাপুণ্যা, প্রতীচী ও মহানদী বিদ্যমান আছে, যাঁরা এই সব নদীর জল পান করেন, হে মহারাজ তাঁরা নির্মলচিত্ত হয়ে প্রায়ই ভগবান বাসুদেবের ভক্ত হন।

এখানে শ্রীজীবপাদ তাঁর টীকায় প্রশ্ন তুলেছেন—'প্রায়' কথাটির এখানে সার্থকতা কি? সমাধানও দেখিয়েছেন—'প্রায়' ইতি তেষু ভক্তেষ্বপরাধিনো বিনেত্যর্থঃ॥ অর্থাৎ যাঁরাই এই সব নদীর জল পান করবেন তাঁরাই বাসুদেবে ভক্তিপরায়ণ হবেন। কিন্তু যাঁরা ভক্তের কাছে অর্থাৎ বৈষ্ণবের কাছে অপরাধী তাঁদের বাসুদেবে ভক্তিপরায়ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। বৈষ্ণব

অপরাধীর কোন ক্ষমা নেই। বৈষ্ণব-সাধু কারো ওপরে পক্ষপাতিত্ব করেন না। তাঁদের দৃষ্টি সকলের প্রতি সমান।

শ্রীকরভাজন যোগীন্দ্র মহারাজ নিমিকে বললেন—ভগবানের শ্রীচরণে অর্পিত দাসের বিহিত কর্ম কিছু নেই—বর্ণধর্ম, আশ্রম-ধর্ম, কোনটিই তার পক্ষে বিহিত নয়—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থী, বাণপ্রস্থী, সন্ন্যাসী, অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—কোন আশ্রম বা বর্ণ-ধর্ম তার করতে হবে না—ঋষি, দেবতা,পিতৃপুরুষ, নৃবর্গ, প্রাণীসকল—সকলেই তার কর্তব্য না করা জনিত অপরাধ ক্ষমা করে নিয়েছেন। কাজেই বিহিত কর্মের অকরণে তার কোন প্রত্যবায় হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। পাওনাদারদের কাছে ঋণ দিতে না পারলে অনেক সময় তারা ক্ষমা করে নেয়। কিন্তু ভগবদর্পিত ব্যক্তির ঋণ শোধ করতে না পারার জন্য ক্ষমা নয়—ভগবদ্দাস ভগবদ্ভজনের দ্বারা এমন জায়গায় পৌঁছেছে এবং তার ফলে এমন কাজ করেছে যাতে করে ঋষি, দেবতা, পিতৃপুরুষ, প্রাণী এবং নৃবর্গ সকলেই মনে করেছে বিহিত কর্ম করে সে যা দিত, এতে তার চেয়ে অনেক বেশীই দেবে। হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে বিধিনিষেধ বলে কিছু নেই—একমাত্র ভক্তি দ্বারাই তারা কৃতকৃত্য হয়ে থাকে।

মানুষ জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ঋণে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সেই ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়স্বরূপ পঞ্চমহাযজ্ঞের ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেওয়া আছে। অধ্যাপনারূপ ব্রহ্মযজ্ঞের দ্বারা ঋষিঋণ শোধ হয়। অর্পণরূপ পিতৃযজ্ঞের দ্বারা পিতৃঋণ শোধ হয়। হোমের দ্বারা দেবঋণ, বলির দ্বারা ভূতঋণ এবং

অতিথিসেবার দ্বারা নৃঋণ শোধ হয়। কিন্তু যে একান্ত ভক্ত তার এই পাঁচটি ঋণের একটিও নেই। সে সকল ঋণ থেকে মুক্ত। ভগবদ্দাস যখনই ভগবানে আত্মসমর্পণ করে তখনই তার চাওয়া পাওয়া সব শেষ হয়েছে। তার কোন আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনা থাকে না। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই ভগবান বলেছেন :

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। গীতা ১৮।৫৪

পুত্র-উৎপাদনে পিতৃঋণ শোধ হয়, কিন্তু পুত্র যদি গৌর বলে কাঁদে পিতা তাতে বেশী সুখ পান—এর দাম অনেক বেশী। তাই সকল মহাজনই পরমানন্দে ভগবদ্দাসের ঋণ খালাস করেছেন। ভগবদ্দাস সব ধর্ম ত্যাগ করে ভগবদ্ভজন করছে। বেদবাক্যের মধ্য দিয়ে ভগবান ধর্ম উপদেশ করলেন আর গীতায় ভগবান বললেন :

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। গীতা ১৮।৬৬

সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে আমাকে ভজ। এখন বিচার করতে হবে কোন বাক্যের দাম বেশী ? বেদ ভগবানের সাক্ষাৎ আজ্ঞা নয়, গীতা ভগবানের সাক্ষাৎ আজ্ঞা। বেদ পরোক্ষ আদেশ, গীতা সাক্ষাৎ আদেশ। তাই গীতাবাক্যের আজ্ঞা বলবতী। শিশুকে যেমন ছ'মাস দুধ খাইয়ে (অন্নের সার দুধে আছে) তারপর অন্ন খাওয়ানর মত পাকস্থলী তৈরী করতে হয়। এর পরে অন্ন-প্রাশনের দিন করা হয়। দুধ খাদ্যের প্রতিনিধি, প্রতিনিধির সঙ্গে পরিচয় হলে ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয়। তেমনি ভগবানের সাক্ষাৎ আজ্ঞা বলবতী, তাই ধর্মপালনের প্রথম উপদেশ পরোক্ষ ভাবে বেদের মধ্যে করেছেন। পরে চিত্ত প্রস্তুত হলে গীতায়

ধর্মত্যাগের উপদেশ করলেন। কারণ উদ্দেশ্য হল ভগবদ্ভজন। তারই উপযোগী চিত্ত তৈরী করবার জন্য বেদের ধর্ম উপদেশ। অনাদিকালের জন্মমরণাদি ক্লেশ নিবারণ করতে হবে। চুরাশী লক্ষ জন্মে বন্ধন ছিল, মানব জন্ম হল বন্ধন কাটানোর জন্ম। এ জন্মেও যদি বন্ধন থাকে তাহলে তো সে ধিক্কারের পাত্র। মানব জন্মে 'হা গৌর বলতে হবে, আর বন্ধন কাটাতে হবে। ভগবান যে 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—এই বাক্যে সব ছেড়ে আমায় ভজ বললেন, এ কথা শুনে কেউ রাগ করবে না; কারণ ভগবদ্দাসের কোন কর্তব্য নেই। সে হাসবে নাচবে কাঁদবে গাইবে। বিহিত কর্ম তো তার কিছু নেই, কিন্তু যদি সে নিষিদ্ধ কর্ম কিছু করে—প্রায়শঃ করে না, কিন্তু যদি করেই ফেলে তাহলে তার কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। কেউ যদি ভগবদ্দাসের প্রতি প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেয় তাহলে সেই ব্যক্তি নিজেই প্রায়শ্চিত্ত করবার যোগ্য হয়। নিষিদ্ধ কর্মজনিত যে মালিন্য ভগবান তা নিজ হাতে পরিষ্কার করেন। ভগবানের পাদমূল ভজনা করতে হবে এবং অন্য বস্তুতে ভাবনা ত্যাগ করতে হবে। কৃষ্ণপাদপদ্ম ছাড়া অন্য যে কোন বস্তুই হল অন্য বস্তু। এই অন্য বস্তুতে ভাবনা ত্যাগ—আমাদের স্বভাব অন্য বস্তুতে ভাবনা করি—কৃষ্ণপাদপদ্মের সঙ্গে ভাব হয় নি। সেখানে ভাব লাগাতে পারলে তবে ভজন। হরিভালবাসার মত লাভ আর নেই। এইরূপ ভগবদ্ভজনপরায়ণের বিকর্ম প্রায়ই হয় না। যদি কখনও সে বিকর্ম করেই ফেলে তাহলে তার পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের বিধান নেই। পরমেশ্বর হরির কাছে যমের কোন যাতনা নেই।

এখন প্রশ্ন হতে পারে শ্রুতি, স্মৃতি তো ভগবানের আজ্ঞা। ভগবানের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে ভগবদ্দাস যদি কখনও বিকর্ম করেই ফেলে তাহলে ভগবান তাতে ক্রুদ্ধ হবেন না কেন? দাস তাঁর প্রিয় কি না তাই ভগবানের কাছে সহজেই ক্ষমা পায়। যেমন পুত্র প্রিয় বলে পিতার কাছে সহজেই ক্ষমা পায়। ভক্তের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন যে হরি তিনি নিজে হাতে ভক্তের হৃদয়ে বিকর্মজনিত মালিন্য ক্ষালন করে দেন। দাসকে তাঁর কাছে এ জন্য প্রার্থনা করতে হয় না। যেমন ভুক্ত অন্ন নিগীর্ণ করবার জন্য জঠরাগ্নির কাছে প্রার্থনা জানাতে হয় না—অন্ধকার নাশের জন্য আলোর কাছে প্রার্থনা জানাতে হয় না। তাই প্রয়োজন বোধ হলে হরি বলে হৃদয়ে আলো জ্বালতে হবে, সেইটিই হবে পাপ ক্ষালনের একমাত্র উপায়।

শ্রীনবযোগীন্দ্র উপাখ্যানটি ভক্তিপ্রতিপাদক—প্রথমেই নিমিরাজ প্রশ্ন করেছিলেন আত্যন্তিক ভয়নিবৃত্তি ও পরমানন্দ-লাভের কি উপায়? এর উত্তরে প্রথম যোগীন্দ্র শ্রীকবি বিধান দিয়েছেন অচ্যুতের পাদপদ্ম উপাসনাই একমাত্র ভয় নিবৃত্তির উপায়—এটি দিয়ে শাস্ত্রের উপক্রম হয়েছে। এখন শ্রীকরভাজন ঋষির বাক্যে উপসংহার হচ্ছে—যারা শ্রীহরির পাদমূল ভজনা করে তাদের ওপরে যমেরও কোন দণ্ডবিধান নেই—কারণ হরি যে যমেরও ঈশ্বর। ব্রহ্মারও ওপরে হরি কাজ করেন—সুতরাং যমের ওপরে কাজ করবেন—এ আর কোন কথা? তাহলে দেখা যাচ্ছে শাস্ত্রের উপক্রম এবং উপসংহার ঠিক আছে। যমরাজ তাঁর দূতদের কাছে এ কথা স্বীকার করেছেন—ভগবদ্দাসের

দণ্ডবিধান করতে আমি বা কাল কেউই সমর্থ নই। চতুর ভক্তের প্রায় পাতক হয় না। যদি কখনও হয় তাহলে তার সেই পাপ ক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয় না। ভগবান তার হৃদয়ে থেকে নিজেই তা দূর করেন। কৃষ্ণভজনকারী বড় চতুর। পাতক যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখেন। জগতের চতুরতায় নরকের মাত্রা বৃদ্ধি পায়—কৃষ্ণভজনকারী সাবধানে থাকেন যাতে অপরাধ না হয়। ভক্তিমার্গ কোটিকণ্টকরুদ্ধ। এখানে সাবধানে চলতে হবে—ভক্তিপথে চলা তো পা দিয়ে চলা নয়, মন দিয়ে চলা। এই পথে অগ্রসর হয়ে যে গোবিন্দ চিন্তামণি লাভ করতে পারে সেই ধন্য। ভক্তদেহ অপ্রাকৃত। কিন্তু জগতের কাছে অপ্রাকৃত দেখালে বা ভক্ত নিজে যদি তাকে অপ্রাকৃত বলে জানে তাহলে ভক্তির স্থূলভতা এসে যাবে। ভক্তের ভক্তি-উৎকণ্ঠাও আর থাকবে না, অথচ শাস্ত্রবাক্য 'হরিভক্তি সুদুর্লভা' —এটি বজায় রাখতে হবে। ভক্তিকে দুর্লভ করে রাখতে হবে। এ তো গেল বাইরের লোকের দৃষ্টি, কিন্তু যে ব্যক্তি সারা জীবন হরি বলেছে তার অবস্থা কি হবে? সে কি বলবে তার কিছু হল না? তার পক্ষে কথা হচ্ছে—লোকচক্ষে বড়লোক হয়ে লাভ কি? যাবার সময় হরি তার পুঁটলি বেঁধে দেবেন। কৃষ্ণভক্ত সাবধানে থাকেন যাতে কাঁটায় পা না পড়ে। শ্রুতি, স্মৃতি, পঞ্চরাত্রের বিধান মেনে ভক্তিপথে চলতে হবে। তীব্র ক্ষুধা —অথচ অন্ন যদি প্রাচীরের ওপাশে নাগালের বাইরে থাকে, তাহলে যেমন যন্ত্রণাই বাড়ে, তেমনি ভগবানকে আস্বাদন করবার জন্য ভক্তের তীব্র ক্ষুধা অথচ হা চৈতন্য তুমি যদি দয়া না কর,

তাহলে কাঁটা বেছে পথ চলা সম্ভব নয়। তাঁরই কৃপায় চতুর ভক্ত পাতক থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। প্রশ্ন হতে পারে ভগবান কার মালিন্য ক্ষালন করেন? যোগীন্দ্র বললেন—'স্বপাদমূলং ভজতঃ...'। এটিকে খুঁটি করে ধরে রাখতে হবে; এর নড়চড় হলে আর কোন কাজ হবে না। কৃষ্ণপাদপদ্ম যাঁরা ভজনা করেন, শ্রবণাদি নয়টি অঙ্গের যে কোন একটি অঙ্গ দিয়ে, তাঁদেরই ভগবান যে কোন পাতক থেকে রক্ষা করেন। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদসেবন, অর্চন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন—এই নয়টি অঙ্গের যে কোনটি কৃষ্ণপ্রেম দিতে সমর্থ—কৃষ্ণ দিতে সমর্থ তো বটেই। বিচার করে অঙ্গ বেছে নিতে হবে। বর্তমানে কলিকাল—তাই শ্রবণ অঙ্গ বাছাও সহজ নয়। কারণ মহারাজ পরীক্ষিতের মত সর্ববিষয়স্পৃহা ত্যাগ করে গাঢ় কানের দ্বারা কৃষ্ণ-কথা শুনতে হবে—আমাদের এরকম শ্রবণ হয় না। বিষয় নিঃস্পৃহতারও দাম দেওয়া হবে না, যদি কৃষ্ণপ্রাপ্তি উৎকণ্ঠার জন্য শ্রবণ না হয়। কৃষ্ণপ্রাপ্তি উৎকণ্ঠারই গণনা—বিষয়নিঃস্পৃহতার গণনা নয়। তাই মহাজন বলেছেন—কৃষ্ণপ্রীতির নিমিত্ত অখিল বস্তু ত্যাগ—কৃষ্ণপ্রীতি না থাকলে শুধু বিষয়ত্যাগে ফল কি? শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী:

মাথা মুড়াইলে কৃষ্ণ নাহি পাই।

প্রকৃতপক্ষে পরমানন্দ বস্তুর আস্বাদ না হওয়া পর্যন্ত বিষয়-অরুচি হয় না, কারণ জীবের রুচি তো নিরাশ্রয় থাকতে পারে না—কাউকে অবলম্বন করে দাঁড়াবে। চিটে গুড়ে অরুচি হবে যদি টাটকা মধু জিভে পড়ে। কৃষ্ণ আস্বাদ হলে যে বিষয়-

অরুচি তারই নাম ঠিক অরুচি। এই বিষয়-অরুচি এবং কৃষ্ণ-উন্মুখতা অণুচৈতন্য জীবের স্বভাবে হয় না—তার জন্য বলবান আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়। লতা যেমন নিজে দাঁড়াতে পারে না —বাতা বেঁধে তাকে দাঁড় করাতে হয়—অণুচৈতন্য জীবও তেমনি নিজে চলতে পারে না; বলবান আশ্রয় পরমাত্মার সাহায্যে সে দাঁড়ায়। শাস্ত্রে নবধা ভক্তির ব্যবস্থা থাকলেও কলিযুগে বিশেষ ধর্ম, যুগধর্ম হল শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্তন। শ্রীজীবগোস্বামি-পাদ বিচার করেছেন—নবধা ভক্তির যে কোন একটি যদিও কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেম দিতে সমর্থ তথাপি কলিযুগে সঙ্কীর্তন বাদ দিয়ে নয়। কলিযুগের স্বধর্ম হল নামসঙ্কীর্তন। তাই যে কোন অঙ্গই সাধন করুক না কেন সঙ্কীর্তন সহযোগে করতে হবে। মন্দিরে ঠাকুর না বসালে সে মন্দিরে কি লাভ? বিদ্যামন্দিরে তেমনি বিদ্যা-বধূর জীবন হল কীর্তন। হরিনাম একাই সম্রাট—তার সঙ্গে অন্য অঙ্গ যাজন করতে পারলে ভাল—না পারলেও ক্ষতি নেই। এইরূপ ভজনশীল ব্যক্তি যদি কখনও কোন বিকর্ম করে ফেলে তাহলেও তার পক্ষে কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। ভগবান যে ভক্তের হৃদয়ের মালিন্য ক্ষালন করেন সে জন্য তাঁর কাছে কোন প্রার্থনারও প্রয়োজন হয় না। বস্তুশক্তিঃ ন হি প্রার্থিতাম-পেক্ষতে।

নবযোগীন্দ্র উপাখ্যানটি বলেছেন শ্রীদেবর্ষিপাদ নারদ কৃষ্ণপিতা বসুদেবকে। নবযোগীন্দ্রের মাতা হলেন দেবরাজ ইন্দ্রের কন্যা জয়ন্তী এবং পিতা হলেন ভগবান ঋষভদেব। তাই এঁদের জায়ন্তেয় মুনি বলা হয়। এইভাবে মিথিলাধিপতি

নিমিরাজ যোগীন্দ্রগণের কাছ থেকে ভাগবত ধর্ম শ্রবণ করে পরম প্রীত হয়ে আচার্যগণের সঙ্গে তাঁদের যথাবিধি পূজা করলেন। তারপর সভায় উপস্থিত সকল লোকের সামনে সিদ্ধ মুনিগণ অন্তর্হিত হলেন এবং রাজাও ভাগবত ধর্মের অনুষ্ঠান করে যথাকালে পরমাগতি অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক লাভ করলেন।